উৎকল পর্ব

রম্যাণি বীক্ষ্য

উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ-কাহিনী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭৩

RAMYANI BEEKSHYA
Utkal Parva
(*A Bengali Travelogue*)
By Subodh Kumar Chakravarti

প্রকাশক :
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন, ১৩৬৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র
ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী

মুদ্রাকর :
শ্রী এককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০, রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ঋতেন ঋতং ধরুণং ধারয়ন্ত
যজ্ঞস্য শাকে পরমে ব্যোমন্ ।
দিবো ধর্মন্ধরুণে সেদুষো
নৄঞ্জাতৈরজাতাঁ অভি যে ননক্ষুঃ ॥
—ঋগ্বেদ ৫।১৫।২

By the Truth they held the Truth that holds all
in the might of the sacrifice, in the supreme ether
they who reached the gods seated in the law
that is the upholder of heaven,
reached by the godheads born the unborn.
Rigveda V. 15. 2.

(Translation by Sri Aurobindo)



কোনার্কের সূর্য　　ফটো : জ্ঞানরঞ্জন সেন

খণ্ড গিরি

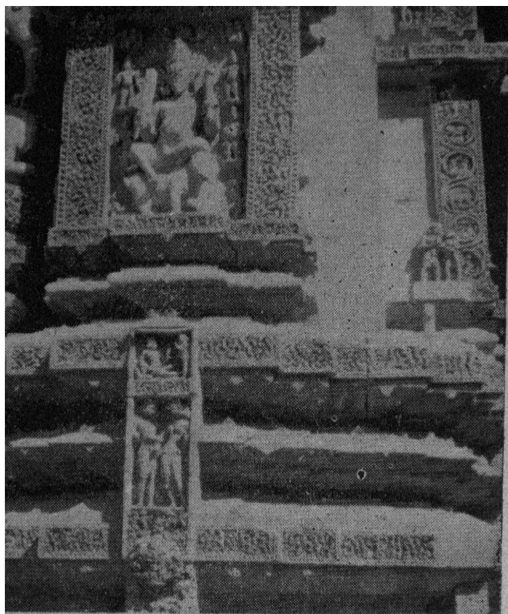


পুরীর সমু

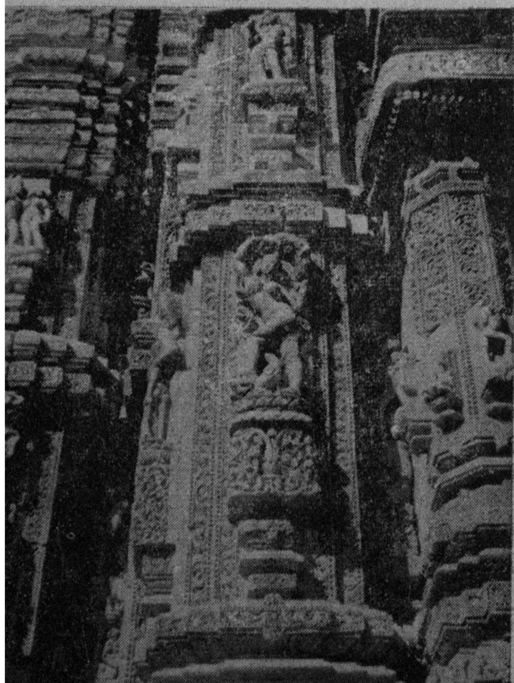


উড়িষ্যার স্থাপত্য কলা,





উড়িষ্যার স্থাপত্য কলাঃ লিঙ্গরাজ মন্দির, ভুবনেশ্বর





পুরীর সমুদ্র তীরে





কোণার্ক মন্দির

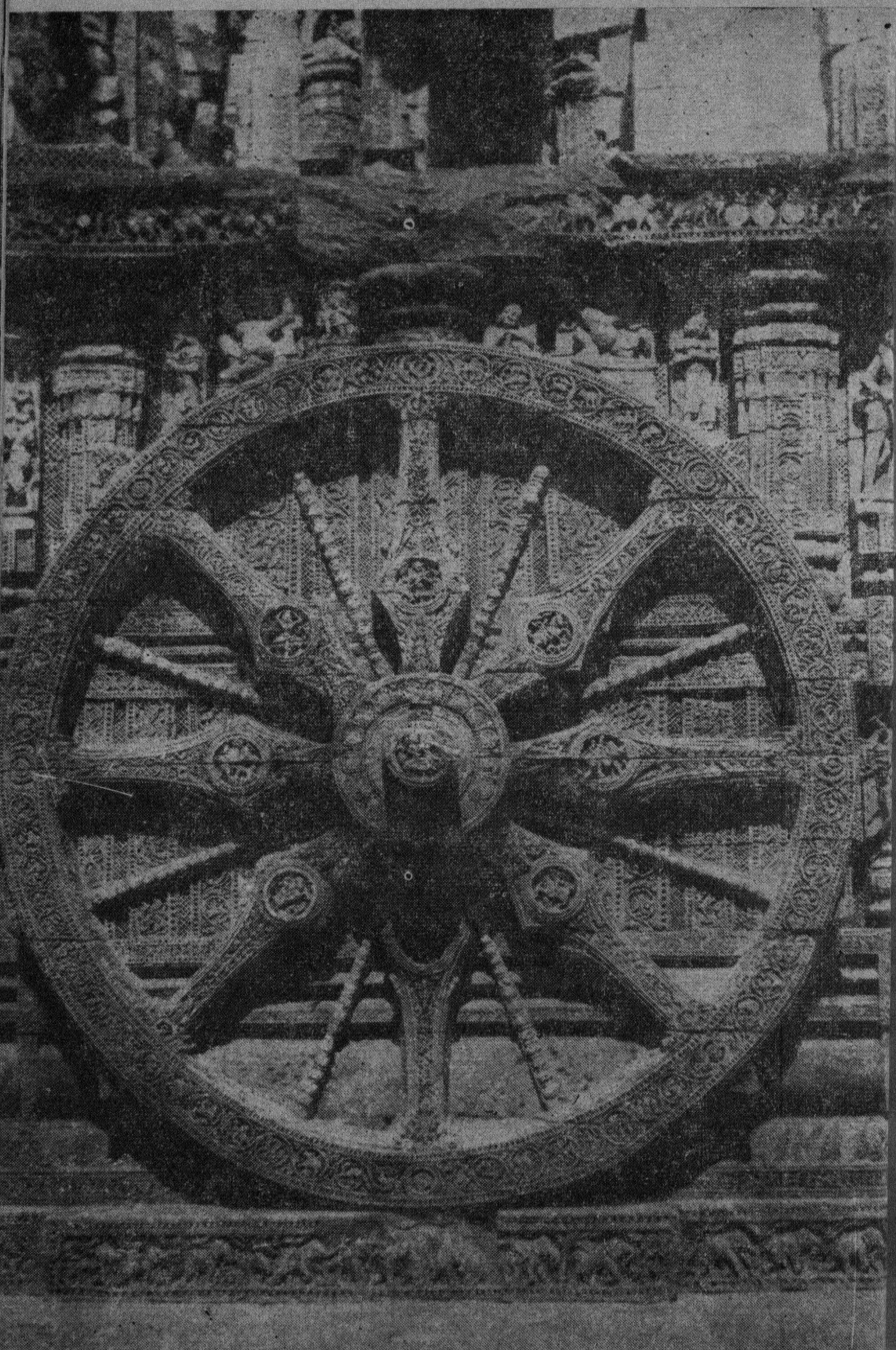
মুক্তেশ্বর মন্দির, ভুবনেশ্বর



উদয়গিরি



নাটমন্দির, কোনার্ক



কোনার্কের রথচক্র ফটো : লেখক

১

সেই দিনটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। মামার চিঠি পেলুম অফিসের ঠিকানায়। মামা অফিসের ঠিকানায় কখনও চিঠি দেন না। এমন কি এবার পূজার আগে বাড়ির ঠিকানাতেই 'তার' পাঠিয়েছিলেন। চিঠিখানা খোলবার আগে ঠিকানাটা আবার ভাল করে দেখলুম। মামার হাতের লেখাই বটে।

খানিকটা তফাতে বসে মনোরঞ্জন। হঠাৎ তার কথা শুনলুম : দুঃসংবাদ আছে।

খামখানা ছেঁড়বার সময় হাতটা তাই কেঁপে গেল।

দুঃসংবাদ! দুঃসংবাদ কেন হবে! মামা স্বাতির বিয়ের সংবাদ দিয়েছেন। জো রায়ের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। অগ্রহায়ণে আর হয়ে উঠবে না। মাস তো ফুরিয়েই এসেছে। মাঘে নিশ্চয়ই হবে। বড়দিনের ছুটিতে তিনি দিল্লী থেকে কলকাতায় ফিরছেন। আশীর্বাদ প্রভৃতি পাকা ব্যবস্থাগুলি যথাসম্ভব সত্বর সম্পন্ন করতে হবে। আমার সাহায্য চাই। তাঁর বয়স হয়েছে। সব চেয়ে নিকট বলতে একমাত্র আমিই আছি। সম্বন্ধ নকল হলেও তিনি আমাকে নকল ভাবেন না। কোমর বেঁধে আমি তাঁর পাশে এসে দাঁড়াব, এই তাঁর একান্ত বিশ্বাস। ইত্যাদি।

মনোরঞ্জন যে তার জায়গা ছেড়ে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তা খেয়াল করি নি। আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল : দুঃসংবাদই তো দেখছি।

আশ্চর্য হবার ভান করে বললুম : কেন বল তো ?

কথা না বলে মনোরঞ্জন শুধু হাসল। ভাবখানা এই রকম যে এই ব্যাপারে সব কিছুই তার জানা আছে।

আমি এ কথা মেনে নিতে রাজী ছিলুম না। বললুম ঃ হাসলে চলবে না। যা জানো তা বলতে হবে।

আমার পাশে বসেন বুড়ো লালবিহারীবাবু। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে তিনি ফাইলে মন দিলেন। মনোরঞ্জনও তাঁকে লক্ষ্য করেছিল। অত্যন্ত মৃদু স্বরে বলল ঃ পরে বলব।

বলে আঙুল দিয়ে তাঁর কান আর আমাদের মুখ দেখাল। মানে বুঝতে কষ্ট হল না যে তাঁর কান আছে আমাদের কথার দিকে।

চিঠিখানা পকেটে পুরে বললুম ঃ সেই ভাল।

শুধু লালবিহারীবাবু কেন, আরও অনেকে কৌতূহলী হয়েছিলেন। নন্দ প্রশ্ন করল ঃ ব্যাপার কী?

হেসে বললুম ঃ কিছু না।

নন্দ বুঝল যে আমি বলব না। তাই আর জোর করল না। মনোরঞ্জনও তার নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

ফাইলের কাজে আজ আর মন লাগল না। এ কাজ তো রোজই করি। আজ যে সংবাদ পেলুম, এমন সংবাদ আগে কখনও পেয়েছি কি! জীবনে বন্ধুর পথের শেষ আছে বলে আশান্বিত হয়েছিলুম। শেষ কি কিছুরই আছে! সামনের সরল সমতল পথ হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল! আমি জানি, আমার চোখ আছে ফাইলের পাতায়, কিন্তু মন সেখানে নেই। মানুষের হাত-পা সর্বাঙ্গ তার কথা শোনে, মন শোনে না। মন বড় অবাধ্য। সে চলে তার নিজের মর্জি মতো। আমার মনও আজ আমার কথা শুনবে না।

এত দিনেও কি স্বাতিকে আমি চিনতে পারি নি! অনেক দিন তো হল! সেবারে তাকে হাওড়া স্টেশনে প্রথম দেখেছিলুম। মাদ্রাজ মেলের একটা কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। আমাকেই উপহাস করেছিল আমার বুদ্ধির অভাব

লক্ষ্য করে। মামার চাকর হারিয়ে গেছে। আমি তাকে খুঁজতে চেয়েছিলুম। এই জনসমুদ্রের ভিতর সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা লোককে কি খুঁজে পাওয়া যায়! সে দিন মামাকে বড় অসহায় দেখেছিলুম। জানালার ভিতর মামীর চোখ দেখেছি ছলছল করেছে বেদনায়। আর স্বাতি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার বড় বড় চোখে আমার সঙ্গী হবার সম্মতির প্রতীক্ষা। সে দিন আমি না বলতে পারি নি। আমার ভবঘুরে মন সেই নীরব আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। চলতি ট্রেনে আমি উঠে পড়েছিলুম।

তারপর মাদ্রাজের কয়ুম নদীর পুলের উপর দাঁড়িয়ে স্বাতি বলেছিল, কাল কম করেও হাজার আটবার 'আপনি' বলেছি তোমাকে। পরকে এমন আপন বলি নি এ জীবনে।

আমি বলেছিলুম, দেবতাকেও লোকে আপনি বলে না। ও তো মান নয়, ও দূরে ঠেলে রাখবার চেষ্টা। আমার তা সইবে না।

কন্যাকুমারীর সমুদ্রতীরে সেই স্বাতি ধরা দিল। চতুর্দশীর রাত। সমুদ্রের গর্জন উঠছে একটানা। পায়ের নিচে আছড়ে পড়ছে ঢেউএর পর ঢেউ। বাতাসে তার আঁচল উড়ছে, আর আকাশে আলোর প্লাবন। স্বাতি বলেছিল, কী ভাবছ বললে না তো!

আমি বলেছিলুম, এই দিনগুলো আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল।

স্বাতি বলেছিল, এ দুর্বলের মনোভাব। হৃদয় তো তিলে তিলে দেবার জিনিস নয়, একবার দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেওয়াও যায় না।

আকাশে চতুর্দশীর চাঁদকে ঘিরে বসেছে নক্ষত্রের নৃত্যসভা। নিচে আমরা দুজন। বাতাস বড় দুরন্ত হয়ে উঠেছে। অসভ্যের মতো খেলা করছে স্বাতির আঁচল আর চুলের সঙ্গে। কাছে দূরে সর্বত্র সমুদ্রের অবিশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গ। আর তার নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীর গর্জন। অস্পষ্ট ভাবে স্বাতি বলেছিল, Who knows but the world may end to-night? আজ রাতেই যে পৃথিবীর শেষ হবে না কে জানে!

আমরা দেশে ফিরেছিলুম মহিস্মুর হায়দ্রাবাদ অজন্তা ইলোরা হয়ে, গোটা দাক্ষিণাত্যটাকে মাঝখান দিয়ে চিরে ফেলে। সে স্বতন্ত্র গল্প।

দিল্লীতে আর একবার তার মনের পরিচয় পেয়েছিলুম। আমাকে তারা গাড়িতে তুলে দিতে এসেছিল। আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তুমি কিছু বলবে না ?

স্বাতি হেসেছিল।

আমি বলেছিলুম, হাসি নয়। তোমার কি কিছুই বলবার নেই ? কিছু জানবার, কিছু শোনবার !

অস্পষ্ট ভাবে স্বাতি জবাব দিয়েছিল, গোপালদা, তোমার মন কি কোন কথা দেয় নি আমার কাছে, যে আজ মুখের কথা শোনবার প্রয়োজন হবে !

ট্রেনে আমি এই কথাই ভেবেছি বারবার। আমার মন কি সত্যিই স্বাতিকে কোন কথা দেয় নি !

এই তো মাস দুই আগে কত দেশ ঘুরে এলুম। স্বাতিরা নাকি 'রম্যাণি বীক্ষ্য' করতে বেরিয়েছিল। কিন্তু জয়পুর থেকে 'তার' করে আমায় ডেকে নিয়ে গেল। এক সঙ্গে রাজস্থান দেখলুম, দেখলুম সৌরাষ্ট্র আর মহারাষ্ট্র। জো রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওখার গাড়িতে। তিনি মিঠাপুর যাচ্ছিলেন তাঁর কোম্পানির কাজে। আমরা সেই গাড়িতেই উঠেছিলুম। জো রায় মিঠাপুর নামতে পারলেন না। আমাদের সঙ্গে ওখায় গেলেন, গেলেন বেট দ্বারকায়। ফিরলেনও আমাদের সঙ্গে। স্বাতিকে যত খুশী করবার চেষ্টা করেছেন, তার চেয়ে বেশি করেছেন মামা মামীকে। মামীকে জয় করতেও পেরেছিলেন। কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার তাঁকে চিনতেন, তাঁর দোষ গুণ সবই জানতেন ভাল করে। অঁাই তাঁকেও হাত করেছিলেন ঘুষ দিয়ে। আমার ঠিকানাও তাঁর নোট বুকে লেখা আছে। দরকার হলে আমারও সাহায্য প্রার্থনা করতেন। কিন্তু তার দরকার হল না।

সোমনাথে আমি মূর্খের মতো ভেবেছিলুম, জো রায়কে বুঝি হারিয়ে দিতে পেরেছি। মামীর ব্যবহারেই তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু সে যে কত বড় ভুল, আজ তা বুঝতে পারছি।

এ কথা আমার আগে বোঝা উচিত ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে রাজনীতিতে, সমাজ-চেতনায় হয় নি। আজও ভারতের অস্থিতে মজ্জাতে পরাধীন সত্তার গ্লানি লেগে আছে। আজও আমরা মানুষকে তার যোগ্যতা দিয়ে বিচার করি না. বিচার করি তার অর্থ সামর্থ্যে, তার সরকারী প্রতিপত্তিতে। এ দেশ আরও অনেক দিন চাঁদির পূজা করবে।

আমি আশ্চর্য হচ্ছি মামার কথা ভেবে। জো রায়কে তো তিনি দেখতে পারতেন না। তাঁর কথাবার্তাতেই সে কথা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি এ বিয়েতে কী করে রাজী হলেন! তবে কি স্বাতি নিজেই আগে রাজী হয়ে গেল! সেও কি সম্ভব!

না না, এ কিছুতেই হতে পারে না। স্বাতি আর যাই করুক, নিজেকে সে এমন করে ঠকাবে না। জো রায় সম্বন্ধে তার মনের কথা তো আমি জানি! নিশ্চয়ই সে তাকে নিয়ে খেলা করছে।

কিন্তু কেন তা করবে! সে তো তেমন মেয়ে নয়!

মস্ত বড় ঘরের ভিতর কাগজ ওল্টাবার শব্দ হচ্ছে খসখস করে। কেরানীরা কাজ করছে। আমি কোন কাজ করতে পারছি না। আমার মন আজ অশান্ত হয়ে উঠেছে। সত্য কথাটা না জানতে পারলে মন আমার শান্ত হবে না।

স্বাতি অনেক দিন আমাকে চিঠিপত্র দেয় না। চিঠি সে কমই লেখে কিন্তু এত বড় একটা সিদ্ধান্তের সামান্য আভাসও আমাকে দিল না, এই ভেবে আমার বিস্ময় বাড়ল। আমার সম্বন্ধে তার দুর্বলতার পরিচয় যেমন পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি তার বিরাগের ইঙ্গিত। গির্ণার পাহাড়ের উপরকোটে স্বাতি আমায় প্রশ্ন করেছিল, এমন হাল্কা ভাবে আর কত কাল কাটাবে? বলেছিল,

বড় অপমান বোধ হয়। আমি কি খেলার জিনিস, না বাজারের পণ্য? সেই সঙ্গেই প্রশ্ন করেছিল, তোমার কি কোন দাম নেই এই সমাজে? কারও কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পার না? তারপর নিজেই বলেছিল, এ যুগের বিচারে তোমার কোন দাম নেই।

আমি বলেছিলুম, এ যুগ এক দিন বদলাবে, আর ঐখেনেই আমার সান্ত্বনা।

স্বাতির দৃষ্টি বড় বেদনার্ত দেখেছিলুম। তাই তাকে বলেছিলুম, জান স্বাতি, স্বাধীনতা আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি। বুকের রক্ত ঢেলে আদায় করি নি বলেই স্বাধীনতার মর্ম আমরা বুঝি না। কিছু দিন যাক। চূড়ান্ত দুর্দশার ভেতর হাবুডুবু খেয়ে সবই আমরা বুঝতে পারব।

শান্ত গলায় স্বাতি বলেছিল, সে দিন আর ঝগড়া করতে আসব না। তারপরেই সে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। উচ্ছল প্রাণবন্ত হাসি। বলেছিল, তুমি কী বোকা গোপালদা!

তার সে দিনের আচরণ আজও আমার কাছে হেঁয়ালি হয়ে আছে।

সহসা মনে হল, এ তো হেঁয়ালি নয়! এইটেই বুঝি তার সত্য রূপ। ছলনা সমস্ত নারীরই প্রকৃতি। স্বাতি তো এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, নারীর খণ্ড রূপকেই সে একটা সম্পূর্ণতা লাভে সাহায্য করছে। মায়াবিনী নারী।

ছি ছি, এ আমি কী ভাবছি! স্বাতিকে আমি ভুল বুঝব! তার পরিহাসকে সত্য ভেবে আমি তার এত দিনের আন্তরিকতার অমর্যাদা করব মূর্খের মতো! স্বাতি আমাকে কী ভাববে!

বড়দিনের ছুটিতে মামা কলকাতায় আসছেন। বড়দিনের কি দেরি আছে! লালবিহারীবাবু কোট গায়ে দিয়ে এসেছেন, নন্দর কাঁধে গরম চাদর। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, আমার

গায়ে গরম জামা এখনও ওঠে নি, খদ্দরের পাঞ্জাবিতেই চলে যাচ্ছে।

পাশ থেকে নন্দ বলল: আজ আপনাকে বড় অস্থির মনে হচ্ছে!

শরীরটা—

মিথ্যে কথা মুখে আটকে গেল। বললুম: মুখে একটু জল দিয়ে আসি।

বাহিরে যাবার সময় দেওয়ালে টাঙানো অলম্যানাকটা দেখে গেলুম। বড়দিন সামনের হপ্তায়। রবিবারের পর মাত্র দুটো কালো দিন, আর এ সপ্তাহের মাত্র একটি দিন বাকি। কাল অফিস করে পালিয়ে যাব?

পালাব! কেন পালাব! মামা কি ভাববেন! আর স্বাতি! এত দিন কাপুরুষ নাম ছিল না, এবারে তাহলে সে অপবাদও নিতে হবে। অপবাদ হোক, কিন্তু পালিয়ে গিয়ে আমার কী লাভ হবে! লাভ হবে বৈকি! জীবনের সব চেয়ে বড় লোকসানটা চোখের সামনে হবে না। সেটাও কি কম লাভ!

বাহিরের বারান্দায় মনোরঞ্জন কখন এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল করি নি। বলল: তোমার এই পালিয়ে বাঁচবার মনোবৃত্তির আমি সমর্থন করি না।

কে বলল আমি পালিয়ে বাঁচতে চাই?

এই তো তুমি পালিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছ! ভাবছ, বড়দিনে কোথায় পালিয়ে যাবে!

কী আশ্চর্য! তোমার গণনায় কি এ সবও ধরা পড়ে!

বাড়িতে গিয়ে তোমার কোষ্ঠীটাও দেখব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলি। কোন সমস্যার সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়া পুরুষের ধর্ম নয়।

এ সমস্যার সমাধান কি আমি করতে পারব?

চেষ্টার অসাধ্য তো কিছু নেই!

এ হল থিওরির কথা। পারো তুমি চেষ্টা করে তোমার অবস্থার উন্নতি করতে ?

মনোরঞ্জন কী উত্তর দেবে ভাবছিল। আমি বললুম : পারো না। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তুমি তোমার ঐ কাঠের চেয়ার থেকে উঠে ভেতরের গদির চেয়ারে গিয়ে বসতে পারো না। হাজার বা লাখে একজন পারে কিনা সন্দেহ। যে পারে সে নিশ্চয়ই তার চেষ্টা দিয়ে পারে না। তুমি তো ভাগ্য গণনা কর, ভাগ্যে তোমার বিশ্বাস নেই ?

মনোরঞ্জন বোধ হয় এ কথার উত্তর দিতে পারল না। বলল : তোমার সঙ্গে আমি এক মত নই। ভাগ্যে বিশ্বাস করি বলেই হাত গুটিয়ে বসে থাকব, আজকের যুগে এ যুক্তি অচল।

মেনে নিলুম। তোমার অবস্থার উন্নতির জন্যে কি করতে পারো বল।

তোমার তো সে সমস্যা নয় !

তবে তুমি ভুল করেছ। আমার সঙ্গে জো রায়ের অনেক তফাত আছে। তার মধ্যে প্রধান হল অর্থের পার্থক্যটা। পাল্লায় ওর অনেক ভার। সিঁদ না কাটলে ওর সঙ্গে পাল্লায় পারব না।

এ তো তোমার দোষ নয় !

তবে কার দোষ বল ! সরকারের দোষ দিয়ে তো মামীর মন ভোলাতে পারব না !

মনোরঞ্জন একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলল।

বললুম : এইবারে বল আমি কী করতে পারি।

সেই কথাই ভাবছি।

তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ভিক্ষে চাইতে বলবে না। আজকাল চাইলে কেউ কিছু দেয় না।

জবরদস্তি দখল করতে পারো না ?

নিষ্প্রাণ কোন বস্তু হলে তাই করতুম।

প্রাণ থাকলে সাড়া নিশ্চয়ই পেতে।

এ কথায় আমি চমকে উঠলুম। সত্যি কথা। সরাসরি প্রশ্ন করে স্বাতির মনের কথা জেনে নেওয়া দরকার। কিন্তু তাতে কি হ্যাংলামির পরিচয় দেওয়া হবে না! স্বাতি কি ভাববে না যে আমি তার কৃপা ভিক্ষা করছি!

মনোরঞ্জন বলল: মনটা স্থির করে ফেল। হয় তুমি পুরুষের মতো তোমার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত কর, নয় তোমার নায়িকা বদল করে নিশ্চিন্ত হও।

আমি বড় রাস্তার উপরে জনতার চলাচল দেখছিলুম। এদের ভিতর পুরুষই বেশি। কিন্তু কটা লোক তাদের দাবী জানাতে পেরেছে, কজনই বা পেয়েছে তাদের ন্যায্য অধিকার! দুনিয়ায় কি অন্যায়েরই আজ জায়যাত্রা নয়! সত্যের সম্মান আজ কোথায়! মানুষ আজ কার কাছে বিচারের প্রত্যাশা করবে!

মনোরঞ্জন কতকটা ঠিকই বলেছে, নায়িকা বদল কর। কিন্তু তাতেও কি নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে! আবার প্রয়োজন হবে নায়িকা বদলাবার। তাতে লাভ কী!

মনোরঞ্জন বলল: এতে লাভ আছে বৈকি। স্রোত তোমার আটকে গেল না, বইতে লাগল। সমুদ্রের সন্ধান না পাক, হারিয়ে যাবার দুঃখ তো এড়ানো গেল!

ঠিক কথা।

উত্তরের সঙ্গে একটা দীর্ঘ শ্বাসও পড়ল।

মনোরঞ্জন বলল: আমাদের পাড়ার মুখুজ্জেরা পুরী যাচ্ছে। হোটেলে উঠবে। তাদের মেয়েটি ভাল।

বললুম: অনেক সময় নষ্ট করেছি। চল, কাজ করি।

বলে ঘরের দিকে আমি পা বাড়ালুম।

লোকাল ট্রেনে বাড়ি ফেরবার সময় মনোরঞ্জন আমার পাশে

বসেছিল। আমি উত্তরপাড়ায় নামব, সে যাবে চন্দননগর। রোজই পাশাপাশি বসি। হাসি গল্পে সময়টা ভাল কাটে। আজ তার সঙ্গে কথা বলতে আমার ইচ্ছা হল না। তাকে বড় অভদ্র মনে হচ্ছে। বড় অমানুষ। জন্ম-মৃত্যুর হিসেব করতে সে শিখেছে। তাই বোধ হয় জন্ম-মৃত্যু দুটোই দেখে একই চোখে।

কিন্তু পুরী জায়গাটা ভাল। বাঙলা দেশের কাছে এমন সুন্দর জায়গা আর নেই। দীঘা নামে নতুন একটা জায়গার নাম শুনেছি। অনেকটা পথ বাসে যেতে হয়। উপেনদা বলছিলেন, বাসে তাঁর কোমর বেঁচে ছিল কোন রকমে।

কী জানি, সমুদ্র আমাকে কেন টানে! কী অবাধ উদার বিস্তার! একবার ঐ সমুদ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মনকে বুকের খাঁচার ভিতর কিছুতেই ধরে রাখা যায় না। মন যায় আকাশের সঙ্গে মিশে, হারিয়ে যায় আকাশ আর সমুদ্রের মোহনায়। সে আমার ভবঘুরে মন, মোহমুক্ত স্বাধীন মন।

উত্তরপাড়ায় মনোরঞ্জন আমাকে জাগিয়ে দিল। আমি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লুম।

২

পুরী এক্সপ্রেসের একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বসে মনে হল, এবারে খানিকটা বৈচিত্র্য হবে। একেবারে নিঃসঙ্গ ভ্রমণ। কোন বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই, ভ্রমণের একটা ইটিনেরারিও নেই। যে কটা দিন ছুটি পাওনা ছিল তা নিয়ে নিয়েছি। এই কটা দিন সমুদ্রের বালির উপরে বসে আর গড়িয়ে কাটাব।

তারপর? তারপর তো কি আবার আমাকে অফিসে ফিরে আসতে হবে!

আজকের এই যাত্রাকে কি ভ্রমণ বলা চলে! নিজের মনটাকে আমি ভাল করে অনুভব করবার চেষ্টা করলুম। না, ভ্রমণের বাসনা আমার মনের কোনখানে নেই লুকিয়ে। নিজেই লুকিয়ে থাকবার জন্য আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কাউকে ঠিকানা দিই নি, কেউ আমার খবর জানে না। খোঁজ করতে মামা যদি উত্তরপাড়াতেও যান, আমার খবর তিনি পাবেন না। ঘরে তালা ঝুলছে দেখবেন। পৃথিবীর পরিচিত কারও সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ আছে বলে তো শুনি নি। আমার বাবা যদি নিঃসম্বল না হয়ে কিছু সম্পত্তির মালিক হতেন, তাহলে হয়তো দুএকজন তাঁদের পরিচয় নিয়ে এগিয়ে আসতেন। একটি অনাথ সংসারের আত্মীয় বলে পরিচয় দেবার যে বিপদ আছে, আজকের মানুষ সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। কিছু অর্থ ও প্রতিপত্তি না থাকলে আত্মীয় লাভের কোন আশা নেই বলে আমার মনে হল।

দরজার তালা দেখে মামা চট করে ফিরে যাবেন না। সঙ্গে যদি স্বাতি থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই নানা বুদ্ধি দেবে। বাড়িওয়ালাকে ডেকে জিজ্ঞা করবেন। সে ভদ্রলোক কী বলবেন, আমি জানি। তিনি তো আমাকে সুস্থ মানুষ মনে করেন না। বলবেন, লুম্বিনী পার্কে খোঁজ করুন, কিংবা রাঁচীর কাঁকেতে। সেখানে যদি না পান তো আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে গিয়ে দেখুন।

চায়ের দোকানের হারানিধি যদি তাঁদের দেখতে পায় তো ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, কাকে চাই আপনাদের, গোপালবাবুকে? উনি বেড়াতে বেরিয়েছেন, পনের বিশ দিন পর খোঁজ করবেন।

অতীতে এমন ঘটনা অনেক বার হয়েছে। কাউকে না বলে কয়ে বেরিয়ে পড়েছি, নিরাপদেই আবার ফিরে এসেছি। প্রথম প্রথম তারা নাকি ব্যস্ত হত, এখন আর হয় না। বাড়িওয়ালার ভয় হত টাকা মারা যাবার, এখন আর সে ভয় তার নেই। হারানিধির অন্য ভয়। যে রকমের ভুলো মানুষ, কোথাও গাড়ি চাপা পড়বে না তো! চায়ের পয়সার জন্য দুর্ভাবনা তার কখনও দেখি নি। লোকটা ব্যবসাদার হয়েও যেন ব্যবসাদারের মতো নয়। তাই তাকে ভাল লাগে। ইচ্ছে হয়েছিল, খবরটা তাকে দিয়ে আসি। কিন্তু সে যেমন বড় খোলামেলা, সকলের কাছেই হয়তো বলে ফেলবে।

গাড়ি ছাড়বার অনেক আগে এসে উপরে একটুখানি জায়গা দখল করেছি। বলিহারী গাড়ি তৈরির নমুনা। যুযুৎসুর অভ্যাস না থাকলে এ জায়গার লোভ কারও হবে না। বাক্স পেঁটরা পুঁটুলির মতো জড় পদার্থের জন্যই বোধ হয় এগুলি নির্মিত। সুস্থ মানুষ জড়ত্ব প্রাপ্তির আশঙ্কায় এ সব স্থান বর্জনের চেষ্টা করবে। অনেক গাড়িতেই আজকাল দু থাকের বদলে তিন থাক মানুষ বোঝাই-এর ব্যবস্থা হয়েছে। ধন্য রেল। তোমার প্রগতিকে নমস্কার করি।

মনে হল যে এই রকম পরিবেশে শখের ভ্রমণের কথা কেউ নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারে না। যারা বেরোয়, তারা প্রাণের দায়েই বেরোয়। বেরোতেই হবে তাই বেরনো। পয়সা থাকলে এই শ্রেণীটা বোধ হয় সবাই বর্জন করত। রাত্রি যাপনের প্রয়োজন না থাকলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

এই রেলগাড়ি ভাল লাগে অন্য সময়। কোন দিন যদি বালি

বেলুড় বা সালকের বাসে উঠতে হয়, তখন বুঝি রেলগাড়ির মর্ম। রেলগাড়িকে তখন সভ্য দেশের যান বলেই মনে হয়।

কিন্তু আজ এ সব কথা কেন মনে হচ্ছে! এই রকম গাড়িতে চড়েই তো ভারতের অনেক স্থান ঘুরে এলুম। এই তো কিছু দিন আগে সমস্ত দক্ষিণ দেশটা চষে এলুম, তারপর রাজস্থান সৌরাষ্ট্র আর মহারাষ্ট্র। কতকটা জোর করেই আমি এই শ্রেণীর গাড়িতে ঘুরেছি। মামার অনুরোধ আর আদেশ অমান্য করেছি নানা অজুহাতে। সে দিন তো এই গাড়িকে এত খারাপ লাগে নি! কোথায় যেন একটু আনন্দ ছিল, একটু তৃপ্তি।

আমি সেই আনন্দের উৎস অনুসন্ধানের চেষ্টা করলুম। শুধুই কি ভ্রমণের নেশা! তার সঙ্গে কি আরও কোন কড়া নেশা জড়িয়ে ছিল না! দুনিয়ার সমস্ত নেশার চেয়ে যার বেশি নেশা, সেই নতুন নেশা আমাকে অল্প অল্প করে মাতাল করেছে। আজ স্বাতি সঙ্গে নেই, পুরীতে তার দেখা মিলবে না। যেখানে দেখা মিলত, সেখান থেকে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। আজ আমার পাথেয় নেই, নেশা নেই। যে নেশা আমার স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ভোলাত, অসাড় করে দিত কষ্ট বোধের স্নায়ুগুলো, আজ সেই নেশার অভাবই আমাকে পীড়া দিচ্ছে। যেন আমার আফিঙ খাবার সময় হয়েছে উত্তীর্ণ, অথচ আফিঙএর দোকান আজ বন্ধ।

খানিকটা তফাতে যে এক ভদ্রলোক আমাকে লক্ষ্য করছিলেন তা দেখতে পাই নি। কাছে সরে এসে বললেন: অমন উসখুস করছেন কেন?

আমি চমকে উঠে বললুম: কই, না তো!

না বলবেন না। আমি অনেক ক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি, আপনি বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন!

বড় গরম নয় কি?

গরম!

ভদ্রলোক দুধারের খোলা জানালার দিকে চাইলেন, তাকালেন উপরের পাখার দিকেও। শীতে কেউ পাখা চালায় না, বরং গাড়ি চলতে শুরু করলে গায়ে গরম কাপড় জড়াতে হয়। বললেনঃ আপনার গরম লাগছে!

আমি জানি পাখা চালালে আমারও শীত করবে। তাই বললুমঃ বোধ হয় ভিড়ের জন্যে।

তা যা বলেছেন।

একটু থেমে বললেনঃ লোকাল ট্রেনে চড়ার অভ্যাস থাকলে একে আপনি ভিড় বলতেন না। সে মশাই অন্য ব্যাপার। একেবারে ধারণার অতীত।

সে সত্য কি আমি জানি নে! বললুমঃ তা বটে।

ভদ্রলোক এর পরে কী বলবেন, সেই কথা বোধ হয় অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেনঃ পুরী যাচ্ছেন, না ভুবনেশ্বর?

সংক্ষেপে বললুমঃ পুরী।

ভদ্রলোক আরও একটু ঘনিয়ে বসে বললেনঃ আমার নাম রামানন্দ।

এর উত্তরে আমার নিজের নাম বলা উচিত ছিল। কিন্তু কথা বলতে আমার ভাল লাগছিল না। তাই আর উত্তর দিলুম না।

কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত অপেক্ষা করেই রামানন্দ বললেনঃ আপনার কী নাম?

গোপাল।

কলকাতাতেই থাকেন?

উতোরপাড়ায়।

দেশ?

বাঙলা।

কোন্ জেলা?

হেরম্ব মৈত্রের মতো বলতে পারতুম, জানি কিন্তু বলব না।

কিন্তু আমি মিথ্যে কথাই বললুম : জানি নে।

তারপরেই চমকে উঠলুম। অকারণে কেন মিথ্যে কথা বললুম! আমি তো কারণেও সত্য বলি। রামানন্দবাবু আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই বললেন : আপনার মেজাজটা আজ ভাল নেই।

আমি উত্তর দিলুম না।

রামানন্দবাবু বললেন : পুরীতে কিছু দিন থাকবেন তো?

না।

বুঝেছি। পূজো দিয়েই আপনি চলে আসবেন।

ইচ্ছে হল বলি, তাও না। কিন্তু তার পরে আরও অনেক কথা বলতে হবে ভেবে চুপ করে গেলুম।

রামানন্দবাবু দেখলুম নীরব থাকবার পাত্র নন। বললেন : কোথায় উঠবেন স্থির করেছেন?

জানি না।

জানেন না! তা আপনার না জানলেও চলতে পারে। দু এক দিনের জন্যে থাকার জায়গার অভাব পুরীতে কোন দিন হবে না। আশ্রম ধর্মশালা যত, হোটেলও তত। সমুদ্রের ধারে তো হোটেল ছাড়া আর কিছু নেই।

আপনি বুঝি হোটেলে উঠবেন?

ঠিক ধরেছেন। প্রথমটায় ভেবেছিলুম, একখানা বাড়ি ভাড়া নেব। তারপর দেখলুম, অত ঝঞ্ঝাট করতে গেলে কাজ আর কিছু হবে না।

কাজ!

রামানন্দবাবু তাঁর মুখখানা আমার কানের কাছে এনে বললেন : কাউকে বলবেন না যেন।

না।

আমি রিসার্চ করতে যাচ্ছি। উড়িষ্যার ওপর একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখব।

বুঝতে আমার কষ্ট হল না যে ভদ্রলোক একেবারে সুস্থ নন। পরিচয় না হতেই যে কথা তিনি আমাকে বলতে পারলেন, সে কথা এমন সন্তর্পণে বলবার কী প্রয়োজন! আর গোপন করবারই বা কী দরকার! গবেষণা যাঁরা করেন, তাঁদের সাধারণ বুদ্ধি কি এমনই স্থূল হয়! বললুম: খুব ভাল কথা।

সেই সঙ্গে ভয় পেলুম, ভদ্রলোক এবারে আমার সুস্থ মাথাটা অস্থির না করেন। দেওয়ালের হুকে ঝোলানো একটা ঝোলার দিকে তিনি বারবার তাকাচ্ছিলেন। বোধ হয় ওরই ভিতর তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থের উপাদান জড়ো করা আছে। এইবারে খুলে বসলেই বিপদ হবে।

হঠাৎ আমার স্বাতির কথা মনে পড়ল। পুরাণ আর ইতিহাসের কথাকে সেও বোধ হয় এমনি ভয় পায়। সে সব কথা আমি বলতুম। আমাকেই সে ভয় পেত। সত্যিই সে ভয় পেত, না সে তার মুখের কথা! কখনও মনে হত সে খেলা করছে, আর কখনও সত্যি ভাবতুম। আজ আমার সত্যিই ভয় করছে। আজ আমি কথা শুনতে চাই নে, বলতেও না। আজ আমি চোখ বুজে আকাশ পাতাল ভাবতে চাই।

ভদ্রলোক কী বুঝলেন তিনিই জানেন। বললেন: উড়িষ্যা কথাটা কোথা থেকে এল বলতে পারেন? ছোটখাটো অভিধান থেকে শুরু করে বিশ্বকোষ পর্যন্ত হাতড়ে আমি হেরে গিয়েছি। প্রচীন বাঙলা বইএ ওড্র নামে একটি শব্দ পাওয়া যায়। উড়িষ্যাকে তাঁরা ওড্রদেশ বলেছেন। কিন্তু ওড্র মানে তো জবা ফুলের গাছ। সংস্কৃত উত্তর শব্দের প্রাকৃত রূপ নাকি ওড্র। কিন্তু উত্তরের সঙ্গে উড়িষ্যার কী যোগ, তাও তো বুঝি নে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন যে উট্‌কোল বা ওড় জাতীয় কোল শব্দ থেকে উৎকল হয়েছে। এ কথা জানতে গেলে আরও বিপদ। উট বা ওড় মানেই বা কী, আর কোল বলতেই বা কী বোঝায়, তা জানা দরকার।

আমি বললুম : কিছু না জানলেও বেশ চলে যায়।

চলে যায় !

কেন চলবে না। আমাদের বাঙলা মানে কী ?

রামানন্দবাবু বেশ বিব্রত বোধ করলেন। বললেন : তাই তো !

বললুম : একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন। উড়িষ্যাবাসীকে কখনও উড়িয়া বা উড়ে বলবেন না। ওটা ওরা গাল ভাবে।

কেন ?

যেমন মেড়ো বা বাঙাল বললে তারা চটে যায়, তেমনি উড়েরা। হিতোপদেশ পড়েন নি—উড়ে মেড়ো বাঙালশ্চ—

ভদ্রলোক বিহ্বল ভাবে তাকালেন আমার দিকে। ভাবলুম, আর বোধ হয় কোন কথা বলবেন না। কিন্তু সে যে কত বড় ভুল তা খানিকটা পরেই বুঝতে পারলুম। অস্পষ্ট ভাবে বললেন : আমার বিপদটা আপনি বুঝতে পারলেন না।

আমার বিপদটাও যে তিনি বুঝতে পারছেন না, এ কথা আমার মুখে আটকে গেল।

রামানন্দবাবু আমাকে নীরব থাকতে দেখে বললেন : এত বড় একটা বই শুরু করব, কিন্তু নামটা ঠিক করতে পারলুম না। এ পর্যন্ত চারটে নাম পেয়েছি—ওড্র উড়িষ্যা কলিঙ্গ আর উৎকল।

প্রসঙ্গটা বন্ধ করবার জন্য বললুম : কলিঙ্গ নামটা ভাল, বেশ কবিত্বময়।

রামানন্দবাবু খুশী হয়ে বললেন : ঠিক বলেছেন। আমারও তাই মনে হয়েছে। কিন্তু কথাটা কী জানেন ?

না।

ও নামটা দিয়ে উড়িষ্যাকে ঠিক বোঝায় না।

বলেন কি !

উৎসাহিত হয়ে রামানন্দবাবু বললেন : মহাভারতের বন পর্বের একটা শ্লোক দেখে আমার খুব পুলক হয়েছিল।

বলেই তাঁর ঝোলাটা নামিয়ে আনলেন লাফিয়ে গিয়ে। তাড়াতাড়ি একখানা খাতা বার করে খসখস করে কয়েকখানা পাতা ওল্টালেন। তারপর পড়লেন :

স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্॥
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোবীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত॥

এ হল রাজা যুধিষ্ঠিরের কথা। গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করে ভাইদের সঙ্গে কলিঙ্গে এলেন। তার পরের কাহিনীটাও ভাল।

লোমশ উবাচ।
এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাঽযজত ধর্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ॥

লোমশ বললেন, বৈতরণীবিধৌত এই দেশের নামই কলিঙ্গ। দেবতাদের সঙ্গে ধর্ম এখানে যজ্ঞ করেছিলেন। এই পর্যন্ত পড়ে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। গঙ্গাসাগর থেকে বৈতরণী। উড়িষ্যার সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক দুখানা পাতা উল্টে বললেন : গোলমাল দেখুন এইখানে। শক্তি-সঙ্গম তন্ত্র বলছেন :

জগন্নাথাৎ পূর্বভাগাৎ কৃষ্ণাতীরান্তগং শিবে।
কলিঙ্গ দেশঃ সংপ্রোক্তো বামমার্গপরায়ণঃ॥

জগন্নাথের পূর্ব ভাগ থেকে কৃষ্ণার তীর পর্যন্ত কলিঙ্গ দেশ। কৃষ্ণা তো দক্ষিণ দেশে!

রামানন্দবাবু আবার পাতা উল্টে বললেন : তারপর দেখুন, কবিরাম দিগ্বিজয় প্রকাশে কী লিখেছেন :

ঔড্রদেশাদুত্তরে চ কলিঙ্গো বিশ্রুতো ভুবি।

ওড্র দেশের উত্তরে বিখ্যাত কলিঙ্গ দেশ। তারপর কালিদাস তাঁর রঘুবংশে লিখছেন :

স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ ॥

হাতী দিয়ে সেতু নির্মাণ করে রঘু কপিলা নদী উত্তীর্ণ হলেন এবং উৎকলরাজ দর্শিত পথে কলিঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

খাতাটি মুড়ে আবার ঝোলার ভিতর রেখে ভদ্রলোক বললেন: তাহলেই দেখুন, যত নতুন কালে আসছি, ততই দেখছি যে উড়িষ্যা আর কলিঙ্গ এক নয়। উড়িষ্যা হয়তো কোন সময় কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কলিঙ্গ বলতে শুধু উড়িষ্যাকেই বোঝায় না।

ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে কি চলছে, সে দিকে তাঁর খেয়াল নেই। তাঁর শ্রোতার ভাল লাগছে কিনা, সে দিকেও নেই মনোযোগ। বললেন: বিদেশী মত আলোচনা করলে আমার এই কথাটি স্পষ্ট হবে। প্লিনির লেখায় তিনটি কলিঙ্গের নাম—কলিঙ্গী, মোদোগলিঙ্গম ও মক্কোকলিঙ্গী। প্লিনির বর্ণনা পড়ে মনে হয় যে উড়িষ্যার পশ্চিম খণ্ডকে তিনি কলিঙ্গী বলেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল মোদোগলিঙ্গমকে মনে করেন মধ্য কলিঙ্গ। ফরাসী পণ্ডিত সেণ্ট মার্টিন মন্থুর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তেলুগু ভাষায় মুতু শব্দের মানে যে তিন, সে কথা কেউ ভাবেন নি। মুতু গলিঙ্গকে তাহলে ত্রিকলিঙ্গ বলা যায়। টলেমির ভূগোলে ত্রিগ্লিপ্টন বা ত্রিলিঙ্গনের উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণে আছে তিলঙ্গ, আর শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে তৈলঙ্গ। তেলিঙ্গানা নাম আজকাল সকলের পরিচিত। মক্কোকলিঙ্গী মঘকলিঙ্গের রূপান্তর কিনা, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি।

রামানন্দবাবু থামলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন: এবারে আপনিই বলুন, কলিঙ্গ নাম কী করে মানি!

সমস্যা তো আপনি সমাধানই করে ফেলেছেন।

কী রকম?

কলিঙ্গ নাম তো বাতিল হয়ে গেল। এবারে উৎকল রাখুন।

ভদ্রলোক বললেন: আমিও তাই ভাবছিলুম। কপিল সংহিতায় আছে:

বর্ষাণাং ভারতঃ শ্রেষ্ঠো দেশানামুৎকলঃ শ্রুতঃ।
উৎকলস্য সমো দেশো দেশো নাস্তি মহীতলে॥

সকল বর্ষের শ্রেষ্ঠ ভারত, আর উৎকল দেশের মধ্যে।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: উৎকলের মতো ভাল দেশ আর পৃথিবীতে নেই!

কপিল মুনি তো তাই বলেছেন।

এই উৎকল নাম কোথা থেকে এল আমি তাই ভাবছিলুম। রামানন্দবাবু তার উত্তর দিলেন, বললেন: এই উৎকল নামের উৎপত্তি আছে হরিবংশে।

সুদ্যুম্নস্য তু দায়দাস্ত্রয়ঃ পরমধার্মিকাঃ।
উৎকলশ্চ গয়শ্চৈব বিনতাশ্বশ্চ ভারত॥
উৎকলশ্চোৎকলা রাজন্ বিনতাশ্বস্য পশ্চিমা।
দিক্‌পূর্বা ভারতশ্রেষ্ঠ গয়স্য তু গয়পুরী॥

সুদ্যুম্নের ধার্মিক পুত্র উৎকল স্থাপন করেন উৎকল রাজ্য.

উপরের শ্লোকটি ভদ্রলোক তাঁর খাতা দেখে বললেন। আমি সেই সময় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করেছিলুম। ভদ্রলোকের বয়স খুব বেশি নয়। আমার চেয়ে বড় হলেও তাঁকে আমি বুড়ো বলব না। মাস্টারী বোধ হয় তাঁর বৃত্তি নয়। হতেও পারে। কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস আমার ছিল না। কোন নূতন প্রসঙ্গ উঠে পড়লে সারা রাত আজ জেগেই কাটাতে হবে।

গাড়ি নড়ে উঠল বলে মনে হল। রামানন্দবাবু দু হাত যুক্ত করে কপালে ঠেকালেন। বিড়বিড় করে বোধ হয় বললেন: দুর্গা দুর্গা।

কেন জানি না, আমারও চোখ বন্ধ হল। আমিও সেই শক্তির কাছে মনে মনে সাহস চাইলুম।

ট্রেন চলছে।

৩

পুরী যাতায়াতের ব্যবস্থা ভাল। রাতে খেয়েদেয়ে ট্রেনে চাপতে হয়। সকালবেলায় পুরী। আরও ভোরে পৌঁছলেও কোন ক্ষতি ছিল না। আমাদের মতো যাত্রীদের লাভই হতো। রাতে যখন ঘুম হবে না, তখন যত তাড়াতাড়ি নামা যায় ততই আরাম। কিন্তু টাইম টেবিল তো আমাদের দিকে চেয়ে তৈরি হয় না। যাঁদের সুবিধার কথা সর্বদা লক্ষ্য রাখা হয়, তাঁরা 'পালং চা' খাবেন খুর্দা রোডে, আর 'ছোটা হাজরি, খাবেন চক্রতীর্থের কাছে রেলের বিরাট হোটেলে পৌঁছে। আমরা বাহির থেকে ঐ বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু ভিতরে ঢুকে এক পেয়ালা চা চাইবার চেষ্টা করতে সাহস পাই না।

অন্ধকার ভেদ করে গাড়ি ছুটছে। বাহিরে ঘুমন্ত পৃথিবী। কিন্তু এই গাড়ির ভিতর সবাই জেগে আছি। উপরে একখানা চাদর বিছিয়ে নিজের শোবার জায়গাটি সংরক্ষিত করে রেখেছি। নিচের জায়গাটুকুরও দাবীদার নেই। তবু আমার উপরে উঠে শোবার ইচ্ছা হল। গম্ভীর মুখে রামানন্দবাবু কিছু ভাবছেন। আর একবার বক্তৃতা শুরু করলেই বিপদে পড়ব। উপরটা নিরাপদ ভেবে আমি উঠে পড়লুম।

আজ আমার কী হয়েছে জানি নে। ঘুমোবার এমন স্বচ্ছন্দ জায়গা পেয়েও মন আমার ভরল না। কিছু দিন আগে তো কিছু না পেয়েও মন আমার ভরে থাকত। কেন এমন নিঃস্ব হয়ে গেলুম!

মনোরঞ্জন আমার ঠিকুজিটা দেখতে চেয়েছিল। দেখালে কোন ক্ষতি হত না। কেন দেখালুম না তাকে! অবিশ্বাস! তা হলে এখন আফসোস হবে কেন! কোন বড় কথা সে বলে না বটে, কিন্তু যা বলে তা তো মিলে যায়! এবারের পুজোর সময় বলেছিল আমার সমুদ্র যাত্রার কথা। জাহাজে চড়ে নাইবা বিলেত গেলুম, সমুদ্রের

উপরে তো ভেসে এসেছি! ওখা থেকে বেট দ্বারকা তিন মাইল সমুদ্রের ভিতরে। নৌকায় পাড়ি দিয়েছি বলে তো তাকে নদী বলতে পারি নে! তারপর?

তারপর সে এই দুঃসংবাদের কথাও বলেছে। চিঠি খোলবার আগেই বলেছে, দুঃসংবাদ আছে। দুর্ঘটনার কথা তাকে জিজ্ঞাসা করি নি। কপাল দেখে দুঃসংবাদের কথা যে বলতে পারল, সে কি ঠিকুজি দেখে দুর্ঘটনার কথা বলতে পারত না! এটুকু দেখিয়ে নেবার নিতান্ত দরকার ছিল। গাড়ি কি দাঁড়িয়ে আছে? নেমে পড়ব এইখানে? মুখ তুলে নিজের ভুল বুঝতে পারলুম। গাড়ি থেমে নেই, একটানা একঘেঁয়ে শব্দে অন্ধকারের ভিতর ছুটে চলেছে। আমার মনটা কি তবে থেমে আছে!

আমি কী দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছি! জো রায় স্বাতিকে বিয়ে করবে! স্বাতি আপত্তি করবে না এই বিয়েতে! কেন করবে? কেন করবে না? স্বাতির সঙ্গে একবার কথা বলে আসা দরকার ছিল। চিঠিতে যা লেখা যায় না, মুখে হয়তো তা বলা যায়। তার সঙ্গে দেখা হলে তার মনের খবর খানিকটা পাওয়া যেত। জীবনের এত বড় একটা সিদ্ধান্ত সে কি স্বেচ্ছায় নিয়েছে! যদি নিয়ে থাকে তো গোটা পৃথিবীটা আমার কাছে মিথ্যা হয়ে যাবে। মানুষের উপরে আর আমার কোন বিশ্বাস থাকবে না।

গোপালবাবু কি এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন!

সত্যিই আমি চোখ বুঁজে ছিলুম। এই ডাকে চমকে চেয়ে দেখলুম, রামানন্দবাবু উঠে দাঁড়িয়ে উত্তরের অপেক্ষা করছেন। আমি চোখ খুলতেই বললেন: আপনাকে আসল কথাটা বলতেই ভুলে গেছি।

এই স্বল্প পরিচয়েই আমি তাঁর স্বরূপটা জেনে ফেলেছি। তাঁর আসল কথাটা সহজেই আঁচ করতে পারি। তবু বললুম: বলুন।

দীর্ঘতমার নাম শুনেছেন?

দীর্ঘতমা!

হ্যাঁ হ্যাঁ, উতথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা, যিনি জন্মান্ধ ছিলেন!

তিনি তো বৈদিক যুগের ঋষি!

রামানন্দবাবু খুশী হয়ে বললেনঃ ঠিক ধরেছেন। কলিঙ্গ নামে তাঁর এক পুত্র কলিঙ্গ রাজ্য স্থাপন করেছিলেন।

আমার মনে পড়ল যে বৈদিক সভ্যতা সে যুগে উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের দু হাজার বছর আগে এই সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছিল। প্রথমে সপ্ত সিন্ধবে, তারপর ব্রহ্মাবর্ত ও মধ্যদেশে। সুরাষ্ট্র অবন্তী, সেই সঙ্গে বিদেহ মগধ অঙ্গ ও বঙ্গে প্রসারিত হয়েছে আট শো থেকে তিন শো খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত। দামোদরের মোহনায় যে তাম্রলিপ্তি নগর, সেখানে ছিল অনার্য অধিকার। ভারতের মানচিত্রে তখনও কলিঙ্গ নাম বর্তমান ছিল। কৃষ্ণা ও গোদাবরীর উপত্যকায়, দণ্ডক বনের প্রান্ত দিয়ে আর্যরা তখন মহানদীর উপত্যকায় নামছেন।

রামানন্দবাবুর প্রতিবাদ আমি করলুম না। এ সব আলোচনায় আজ আমার লোভ নেই। কোন দিন যে লোভ ছিল, তাও আজ বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। কী মনে করে ভদ্রলোক বললেনঃ আচ্ছা, আপনি ঘুমোন।

ঘুমোতে আমি পারলুম না। ঘুম এল না। কেন আমার এমন হল! প্রথম যে দিন বেরিয়ে পড়েছিলুম, সে দিন তো লাভের কথা মনে হয় নি, লোভও জাগে নি কোন। সে দিনের পথের সঞ্চয় তীরে কেন পড়ে রইল না! কেন সেই সঞ্চয়কে সিন্দুকে তোলবার জন্য মন এমন আকুল হয়েছে!

নিজেকে হঠাৎ কাপুরুষ বলে মনে হল। আমার এই পালিয়ে আসার কোন সমর্থন খুঁজে পেলুম না। এ যেন আমার দুর্বল মনের অস্থিরতার কথা ঘোষণা করা হয়ে গেল।

এ ছাড়া কি আর কোন উপায় ছিল না! স্বাতিকে কি আমি

সরাসরি কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারতুম না! কোন অনুরোধ, কোন দাবী কি আমার নেই! নিজের অধিকার কি জোর করে আমি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নে! কেন পারব না? বাধা কিসের! কে বাধা দেবে?

গাড়ির চাকার শব্দে আজ ভ্রমণের আনন্দ নেই। আজ আমার হৃৎপিণ্ডের উপর দিয়েই যেন গাড়িটা গড়িয়ে যাচ্ছে।

সকালবেলায় চোখ খুলে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। চারি দিক একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর দরজায় দাঁড়িয়ে রামানন্দবাবু চা খাচ্ছেন। ভাঁড়ের চা, বেশ ঘন ভাবে ধোঁয়া উঠছে। আমাকে চোখ খুলতে দেখেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন: ওরে ও হতভাগা, গেলি কোথায়?

প্রথমটায় আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলুম, তারপর দরজার বাহিরে তাঁকে তাকাতে দেখে ব্যাপারটা অনুমান করতে পারলুম।

দে দে, আর এক ভাঁড় দে।

সেই ভাঁড়টি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন: বলিহারি আপনার ঘুম মশাই।

সত্যিই আমি খুব ঘুমিয়েছি। কাজেই প্রতিবাদ করবার কিছু নেই।

ভদ্রলোক বললেন: গোটা উড়িষ্যাটা পেরিয়ে এলুম, আপনার ঘুম ভাঙল খুর্দা রোডে।

উড়িষ্যার তো শুরুই হয় নি, শেষ হল কী করে?

বেশ বলেছেন। কটক গেল, ভুবনেশ্বর গেল, পুরনো নতুন দুই রাজধানীই পেরিয়ে এলুম। উড়িষ্যার আর বাকি রইল কী?

পুরী আর কোনারক।

রামানন্দবাবু সহসা এ কথার উত্তর দিতে পারলেন না। একটু থমকে থেমে বললেন: তা এক রকম ঠিকই বলেছেন। পুরী আর

কোনারকই তো উড়িষ্যা। তার সঙ্গে ভুবনেশ্বরকে জুড়ে দিলেই তা সম্পূর্ণ হল।

চায়ের ভাঁড় শেষ করে আমায় নিচে নামতে হল। ঘাড় হেঁট করে বেশিক্ষণ বসা যায় না। কসরত করে কোন রকমে নেমেই স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। বেঞ্চির উপরে নানা রকমের মানচিত্র মেলা আছে। সবই বোধ হয় উড়িষ্যার মানচিত্র। আমার বিস্ময় দেখে রামানন্দবাবু বললেন: এমন আশ্চর্য হয়ে কী দেখছেন ?

ভাঁড়টা বাহিরে ফেলে দিয়ে বললুম: আপনার কাণ্ড।

ভদ্রলোক বোধ হয় কিছু ক্ষুণ্ণ হলেন, বললেন: আমার কাণ্ড মানে? আপনারা হয়তো চোখ বুঁজে পথ চলতে ভালবাসেন। আমি তা বাসি না। যেখানে যাব, তার নাড়ি নক্ষত্র না হোক কিছু তো দেখব !

মনে মনে ভাবলুম, এই কি কিছু দেখা! তারপরেই মনে পড়ল তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখার কথা। বললুম: দেখবেন বৈকি।

গাড়ি এখন অনেক ফাঁকা হয়ে গেছে। যাত্রীরা বোধ হয় কটক আর ভুবনেশ্বরেই বেশি নেমেছে। জন কয়েক এখনও আছেন। তাঁরা দূরে দূরে। রামানন্দবাবু তাঁর মানচিত্র কিছু সরিয়ে বললেন: বসুন।

ভদ্রলোকের পাশে বসে দেখলুম, নানা জাতের মানচিত্র। রেলের, রাজপথের, গাইড ও ডায়েরি বইএর নানা আকারের ও নানা রঙের মানচিত্র। জিজ্ঞাসা করলুম: কী দেখলেন ?

উড়িষ্যার সীমানা। গোটা বারো জেলার নাম পেয়েছি, আর গোটা কয়েক পরিচিত নাম।

সকলের উপরে ছিল রেলের মানচিত্রটি। তাতে দেখলুম, তিনটি প্রধান পথ দেশটাকে চিরে ফেলেছে। একটা পথ কলকাতা থেকে মাদ্রাজ গেছে সমুদ্রের ধারে ধারে। তারই উপর বালেশ্বর, কটক, ভুবনেশ্বর, চিল্কা আর গোপালপুর। উত্তর প্রান্ত দিয়ে গেছে

কলকাতা-নাগপুর লাইন। তার উপর রাউরকেলা, শাখা লাইনে সম্বলপুর। মহানদীকে বাঁধা হয়েছে হীরাকুদে। রায়পুর আর বিজয়নগরমকে যে লাইন যুক্ত করেছে, সেও এই রাজ্যের উপর দিয়ে গেছে। ভাল করে নজর দিয়ে তুটো শাখা লাইনও দেখলুম। একটি ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের, আর একটি কটক থেকে তালচের।

রামানন্দবাবু আমাকে অন্যমনস্ক হবার সুযোগ দেন নি। তিনি বলছিলেন: এই ম্যাপটা দেখুন। গোটা রাজ্যটাকে দেখতে আপনার বেশি সময় লাগবে না। একবার উত্তরে গিয়ে এই শতাব্দীর সভ্যতা দেখবেন—রাউরকেলার ইস্পাত কারখানা আর হীরাকুদের বাঁধ। ঐ দিকেই সম্বলপুরে অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা আছে, আর ব্রজরাজনগরে বসেছে কাগজের কল। দক্ষিণে আসুন। তীর্থ করবেন যাজপুরে আর পুরী ভুবনেশ্বরে। পিকনিক করুন কোনারক আর চিল্কায়। স্বাস্থ্যোদ্ধারে যান গোপালপুর অন সীতে। উড়িষ্যা ফুরিয়ে গেল।

কেওনঝড়ের জঙ্গলে শিকারের কথা বললেন না?

শিকারের শখ আমার নেই।

উড়িষ্যায় অনেকে শিকারের জন্যেই আসেন।

ও একটা আদিম প্রবৃত্তি।

এখানে শুনেছি আদিম প্রবৃত্তির আরও নমুনা আছে।

কী রকম?

মন্দিরের গায়ে। শুধু কোনারকে নয়, পুরী ভুবনেশ্বরের মন্দিরেও তার নমুনা।

আপনি মিথুন মূর্তির কথা বলছেন? তার একটা আধ্যাত্মিক অর্থ আছে।

ওটা আমাদের দেওয়া। তান্ত্রিক স্ত্রীচক্র বা লতাসাধন আমরা যেমন সমর্থন করি, এও কতকটা সেই রকম।

কিন্তু এই সব মূর্তিকে রবীন্দ্রনাথও অশ্লীল বলেন নি।

বিদেশীরা অসভ্য বর্বর বলে নিন্দা করেছে।

রামানন্দবাবু বললেন: বেশ তো, আমরা নিজেরা দেখে আমাদের নিজেদের মত গড়ব।

এ কাজে আমার আপত্তি ছিল। আমি এ সব দেখবার জন্য যাচ্ছি নে। এ নিয়ে গবেষণাও করতে চাই নে। একবার এই ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়লে আমার শান্তি বিপন্ন হবে। তাই কোন উত্তর দেবার চেষ্টা করলুম না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ভদ্রলোক বললেন: পুরীতে আপনি কোথায় উঠবেন?

বলেছি তো জানি নে।

ভদ্রলোক খুশী হলেন বলে মনে হল। বললেন: তার মানে, ওঠবার কোন জায়গা নেই। ঠিক আমারই মতন। একই হোটেলে তা হলে ওঠা যাবে, কী বলেন?

সর্বনাশ! আমাকেও তা হলে গবেষণা করতে হবে! এর চেয়ে যে আমার চাকরি ভাল ছিল!

ভদ্রলোক বললেন: আমি একটা হোটেল ঠিক করেছি। একেবারে সমুদ্রের ধারে। দু জনে এক সঙ্গেই থাকব।

ভয় পেয়ে বললুম: না না, আমি একটু সংক্ষেপে সারতে চাই। শৌখিনতায় আমার কাজ নেই, সামর্থ্যও নেই।

ভদ্রলোক ক্ষুব্ধ হলেন, বুঝি মর্মাহতও হলেন। কিছু বললেন না।

খুর্দা রোড থেকে পুরীর মাঝে মাত্র কয়েকটা স্টেশন। দু ঘণ্টারও কম সময় লাগে। মুখ হাত ধুয়ে আমরা তৈরি হয়ে নিয়েছিলুম। নামবার সময় রামানন্দবাবুকে আমি নমস্কার করলুম।

বিদায়ের পর্বটা তিনিও সংক্ষেপে সারলেন, বললেন: নমস্কার।

তাঁর সঙ্গে বাক্স বিছানা ছিল। একটা কুলি সে দুটো মাথায়

করেই স্টেশনের দরজার দিকে ছুটল। ভদ্রলোক তার পিছনে ছুটলেন।

আমার হাতে শতরঞ্চি জড়ানো বিছানা, আর কাঁধে ঝোলা। করুণ ভাবে এ দুটো জিনিসের দিকে তাকিয়ে আর একটা কুলি সরে গেল। আমি আস্তে আস্তে এগোলুম। আমার তাড়া নেই।

পাশ থেকে এক জন যাত্রী আমাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল। আরও অনেকে আমায় ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অনেকে কেন, সবাই যাচ্ছে। সবাই ছুটছে। রেলের কাছে আত্মসমর্পণ করে এত দীর্ঘ সময় নিয়ে তারা এসেছে। আর তারা একটি মুহূর্তও নষ্ট করবে না। যত তাড়াতাড়ি পারে নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে উঠবে। সমুদ্রে স্নান করে জগন্নাথ দর্শনে যাবে। ঠুঁটো জগন্নাথের পায়ে মাথা ঠুকে জীবন সার্থক করবে।

ঠুঁটো জগন্নাথের পায়েই আমরা মাথা ঠুকি। হাত বাড়িয়ে কোন দিন তিনি বুকে টেনে নেবেন না। তাঁর হাতই নেই। তবু কি আমাদের আশ মেটে!

স্টেশনে খবর পেলুম, রেল কর্তৃপক্ষ নাকি একখানা কোচ রেখেছেন। টাকা চারেক ভাড়া দিলে একখানা কামরা পাওয়া যাবে। বাহিরে এক জায়গায় একটু রান্নারও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সমুদ্র অনেক দূরে। আমি তো সমুদ্রের কাছে যাচ্ছি। ঐ বিরাট প্রাণটার কাছেই সারা দিন পড়ে থাকব।

পৃথিবীর প্রাণ আমরা দেখতে পাই নে। মাটি গাছ পাথর এ সব যেন আলাদা আলাদা। সমতলের সঙ্গে পাহাড়েরও কোন মিল নেই। এদের সব আলাদা আলাদা প্রাণ, ছোট ছোট সুখ দুঃখ। কিন্তু সমুদ্রের তা নয়। সমুদ্র এক, সমুদ্র বিশাল, সমুদ্রের শেষ নেই। যেন একটা বিরাট প্রাণী হাসছে কাঁদছে, আনন্দে ও বেদনায় ফুলে ফুলে উঠছে, রাগে গর্জন করছে। আবার শিশুর মতো খেলা করছে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে। কড়ি এনে দেয়, ঝিনুক এনে দেয়,

পা ধুইয়ে দেয় সাদা ফেনায়। তাকিয়ে না দেখলে মুখ ভার করে মানিনীর মতো। সেই প্রাণ, অত বড় প্রাণ। কূল নেই, কিনারা নেই। সেই প্রাণের কাছে গেলে কি একটু শান্তি পাব না?

সহসা কোথা থেকে মনে বল পেলুম। তাড়াতাড়ি বাহিরে এসে একখানা রিক্সা করে চললুম সমুদ্রের ধারে। রিক্সাওয়ালা প্রশ্ন করেছিল, কোথায় যাব? তাকে বললুম: সমুদ্রের ধারে একটা ছোট হোটেলে।

বড় হোটেলে মানুষের ভিড় বেশি, কলরব বেশি, বেশি জমজমাট। আমার একটু নিরিবিলি চাই। একটু ভাববার, একটু একা থাকবার প্রয়োজন।

পুরীর রাস্তাগুলি ভাল। পাকা বাঁধানো রাস্তা দিয়ে অনেক রিক্সা চলেছে। কলকাতার মতো হাতে-টানা রিক্সা নয়, সবই সাইকেল রিক্সা। অনেকটা পথ অতিক্রম করে আসবার পর সহসা মনে হল, সামনে আর বুঝি কিছু নেই। ভাল করে চেয়ে দেখলুম, রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই আকাশ। না না, শুধু আকাশ তো নয়, ঐ তো সমুদ্র, নীল নিথর নিঃসীম। মন আমার দুলে উঠল।

আরও কাছে গিয়ে দেখতে পেলুম, রাস্তার শেষ সেখানে হয় নি। নিশান ওড়াবার একটা ফ্ল্যাগ—স্টাফ বাম হাতে রেখে বাঁধানো রাস্তা ডান দিকে ঘুরে গেছে। সমুদ্রের ধারে ধারে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। দক্ষিণে সাগর দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

রিক্সাওয়ালা একবার জিজ্ঞাসা করেছিল: কোন্ হোটেলে যাব?

বলেছিলুম: সব চেয়ে ছোট হোটেলে। কিন্তু ঘর চাই সমুদ্রের ধারে।

রিক্সা থামিয়ে এক জায়গায় সে একজন লোককে ধরল। নিজেদের ভাষায় কিছু জেনে নিয়ে আবার চলতে লাগল।

রাস্তার উত্তরে নানা নামের নানা ধরনের হোটেল। বললুম: কত দূর নিয়ে যাবে?

রিক্সাওয়ালা গোটা তিনেক নাম করল, যেখানে আমার পছন্দ মতো ঘর আছে। প্রথমে যেখানে দাঁড়াল, সে একটা বড় হোটেল। বাহির থেকেই এত লোকজন দেখলুম যে আমার পছন্দ হল না। তার পরেরটাও না। পছন্দ হল একেবারে স্বর্গদ্বারের কাছে একটা ছোট হোটেল। একটু সাদাসিধে, একটু নিরিবিলি। ম্যানেজার বলেছিলেন, আগাম কিছু না দিলেও চলবে। কিন্তু আমি পুরোটাই আগাম দিয়ে দিলুম। ঝঞ্ঝাট রেখে আর লাভ কী! হিসেবীরা আমাকে বেহিসেবী বলবেন। ব্যবস্থা যদি পছন্দ না হয়, তা হলে অন্যত্র যাবার উপায় রইল না। খাতির যত্নের পরিমাণও কমল। আমার অন্য রকম ধারণা। আমি ভাবি হিসেবীরা পায়ে পায়েই ঠকে। হিসেব করে কে কবে জিতেছে! আমিই কি জিতেছি! আমি তো বেহিসেবী ছিলুম না। এবারে দেখি না বেহিসেবী হয়ে।

ম্যানেজার বললেন: রাস্তার ওপর এই ঘরখানাই আপনাকে দেব। জানালা দিয়েই সারা ক্ষণ সমুদ্র দেখতে পাবেন, ঠিক যেমনটি চাইছেন।

সংক্ষেপে আমি বললুম: ধন্যবাদ।

হোটেলের চাকর আমার বিছানা আর ঝোলা নিয়ে আগেই সেখানে রেখেছিল। এবারে আমি ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। একখানা ছোট টেবিলের উপর রামানন্দবাবু তাঁর বইপত্র গুছিয়ে রাখছিলেন। আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালেন। প্রথমটায় তিনিও হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরেই প্রসন্ন মুখে বললেন: এই যে, আসুন আসুন।

আমি কী উত্তর দেব ভেবে পেলুম না!

৪

সমুদ্রের তীরে অগণিত মানুষের মেলা। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে অনেকে স্নান করছে। যাদের সাহস কম, তারা নুনিয়ার একটা হাত চেপে ধরে তারই নির্দেশ মতো ডুবছে আর উঠছে। কেউ কেউ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে দামাল ছেলের মতো দাপাদাপি করছে, বড় বড় ঢেউএর সঙ্গে বেপোরোয়া লড়াই। তাদের বেশবাস বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে শুধু পুরুষ নয়, তাদের ভিতর মেয়েও আছে। মেয়েদের কলরবও যেন শুনতে পাচ্ছি!

এই সঙ্গে আরও দু রকমের বিলাসী দেখছি। এক দল তীরের বালির উপর শুয়ে বসে রোদ পোয়াচ্ছে, গল্প করছে। আর একদল পায়চারি করছে তীরে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে এসে আবার ফিরে যাচ্ছে। এই দৃশ্য শুধু আমার চোখের সামনে নয়, যত দূর চোখ যায় তত দূর পর্যন্ত একই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি।

রামানন্দবাবু আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললুম: যাবেন?

এখুনি?

দেরি করে আর লাভ কী! এরই জন্যে তো আসা।

রামানন্দবাবু এ কথা মানলেন না, বললেন: এসেই কি ওখানে যাওয়াটা ভাল হবে! নতুন জায়গার সঙ্গে একটু অভ্যস্ত হওয়া দরকার।

আমি আর তর্ক করলুম না। জামা গেঞ্জি খুলে গামছাটা গায়ে জড়িয়ে নিলুম। রামানন্দবাবু একেবারে চমকে উঠলেন: এ করছেন কী, এসেই নাইতে চললেন?

আমি সংক্ষেপে বললুম: হ্যাঁ।

ভদ্রলোক আমাকে বাধা দেবার চেষ্টায় বললেন: ভাল করছেন

না কিন্তু। গায়ে জল না সইয়েই একেবারে সমুদ্রে চললেন, অসুখ-বিসুখ না করে!

আমি তাঁর চমকানি দেখে বুঝতে পেরেছি যে সমুদ্রের ধারে যেতেও তাঁর ভয়। গায়ের গরম কোট এখনও খোলেন নি। গরম চাদরখানা কোলের উপর রেখে একখানা চেয়ারে বসে সমুদ্র দেখছেন। হেসে বললুম: তীর্থস্থানে অসুখের ভয় নেই।

ভদ্রলোক আমার উত্তরে যে খুশী হলেন না, তা তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম। বললেন: একা জলে নামবেন না যেন, একটা নুনিয়া সঙ্গে নেবেন।

এ কথার উত্তরেও আমি হাসলুম।

ম্যানেজার ভদ্রলোক বয়সে নবীন, বললেন: মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে। সমুদ্র বড় একটা টেনে নিয়ে যায় না। ঢেউএর বেয়াড়া ধাক্কায় একটু-আধটু নাকানিচোবানি অনেকেই খান, হাড় ভাঙে দু-একজনের। সে ক্বচিৎ কদাচিৎ।

আমি আর দেরি করলুম না। শুধু পায়ে বালির উপর দিয়ে সমুদ্রের তীরে নেমে গেলুম। পিছনে স্বগতোক্তি শুনলুম রামানন্দ-বাবুর: এখনও দেখছি ছেলেমানুষ আছেন।

তীরে পৌঁছে আরও অনেক ছেলেমানুষ দেখতে পেলুম। প্রথমেই নজর পড়ল একটি তন্বী কন্যার দিকে। শাড়ির আঁচলখানা কোমরে জড়িয়েছে শক্ত করে, ভিজে চুলের গোছা তার কপালে আর গালে লেগে আছে। যে মহিলাটি হাঁটু জলে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাত ধরে প্রবল ভাবে টানছে আর চেঁচাচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখলুম যে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন, আর লাফিয়ে লাফিয়ে ঢেউ সামলাচ্ছেন।

হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে মহিলাটি চেঁচিয়ে উঠলেন: ছাড়, ছাড় বলছি ঋতা। এমন জুলুম করলে আমি আর কোন দিন এ দিকে আসব না।

জলে দাঁড়িয়ে ঋতা লাফাচ্ছে আর টানছে: লক্ষ্মী বৌদি আমার, একবারটি এগিয়ে এস। এর পর আর কখনও তোমায় টানব না।

মহিলাটি কাতর স্বরে সেই ভদ্রলোককে ডাকলেন: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ কেন! এস না, তোমার বোনকে সামলাবে এস।

ঠিক এই সময়ে একটা বিরাট ঢেউ এসে সবার মাথার উপরে ভেঙে পড়ল। যারা সচেতন ছিল তারাই শুধু ডুব দিয়ে রক্ষা পেল, বাকি সবাই পড়ল গড়িয়ে। ঋতার সঙ্গে সেই মহিলাও পড়ে গেলেন। কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: রইল তোমার সমুদ্র স্নান, আমি ফিরে চললাম।

তাঁর নাকে মুখেও খানিকটা জল ঢুকেছিল। দু এক বার হাঁচলেন, তার পর গামছা দিয়ে নাক মুখ মুছতে মুছতে পারের উপর উঠে এলেন।

জলে নামবার আগে আমার রোদ পোয়াবার ইচ্ছা হল। শীতের হাওয়া বইছে সিরসির করে, কিন্তু শীত করছে না। সমুদ্রের হাওয়ায় ভারি ভাল লাগছে। আরও দশ জনের মতো আমিও বালির উপরে বসে পড়লুম।

ঋতা এতটুকু ভয় পায় নি। আবার তার দাদার কাছে এগিয়ে গেল। আবার সেই উদ্দাম খেলা। সমুদ্রের দিকে মুখ করে সতর্ক প্রহরীর মতো তাকিয়ে থাকতে হবে। ঢেউ আসছে, কত বড় ঢেউ, কোথায় এসে ভাঙবে, কত জোর তার, সময় থাকতেই সব বুঝে দেখতে হবে। লাফিয়ে মাথা বাঁচাতে হবে, না ডুব রক্ষা পেতে হবে, তার নির্ভুল হিসেব হওয়া চাই। আগে লাফানো চলবে না, পরে ডুবলেও চলবে না। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি হওয়া চাই তবেই প্রাণ রক্ষা, তবেই স্নানের আনন্দ। তা না পারলে ঐ মহিলার মতো বালির উপরে এসে বসে পড়, আর অন্যকে স্নান করতে দেখ।

সব চেয়ে আশ্চর্য লাগছে দেখে যে যারা নিজেরা স্নান করছে, তারাই এগিয়ে গেছে। যারা নুনিয়ার হাত ধরে নেমেছে, তারা

ডুব দিচ্ছে হাঁটু জলে দাঁড়িয়েই। নুনিয়া বলছে, আর একটু এগিয়ে চলুন। স্নানার্থী বলছে, না না, আর দূরে নয়। নুনিয়া হাসছে তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে। বেশ লাগছে দেখতে এই নুনিয়াদের। কালো পাথরের মতো শক্ত দেহ, মাথায় লম্বা সাদা টুপি, গাধার টুপির মতন। তারা দলে দলে স্ত্রী পুরুষকে হাত ধরে স্নান করাচ্ছে।

ঋতার বৌদিকে আমি হাঁপাতে দেখছিলুম। একখানা তোয়ালে দিয়ে নিজের শরীরটা ঢেকে ফেলেছেন। তবু মনে হল, শীতে একবার কেঁপে উঠলেন।

এ ধারে আর এক ভদ্রলোকের উপর দৃষ্টি পড়ল। তিনি হাঁটু অবধি কাপড় তুলে ক্যামেরা নিয়ে জলে নেমেছিলেন। মেয়ে পুরুষের একটি ছোটখাট দল উন্মত্ত ভাবে স্নান করছে। ঢেউ আসতে দেখে চোখ কপালে তুলে পারের দিকে ফিরে দাঁড়াচ্ছে। ধাক্কায় উল্টে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। কোন রকমে উঠে দাঁড়াতেই আবার একটা ঢেউএর ধাক্কা। ভদ্রলোক বোধ হয় এই বিপর্যয়ের ছবি তুলছেন। চোখ তাঁর ক্যামেরার উপরে। কোন একটা ভাল মুহূর্তের অপেক্ষা করে আছেন। এমনি সময় সহসা একটা বড় ঢেউ তাঁরই উপর ভেঙে পড়ল। ক্যামেরা হাতে ভদ্রলোক গড়িয়ে পড়লেন।

সে কী উদ্দাম হাসি। সেই কলহাস্য সমুদ্রের গর্জনকেও ছাপিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ভদ্রলোক কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে পারের উপর উঠে এলেন। বসে পড়লেন বালির উপরেই। পকেট থেকে রুমাল বার করে ক্যামেরার লেন্স মুছবায় চেষ্টা করলেন। ভিজে রুমাল। সে রুমালে মোছা কিছুই যাবে না। আমি আমার শুকনো গামছাটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম।

ভদ্রলোক এক' মুহূর্ত ইতস্তত করলেন, তারপরেই বললেন: ধন্যবাদ।

গামছাটিও নিলেন।

দলের একজন মহিলা খানিকটা এগিয়ে এসেছিলেন, বললেন: ভেতরে জল ঢুকেছে বুঝি?

তা আর ঢোকে নি!

কী করবে এখন?

দেখি, যদি শুকিয়ে নিতে পারি।

না শুকোলে?

ক্যামেরাটাই গেল।

ক্যামেরাটাই যাবে! এই তো কিনলে! ভাল করে মোছ, শুকিয়ে নাও ভাল করে।

ভদ্রলোক আর একবার ধন্যবাদ দিয়ে গামছাটা আমাকে ফেরত দিলেন। তার পর কয়েকটা ছবি তুললেন পর পর, তুলেই ভিতরের স্পুলটা গুটিয়ে ফেললেন। এই ছবিগুলো যে ক্যামেরাটা রক্ষা করবার জন্য তুললেন, তা বুঝতে পারি। দেখলুমও তাই। স্পুলটা খুলে পকেটে পুরে খোলা ক্যামেরাটা সূর্যের আলোয় মেলে ধরলেন। নোনা জলে শাটার আটকে গেলেই বিপদ। দেখলুম সে দিকেও তাঁর লক্ষ্য আছে।

পাশ দিয়ে একজন নুনিয়া যাচ্ছিল, বলল: হুজুর, সমুদ্রের ছবি তোলার নিষেধ আছে।

নিষেধ!

যেতে যেতেই লোকটা বলে গেল: সরকারের হুকুম হুজুর।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: কী আশ্চর্য দেখুন, সমুদ্র দেখতেই তো এ দেশে আসা, সমুদ্রের ছবি তোলাই বারণ! যত সব—

কথাটা ভদ্রলোক শেষ করলেন না। কিন্তু আমি ভাবতে লাগলুম। লোকটা যে খবর দিয়ে গেল তা সত্য কিনা, সত্য হলে তার কারণ কী? সামনে এক দল উন্মত্ত নরনারীকে দেখে মনে

হল, এ কথা সত্য হতে পারে। ঢেউ আর দাপাদাপির ভিতর অসংবৃতা নারীর ছবি নেওয়া এখানে দুষ্কর নয়। এই পরিবেশে তা অশোভন নয়। এত বড় একটা বিরাট অস্তিত্বের সামনে সবই সহজ, সবই স্বাভাবিক মনে হবে। কিন্তু তারই একটি খণ্ড রূপকে বিচ্ছিন্ন করে ক্যামেরায় ধরলে তা নিশ্চয়ই শোভন হবে না। অলস অবসরের সময় তাকে হয়তো বীভৎস মনে হবে। সরকার এই আদেশ জারি করে বোধ হয় সুরুচির পরিচয়ই দিয়েছেন।

ঋতার বউদি তখনও গজরাচ্ছিলেন : কী দস্যি মেয়ে বাবা, আমার ঘাড়টা একেবারে ভেঙে দিয়েছে।

ঋতা তখন উঠে আসছিল। বলল : হাঁটু জলে ঘাড়ই তো ভাঙবে বউদি।

পিছনে তার দাদাও আসছিলেন। তাঁকে দেখে মহিলাটি বললেন : ফরমাশ দিয়ে বোন পেয়েছ বটে, এমন মেয়ে আমি কোথাও দেখি নি।

ভদ্রলোক হাসলেন। আর ঋতা তার বৌদিকে টেনে তুলল : বালির চর ভেঙে এবারে তাঁরা ফিরে যাবেন।

ঋতাকে আমি যেন কোথাও দেখেছি মনে হল। না, কারও সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাচ্ছি! এমনি ছিপছিপে গড়ন, চটুল চঞ্চল মেয়ে, আমার অনেক দিনের চেনা মনে হচ্ছে। রঙটা শ্যামল, সমুদ্রের নোনা জলে একটু কালোই মনে হচ্ছে। কিন্তু মিল আছে তার প্রাণের আবেগে, তার ছেলেমানুষিতে। আমার কি স্বাতিকে মনে পড়ছে!

না না, এ আমার অন্যায় ভাবনা। স্নান করতে এসে স্নানরতা মেয়েকে দেখব কেন, কেন সে চলে যাবার পরেও তার কথা ভাবতে থাকব! আমি তো এমন ছিলুম না!

একজন নুনিয়া আমায় জাগিয়ে দিয়ে বলল : চান করবেন বাবু?

স্নান! স্নান করব বৈকি। কিন্তু তার সাহায্য তো আমার চাই না। বললুম: নিজে নিজেই করব।

লোকটা সরে গেল।

কিন্তু সমুদ্র সরে গেল না। সমুদ্রের ঢেউ যেন আরও কাছে এগিয়ে আসছে, ভেঙে পড়ছে চোখের সামনেই। নোনা জল আর সাদা ফেনা কি আমার পা দুখানাও ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে!

এই সমুদ্র তো আমার অচেনা নয়! ভারতের নানা স্থানে তাকে নানা রূপে দেখেছি। কখনও খুশিতে ছলছল, কখনও বেদনায় থমথমে। ম্যাড্রাসের ট্রিপ্লিকেনে তার যে রূপ দেখেছি, কতকটা সেই রূপ ধনুস্কোডির বালুবেলায়। কন্যকুমারীর তটপ্রান্তে পেয়েছি অনন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধান। সে রূপ আমি কোন দিন ভুলব না।

হঠাৎ মনে হল, রৌদ্রের উত্তাপ বড় তাড়াতাড়ি বাড়ছে। উঠে গিয়ে আমিও জলে নামলুম। নাতিশীতোষ্ণ জল, কলকল করে পারের দিকে ঠেলছে। তারপরেই সেই জল সমুদ্রের দিকে ফিরে যাচ্ছে। সরে যাচ্ছে পায়ের নিচের বালি। পা আলগা হয়ে যাচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলুম।

বেশি দূর যেতে সাহস হল না। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে ঢেউ দেখে দেখে গোটা কয়েক ডুব দিলুম। তারপরেই উঠে পড়লুম। সঙ্গী না থাকলে সমুদ্রে স্নান করে কোন আনন্দ নেই।

রামানন্দবাবু তখনও বাহিরের বারান্দাতেই বসে ছিলেন। গায়ের গরম কোটটি খুলে তখন চাদর জড়িয়েছেন। আমাকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন: সাদা জলে আর স্নান করবেন না, জামাকাপড় তাড়াতাড়ি বদলে নিন।

উত্তর না দিয়ে আমি হাসলুম।

হাসি নয় গোপালবাবু, প্রথম দিনেই এই অত্যাচারটা ভাল হল না।

ঘরের ভিতরে গিয়েও আমি রামানন্দবাবুর কথা শুনতে পাচ্ছিলুম: এই দেখুন না আমাকে, আমি শুধু হাত পা আর মাথাটা ধুয়ে ফেললুম। কাল নাইব গরম জলে।

আমি নিঃশব্দে কাপড় ছাড়লুম। শুকনো কাপড় পরে ভিতরের উঠোনে যাচ্ছিলুম ভিজে কাপড় মেলে দিতে, ওধারের দরজার সামনে থমকে দাঁড়াতে হল। ঘরের ভিতর থেকে হাসির শব্দ এল জলতরঙ্গের মতো। সেই কণ্ঠস্বর, চিনতে আমার এতটুকু সময় লাগল না। ঋতা হাসছে।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। ত্রস্ত পদে আমি সরে গেলুম।

ভিতরের বারান্দায় খানকয়েক টেবিল আর চেয়ার। এরই নাম ডাইনিং রুম। আমি আর রামানন্দবাবু মুখোমুখি খেতে বসলুম। চারি দিকে চেয়ে ভদ্রলোক বললেন: বেশ বেহায়া!

কথাটা যথাসম্ভব আস্তে বলেছিলেন। ভাল বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলুম: কার কথা বলছেন?

কার আবার! ঐ মেয়েটার কথাই বলছি।

পরচর্চায় অনুরাগ এ যুগে অনেকের। আমার তাতে ঘৃণা। তাই বললুম: সমুদ্রের মাছে তেমন আস্বাদ নেই।

মনে ছিল না যে পোনা মাছ খাচ্ছি।

রামানন্দবাবু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন: গায়ে একটা তোয়ালে জড়ালেই কি লজ্জা নিবারণ হয়! তা যদি অন্য উপায় না থাকে তো একটু চুপিচুপিই চল। অত নাচানাচি কেন!

উত্তর না দিলে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই থামবেন না। তাই বললুম: আপনি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন না কেন?

বেশ বলেছেন। বেহায়ার লজ্জা নেই, আমি লুকোব মুখ!

ক্ষতি কী!

হুঁ।

বলে ভদ্রলোক খানিকক্ষণ নিঃশব্দে খেলেন। তার পর বললেন: এই জন্যেই বাঙালীর এমন বেহায়া বলে বদনাম।

আমি তো বদনামের কথা শুনি নি!

শোনেন নি! তা কানে তুলো দিয়ে থাকলে আর শুনবেন কী করে! কাল হয়তো আজকের কথাই ভুলে যাবেন।

হঠাৎ আমার অন্য কথা মনে পড়ল। বললুম: আপনার বইএর কাজ কবে থেকে শুরু করবেন?

কবে থেকে মানে! আপনি কি পাগল হয়েছেন!

কেন?

নষ্ট করবার মতো কি আমার সময় আছে! আজ থেকেই আমায় লাগতে হবে, খেয়ে উঠেই। নিতান্ত আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, তাই এত ক্ষণ কাজে লাগি নি।

সত্যি!

তবে কি মিথ্যে বলছি!

না না, মিথ্যে কেন বলবেন! খেয়ে উঠে আমার ঘুম পায় কিনা, তাই আশ্চর্য হচ্ছিলুম।

আশ্চর্য হতে আমার সত্যিই বাকি ছিল। খেয়ে উঠে আমি খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিলুম। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন কাজ করবার জন্য। কাগজখানা শেষ করে আমি যখন শুতে গেলুম, তখন তিনি ঘুমে অচেতন। প্রবল উদ্যমে তাঁর নাক ডাকছে।

শুধু হাসি নয়, আমার ভয়ও হল। এক ঘরে আমাদের থাকতে হবে। এই গর্জনের ভিতর আমার ঘুম আসবে তো! সমুদ্রের গর্জনও যে ছাপিয়ে যাচ্ছে!

৫

শৈশবে এক দিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তপস্যা কাকে বলে। বাবা সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলেন যে কিছু না ভাবাকে তপস্যা বলে। অবিশ্বাস নয়, আমার বিস্ময় বোধ হয়েছিল। বলেছিলুম, তবে যে শুনি চোখ বন্ধ করে ভগবানের নাম করাকে তপস্যা বলে! বাবা বলেছিলেন, ভুল শোন। ভগবানের নাম করার নাম যদি তপস্যা হত, তা হলে তুমি আমি সবাই তো তপস্যা করি।

সত্যি কথা। সেদিন আমি বাবাকে বলেছিলুম, আমিও তপস্যা করব। বাবা বলেছিলেন, বেশ তো, সন্ধ্যাবেলায় দু মিনিট কিছু ভাববে না, তাই তোমার তপস্যা হবে।

তার পর দু মিনিট কেন, আমি অনেক দিন অনেক মিনিট কিছু না ভাবার চেষ্টা করেছি। নিজের কাছে নিজের পরাজয় হয়েছে বিশ্রী ভাবে। হয়তো সত্যিই কিছু ভাবি নি, কিন্তু কিছু ভাবব না এই কথাটিই সারা ক্ষণ মনে খোঁচা দিয়েছে। তারপর আমার ব্যর্থতার কথা বাবাকে বলেছিলুম। শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন, তপস্যা কি অত সোজা কাজ রে, তপস্যা করেই তপস্যা শিখতে হয়।

আজ অনেক দিন পর সমুদ্রের ধারে বসে আমার এই কথা মনে পড়ল। আমার কি নতুন করে তপস্যার প্রয়োজন হয়েছে! মনের চেয়ে অবাধ্য বুঝি আর কিছু নেই। যা মনে করব না ভাবি, তাই মনে আসে সকলের আগে। মন থেকে মুছে ফেলব ভাবলে সারা ক্ষণ মনেই জেগে থাকে। তার চেয়ে অন্য কিছু করা যাক, অন্য কিছু ভাবা যাক। অন্য দিকে মন দিলে খানিকটা হয়তো নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

ঋতারা আমাদের আগেই বেড়াতে বেরিয়েছে। খাবার ব্যাপারে ওরা হোটেলের উপর নির্ভর করে নেই। ওদের সঙ্গে

চাকর আছে, রান্নার সমস্ত সরঞ্জাম আছে। শুধু একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে, সেই ঘরেই রেঁধে বেড়ে খাচ্ছে। আমরা যখন বিকেলের চায়ের অপেক্ষা করছি, ঋতারা তখন নিজেরা চা খেয়ে বেরিয়ে গেল। আমরা বারান্দায় বসে ছিলুম, আমাদের সামনে দিয়েই গেল।

ঋতা সকলের আগে বেরিয়েছিল, কিন্তু বৌদি তখনও বেরোন নি বলে রাস্তায় নেমেও আবার উঠে এল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল : আমরা তোমার অপেক্ষা করছি বৌদি।

ভিতর থেকে উত্তর এল : আসছি, আসছি।

একটু বিরক্তির সুর। বোধ হয় ক্লান্ত, এই ধকল তাঁর সহ্য হচ্ছে না।

ঋতা যে চুপ করে থাকতে পারে না, তা বোঝা গেল তার পরের আচরণে। রামানন্দবাবুকে বলল : আপনারা বুঝি আজ এলেন?

প্রথমটায় রামানন্দবাবু একটু চমকে উঠেছিলেন, তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : কী করে বুঝলেন?

ঋতা হেসে বলল : আজ যে প্রথম দেখছি। কই, নিগমবাবুরা বেরোলেন না?

বলে ভিতরের একখানা দরজার দিকে তাকাল।

রামানন্দবাবু বললেন : আপনারা বুঝি বেড়াতে যাচ্ছেন?

বেড়াবার জন্যেই তো এসেছি! আপনারা বেরোবেন না?

আমরা?

বলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : আমরা বেরোব না গোপালবাবু?

ঋতা আমার দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল : আপনার নাম বুঝি গোপাল? এমন বিশ্রী নাম কেন রেখেছেন?

নিজের নাম কেউ নিজে রাখে না। তবু বললুম : বিশ্রী লোক বলে।

দরজায় তালা দিয়ে বৌদি বেরোচ্ছিলেন, বললেন ঃ কী হচ্ছে ঋতা! এস এস।

বলে তরতর করে ঋতা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

আমি জানতুম, তার বৌদি সব কথা শুনতে পেয়েছেন এবং তিনি কখনই এই বাচালতার সমর্থন করবেন না। আমি তাই পথের উপর আমার কান পেতে রেখেছিলুম।

কয়েক পা এগিয়েই তার বৌদি বললেন ঃ যেমন ভাই, বোনও তেমনি। কোন দিন তোমরা সভ্য হবে না।

কেমন বোকা বোকা দেখতে, তাই না দাদা?

দাদার উত্তরটা আর শুনতে পেলুম না। ক্ষতি নেই। যতটুকু শোনবার দরকার ছিল, ততটুকু ঠিকই শুনতে পেয়েছি।

রামানন্দবাবু ওদের দূরে যাবার অপেক্ষা করছিলেন। বললেন ঃ কী অসভ্য দেখলেন তো মশাই!

অসভ্যতা আর কী!

সে কি মশাই, মুখের ওপর যা-তা বলে গেল, আপনি হজম করে যাবেন!

যা-তা আর কোথায় বলল! আমার নামটা বিশ্রী, সেই কথাই শুধু জানিয়ে গেল। আপনি মনে যা ভাবছেন, ও মুখে তাই বলে ফেলেছে। এতে আর দোষ কী!

রামানন্দবাবু কতকটা বিহ্বলভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন ঃ ধন্য মানুষ আপনি!

চা খেয়ে রামানন্দবাবু ঘরে ঢুকলেন কোট গায়ে দিতে। আমি এলুম সমুদ্রের ধারে। সূর্য পাটে নামছে, অস্তমিত হতে আর দেরি নেই। সমস্ত পশ্চিমের আকাশ নানা রঙে রঙীন হয়ে গেছে। আমার মন কিন্তু রঙীন হয়ে উঠল না। আমার মনে এল তপস্যার কথা। একাগ্র তপস্যায় মানুষ জীবনকে ভুলতে পারে, ভুলতে

পারে দুঃখ ও ভাবনাকে। আমার ভাবনা আমাকে অক্টোপাসের মতো চেপে ধরছে।

আমি কী দেখছিলুম কী ভাবছিলুম, মনে নেই। চমকে উঠলুম রামানন্দবাবুর কণ্ঠস্বরে। বললেন: কী সাংঘাতিক মানুষ আপনি মশাই!

কোটের উপর গরম চাদর জড়িয়ে তিনি সমুদ্রের ধারে এসেছেন। কান ঢেকেছেন মাফলার দিয়ে। আমি কিছু উত্তর দেবার আগে নিজেই আবার বললেন: সমুদ্রের ধারে এলে কি ফেরার কথা ভুলে যান? এখানে দেখবার কী আছে!

হয়তো কিছু নেই। কিন্তু আমি তো সমুদ্র দেখছিলুম না, আমি ডুবে গিয়েছিলুম নিজের মনের মধ্যেই। বললুম: এই ঠাণ্ডায় আপনি এখানে চলে এসেছেন!

আমার শীত করছিল না। খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেই বসে ছিলুম।

ভদ্রলোক বললেন: কী করি বলুন, প্রাণের দায়ে এখানে আসতে হল।

প্রাণের দায়ে!

প্রাণের দায়েই তো। একটা গোটা দিন কেটে গেল, কিছুই করা হল না। কালকের দিনটা যাতে নষ্ট না হয় তারই চেষ্টা।

ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলুম না।

ভদ্রলোক বললেন: আসুন আমার সঙ্গে, আমি সব বুঝিয়ে বলছি।

চারি দিক ঘিরে অন্ধকার নেমেছে। সেই অন্ধকারের ভিতর আমরা হোটেলের ঘরে ফিরে এলুম। টেবিলের উপর থেকে রামানন্দবাবু এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে বললেন: এখানে দেখবার কী কী জায়গা আছে শুনুন।

তিনি যে এই রকম কিছু একটা বলবেন, সেই সন্দেহ আমার হয়েছিল। নিরুৎসাহে বললুম: বলুন।

ভদ্রলোক তাঁর চশমা নাকে চড়িয়ে পড়লেনঃ স্বর্গদ্বার আমাদের হাতের কাছেই। সেখানে দেখবার অনেক কিছু আছে— নিমাই চৈতন্যের মঠ, বিদুরাশ্রম, মুলুকদাস বাবাজীর মঠ, স্বর্গদ্বার সখী, কানপাতা হনুমান, সুদামপুরী ও নানক পন্থীর মঠ। সেখানে পাতাল গঙ্গা নামেও মঠ আছে। তারপর কবির পন্থী মঠ, সিদ্ধবকুল মঠ, ঝাঞ্জপিটা মঠ, হরিদাস ঠাকুরের মঠ—

আপনি কি হোটেল ছেড়ে কোন মঠে গিয়ে উঠবেন ভাবছেন?

আমার কথায় কর্ণপাত না করে রামানন্দবাবু বললেনঃ সারস্বত গৌড়ীয় মঠ, শঙ্করাচার্যের গোবর্ধন মঠ—

বাধা দিয়ে আমি বললুমঃ আমার কথা শুনতে পেয়েছেন?

আগে আমার কথা শুনবেন তো! কষ্ট করে অমনি অমনি কি ডেকে আনলুম!

ঠিক কথা। ভদ্রলোকের পরিশ্রমের মূল্য আমাকে দিতে হবে। বললুমঃ আচ্ছা, আপনার কথাই বলুন।

রামানন্দবাবু আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখেন নি। তাঁর কাগজ থেকে পড়লেনঃ মন্দিরের পথে দ্রষ্টব্য স্থান অনেক আছে। বাসুদেব আশ্রম, সিদ্ধবকুল, গম্ভীরা, শ্বেতগঙ্গা। এ দিকে লোকনাথ মহাদেব, ও দিকে মার্কণ্ড সরোবর। বড় রাস্তার ওপর জগন্নাথ বল্লভ মঠ। নরেন্দ্র সরোবর ছাড়িয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যুগলানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি। আঠারো নালা, লক্ষ্মীজলা, মাসীর বাড়ি, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, চক্রতীর্থ, সোনার গৌরাঙ্গ।

অস্থির ভাবে বললুমঃ আমাকে কী করতে হবে?

কিছু না। কাল এই সব দেখবার ব্যবস্থা করেছি। আপনি সঙ্গে থাকবেন।

আমি?

ভয় পাচ্ছেন কেন! দু জনে এক রিক্সায় চাপব, আদ্ধেক ভাড়া।

আমি আপনার সঙ্গে যাব!

কেন যাবেন না! দেড় টাকায় আপনি এত জায়গা দেখতে পাবেন?

প্রশ্ন তো টাকার কথা নয়, প্রশ্ন হল রুচির। এত পরিশ্রম আমার সইবে না।

আপনিও যে দেখছি নটবরের মতো কথা বলছেন।

নটবর আবার কে?

আমাদের রিক্সাওয়ালা। তার ধারণা এই সমস্ত তিন দিনে দেখা উচিত। আপনিই বলুন, লেখাপড়া ছেড়ে রোজ আমি রিক্সা চেপেই ঘুরে বেড়াই আর কি!

আমি কী উত্তর দেব ভাবছিলুম। রামানন্দবাবু বললেন: এখন আর না বললে চলবে কেন, রিক্সাওয়ালাকে তো কাল সকাল সাতটাতেই আসতে বলেছি। আপনি গিয়ে সমুদ্রের ধারে বসে রইলেন, সে কি আমার দোষ!

দোষ আমারই, এ কথা স্বীকার না করলে হয়তো আরও বিপদ হবে। তাই নীরব রইলুম।

আমার মৌন ভাবকে সম্মতির লক্ষণ মনে করে রামানন্দবাবু খুশী হয়ে বললেন: ভাববেন না যে ভাড়াটা ভাগাভাগি করে দিতে হবে বলেই আপনাকে সঙ্গে নিতে চাইছি। এক দিনে এত জায়গা দেখতে হলে সাধারণত অনেক কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। নোট বুকে আমি সব টুকে নেব। তবু আপনি সঙ্গে থাকলে হয়তো কিছু খেই ধরিয়ে দিতে পারবেন।

আমার যা ভুলো মন, অত সব কি পারব!

অনেকক্ষণ থেকে এক জন লোক ঘর বার করছিল। এই বারে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল: কোনারক যাবেন বাবু?

রামানন্দবাবু হুঙ্কার দিলেন: তুমি সে কথা জিজ্ঞেস করবার কে?

ভয়ে ভয়ে লোকটি বলল: আমার বাস যাচ্ছে, তাই জিজ্ঞেস করছি।

রামানন্দবাবু বোধ হয় কিছু বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম: আমি যাব না।

আমিও না।

লোকটি বলল: ভুবনেশ্বর? উদয়গিরি খণ্ডগিরি সাক্ষী গোপাল?

আমি বললুম: না।

রামানন্দবাবুও বললেন: না।

লোকটি সরে গেল।

রামানন্দবাবু আমাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন: ব্যাপারটা কী মশাই?

প্রাইভেট বন্দোবস্ত। যাবার ইচ্ছা থাকলে একে বলে রাখুন। অল্প খরচে সব ঘুরিয়ে দেবে।

পথের উপর হঠাৎ যেন ঋতার গলা শুনতে পেলুম। ঋতাই তো। এক মুহূর্তে আমাদের সামনের রাস্তাটুকু কলরবে মুখর হয়ে গেল। তার বৌদির কানের কাছে মুখ এনে খুব আস্তে আস্তে যে কথা বলল, আমার তা শোনা উচিত ছিল না। কেন না আমাদের শোনাবার ইচ্ছা তার নিশ্চয়ই ছিল না। বলল: ছাগুলে গাড়ুলে।

ছেলেবেলায় মনে হল এই রকমের একটা গল্প পড়েছিলুম। সে গল্প আজ মনে নেই। ভাববারও অবকাশ পেলুম না। ঋতা চেঁচিয়ে উঠল: ওই যে দাদা, সেই বাসওয়ালা এসে ঘুরঘুর করছে। দাঁড়াও ওর মজা দেখাচ্ছি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই তাকে আক্রমণ করল: সন্ধ্যেবেলায় আসব বলে কাল কোথায় কেটে পড়েছিলে বাছা ধন?

নিজের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বাসওয়ালা বলল: কাল ফিরতে খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল।

দেরি হয়েছিল মানে! পথে বাস আটকে গিয়েছিল নাকি! তবে তো তোমার বাসে আমরা যাব না।

না না, বাস আটকাবে কেন! সকালবেলায় রাস্তা বন্ধ ছিল।

জলঝড় নেই, রাস্তা বন্ধ ছিল বললেই আমরা মেনে নেব ভাবছ! ও সব চালাকি আমাদের কাছে চলবে না।

বাসওয়ালা তার ঘাড় থেকে হাত নামিয়ে দু হাত কচলাতে লাগল। বলল: জলঝড়ে তো আটকায় নি, আমাদের ড্রাইভার তা হলে উড়িয়ে আনতে পারত।

আমি আর পারছি নে বাবা।

বলে তার বৌদি গিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

ঋতা বলল: তবে আটকাল কি পুলিসে? চোরাই মাল নিয়ে যাচ্ছিলে, না আফিং?

বিব্রত ভাবে বাসওয়ালা বলল: রাষ্ট্রপতি কোনারক যাবেন, তারই ব্যবস্থা হচ্ছে।

ঋতা হেসে আকুল হল: বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কোনারক যাবেন!

আশ্চর্য হয়ে ঋতার দাদা বললেন: তাতে হাসবার কী হল?

সে কথা বলব না বাবা: ঋতা জবাব দিল: কোথায় কোন্ টিকটিকি এসে বসে আছে, শেষে আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখুক আর কি!

বলে আমাদের দিকে তাকাল।

রামানন্দবাবু আমায় ঠেলা দিয়ে ফিসফিস করে বললেন: শুনেছেন, আমাদের টিকটিকি বলছে!

ঋতার দাদা বললেন: কী ব্যবস্থা করেছ তাই বল।

কাঁচুমাচু করে লোকটি বলল: আর একটি দিন মাপ করুন। পরশু ভুবনেশ্বর, আর তার পরের দিনই কোনারক।

কোনারক আগে নয় কেন?

রাস্তা মেরামত হচ্ছে, দু তিন দিন পরে গেলে কোনখানে আটকাতে হবে না।

ঋতা বলল: ভাল লোকের পাল্লাতেই পড়েছি। কাল আবার বলতে এসো না যে পিছিয়ে গেল।

তার দাদা বললেন: আমাদের বাড়ি ফেরার দিন কিন্তু পেছবে না।

বলে তিনিও ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন। ঋতা ঢুকল তাঁর পিছনে। বলল: একটু চা খাবে দাদা?

মন্দ লাগবে না।

ভিতর থেকে বৌদির গলাও শুনতে পেলুম: যেমন ভাই, বোনও তেমনি। চা খেলেই যেন পেট ভরবে, আর কিছু খেতে হবে না!

রামানন্দবাবুকে বড় অস্বাভাবিক লাগছিল। তিনি লাফিয়ে উঠে সেই বাসওয়ালাকে টেনে এনে বললেন: ব্যাপারটা কী বল তো!

লোকটি একটু ভয় পেয়েছিল। ঠিক এমন করে গ্রেপ্তার হবার আশঙ্কা করে নি। বলল: যাবেন আপনারা? দুখানা সীট রাখব?

ভাড়া কত নেবে?

ভাড়া আপনাদের কাছে এক পয়সাও বেশি নেব না। ভুবনেশ্বরের সাড়ে চার টাকা, আর সাত টাকা কোনারকের।

বল কি!

রামানন্দবাবু যেন চমকে উঠলেন।

বেশ তো, আপনি আরও দু এক জনের সঙ্গে কথা বলে দেখুন। কেউ যদি কমে যায়, আমাকে একটা পয়সাও দেবেন না।

না না, ও সব কাজের কথা নয়। আমরা দুখানা করে টিকিট কিনব, একটু সস্তা করে দাও।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম : একটু আগে যে আপনি যাবেন না বললেন !

আমি তো একগুঁয়ে নই মশাই : রামানন্দবাবু উত্তর দিলেন : যে একবার বললে সেইটেই আঁকড়ে থাকব।

মনে মনে আমি হাসলুম। মুখে বললুম : তা বটে।

বাসওয়ালা ততক্ষণে তার খাতা খুলে টুকে নিয়েছে। বলল : সকাল সাতটায় এইখেন থেকে আপনাদের তুলে নেব।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : ফেরাবে কখন ?

সে তো কতকটা আপনাদের ওপরেই নির্ভর করছে। দেখতে যত সময় নেবেন, তত দেরি হবে।

তবু ?

বিকেল চারটে ধরুন।

রামানন্দবাবু বললেন : টাকার হিসেব ঐ রইল। মাথা পিছু এক টাকা বাদ।

আজ্ঞে তা পারব না। ঘুরে এসে নিজেও আপনি বলতে চাইবেন না।

সাত টাকা বড্ড বেশি হচ্ছে।

লোকটি করুণ ভাবে তাকাল আমার মুখের দিকে।

রামানন্দবাবু বললেন : এটা তোমাকে কমাতেই হবে।

কেউ জানতে পেলে—

কেউ জানবে না, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।

তবে আট আনা কাটুন, এক টাকা কাটলে আমি মরে যাব।

এসব দরাদরি আমার ভাল লাগে না। তাই বাসওয়ালাকে বললুম : পালাও এখান থেকে।

বাসওয়ালা নিজেও তা বুঝেছিল। ঊর্ধ্বশ্বাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রামানন্দবাবু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন : আট গণ্ডা আপনি বেশি খরচ করালেন।

আপনি যে আমার ষোল আনাই বেশি খরচ করাচ্ছেন! আপনি নিজে যাবেন যান, আমাকে কেন সঙ্গে টানছেন!

রামানন্দবাবু ঋতাদের দরজার দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে বললেন: বলেন কি মশাই, এ সব না দেখেই কলকাতায় ফিরবেন!

হেসে বললুম: দেখবার শখ আপনার এখনও মিটল না! বয়স তো আপনার অনেক হয়েছে!

বয়স! বয়সের সঙ্গে সখের কী আছে মশাই!

তা বটে। বায়াত্তুরে বুড়োও গোঁফে আতর মাখে শুনেছি।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চাইলেন কটমট করে।

এখন শুনতে পাই, এ অঞ্চলের পথঘাট ও যানবাহনের উন্নতি হয়েছে অনেক। টুরিস্ট সার্ভিস হয়েছে। খুব আরামপ্রদ বাস, গাইড, মাইকের ব্যবস্থা। এক দিনেই কোনার্ক ও ভুবনেশ্বর দেখে আসা যায়। পুরী হোটেলের সামনে থেকে বাস ছাড়ে সকাল সোয়া ছটায়। সাক্ষী গোপালে দাঁড়ায় কুড়ি মিনিট, আর দশ মিনিট পিপ্লিতে। তারপর কোনার্কে দু ঘণ্টা। সেখানেই দুপুরের আহার। তারপর ভুবনেশ্বরের পথে ধৌলি গিরিতে দাঁড়ায় পনের মিনিটের জন্যে। এখানে নূতন নির্মিত হয়েছে শান্তি প্যাগোডা। তারপর ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে কেদার গৌরী মুক্তেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর মন্দির। পনের মিনিটে তাড়াহুড়ো করে সব দেখে নিতে হয়। উদয়গিরি খণ্ডগিরিতে দাঁড়ায় এক ঘণ্টার জন্যে। তারপর নন্দনকানন নামে একটি নতুন উদ্যানে সোয়া ঘণ্টায় দেখতে হয় চিড়িয়াখানা। এরই মধ্যে একটি জলাশয়ে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা আছে। খেলনা রেলগাড়িও আছে। ভুবনেশ্বরে মন্দিরের চেয়ে এই সব দেখতেই লোকে আজকাল বেশি ভালবাসে। চিল্কায় যাতায়াতের জন্যেও টুরিস্ট বাস আছে। কিন্তু তা রোজ ছাড়ে না। নৌকোয় চেপে লেকে ঘুরে বেড়াবার জন্য চার ঘণ্টা

সময় পাওয়া যায়। যাঁরা ঘুরে এসেছেন তাঁরা বলেন, বেশ সন্তোষজনক ব্যবস্থা। গীতাঞ্জলি তাজমহল রাজকমল নীলকমল—এই সব বাসের নাম। অন্য জায়গা থেকেও যাত্রী তোলার ব্যবস্থা আছে। পুরী হোটেলের পাশেই এদের বুকিং অফিস।

৬

ঘুম যখন ভাঙল, রাত তখনও শেষ হয় নি। বদ্ধ অন্ধকার ঘরের ভিতর পাথরের মতো ভারি হয়ে আছে। খোলা জানালা দিয়ে যেটুকু স্বচ্ছতা আসছে, জানালার কাছেই তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সমুদ্রের ডাক কিছুতেই ফুরোচ্ছে না। অবিশ্রান্ত ডাকছে। যখন ঘুমোতে যাই তখনও এ ডাক শুনেছি, ঘুম থেকে উঠেও শুনছি। এ গর্জনের কি শেষ নেই!

রামানন্দবাবু ঘুমে অচেতন হয়ে আছেন। আমি উঠে পড়লুম। সাবধানে দরজা খুলে বাহিরে এলুম।

পৃথিবীর এ কী রূপ! সামনে পথ আর বালি পেরিয়ে পৃথিবীটা বুঝি শেষ হয়ে গেছে। সমুদ্র নেই, আকাশও নেই; কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা নীল পর্দা দেখতে পাচ্ছি। মাথার উপরে যদি আকাশ থাকে, সেই আকাশেরই প্রান্ত দেখছি চোখের সামনে। পর্দার ঝালরের মতো তার নিচেটা অল্প অল্প দুলছে।

আমি আর ইট কাঠের আশ্রয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। মন আমার দেহটাকে টেনে নিয়ে গেল ওই কুয়াশায় আচ্ছন্ন রহস্যের দিকে।

সমুদ্রের কাছে গিয়ে আরও আশ্চর্য হলুম। বেলাভূমি জনশূন্য নয়। দূর থেকে যাদের দেখতে পাই নি, কাছে এসে তাদের দেখতে পেলুম। আমার মতো আরও অনেক পাগল এসে জুটেছে। আর জেলেরা করছে জলে নামবার উদ্যোগ। তাদের ছোট ছোট কাঠের নৌকো তীরের উপরে তোলা আছে। কালো কালো কতকগুলো মানুষ বিরাট লম্বা জাল নিয়ে টানাটানি করছে। তারপর সমুদ্রে নামবে। ভাসতে ভাসতে দৃষ্টির আড়ালে যাবে চলে। অপরাহ্ণে তাদের জাল গোটাবার পালা। একে একে সবাই আবার ফিরে আসবে।

আমার মতো যাঁরা বেড়াতে এসেছেন, তাঁদের চোখ পূর্বের আকাশে নিবদ্ধ। তাঁরা সূর্যোদয় দেখবেন। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে কী মায়া আছে জানি না, দেখবার জন্য মানুষ পাগলামি করে। গ্রামের মানুষ এ সব রোজ দেখে। খোলা মাঠে কিংবা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দেখে। শহরের লোক তা দেখতে পায় না। তাই তাদের ক্ষুধা থাকে জেগে, শহরের বাহিরে এসে তা দেখবার জন্য পাগলামি করে।

হঠাৎ আমি সেই ক্যামেরাওয়ালা ভদ্রলোককে দেখতে পেলুম। ভদ্রলোক তাঁর ক্যামেরা নিয়ে ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করছেন। লক্ষ্য তাঁর আকাশ। আমার মনে হয় যে তাঁর দলটিও হয়তো কাছে আছে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলুম না। হঠাৎ এক মহিলার দিকে নজর পড়ল। একখানা গরম শালে দেহটা ঢেকে দূর থেকে ভদ্রলোককে লক্ষ্য করছেন। এ সেই মহিলা, যিনি স্নানের সময় এগিয়ে এসে ক্যামেরার জন্য শোক প্রকাশ করেছিলেন! ইনি যে তাঁর স্ত্রী তাতে আর আমার সন্দেহ রইল না। কালই আমার নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। স্ত্রী না হলে কি এমন আগলে চলেন। এ বুঝি সন্তান আগলাবার চেয়েও বেশি জ্বালা। স্বামী ভুলো খেয়ালী বা পাগল হলে জ্বালার বুঝি শেষ নেই।

পূর্বের আকাশ তখন প্রতি মুহূর্তে রূপ পরিবর্তন করছে। কত বিচিত্র রঙ! শিল্পীর রঙের বাক্স বুঝি উল্টে গেছে। এত রূপ আর এত রঙ তার সারা দিন কোথায় থাকে! আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি।

পিছনে হঠাৎ ডাক শুনে আমি চমকে উঠলুম। ঋতার গলা: একি, গোপালবাবু!

আমি তার দু চোখ ভরা বিস্ময় দেখে বললুম: অমন আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?

কেন?

আমি কোন কথা না বলে তারই উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

ঋতা বলল: আপনিই বলুন, আমার কি আশ্চর্য হওয়া অন্যায়!

আমিও যে আশ্চর্য হচ্ছি!

কেন?

আপনাকে আশ্চর্য হতে দেখে।

আমি আশ্চর্য হব না!

কেন হবেন?

সাত সকালে যে আপনি সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন!

আপনিও তো এসেছেন, আরও এসেছেন এত সব মানুষ!

কাল আপনারা সারা দিনটা বারান্দায় বসে কাটালেন কিনা, তাই বলছি।

আমি এ কথার প্রতিবাদ করলুম না।

ঋতা বলল: আপনার সঙ্গী কোথায়?

ঘুমোচ্ছেন।

উনি আপনার আত্মীয় বুঝি?

না।

বন্ধু?

তা-ও না।

তবে?

যেমন আপনি, ঠিক তেমনি।

ব্যাপারটা যে ঋতা বুঝতে পারে নি, আমি তার চোখের দিকে তাকিয়েই তা বুঝতে পারলুম। বললুম: আপনাকে আমি প্রথম দেখেছি সমুদ্রের জলে, আর রামানন্দবাবুকে ট্রেনের কামরায়। এক দিন আগে আর পরে।

আমাকে সমুদ্রের জলে দেখেছেন?

ইচ্ছে করে দেখি নি।

তবে ?

আপনি এত চেঁচাচ্ছিলেন আর লাফাচ্ছিলেন যে সকলের মাঝে আমি আপনাকে চিনেছি।

ছি ছি, এ আপনার ভারি অন্যায়।

পারের সব্বাই এই অন্যায় করেছে। আমি বোকা বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলুম।

চালাক হলে কী করতেন ?

অসভ্য বলবেন না তো ?

অসংকোচে ঋতা বলল : না।

আমিও অবাধে বললুম : দু চোখ ভরে রূপ দেখতুম, ক্যামেরা পেলে ছবি তুলতুম, তারপর—

ঋতা লজ্জা পেল কিনা জানি না, প্রশ্ন করল : তারপর ?

তার পর এই রকম। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখা।

আপনি তো অদ্ভুত মানুষ !

অদ্ভুত নই, বোকা বলুন।

মনে হল, ঋতা একটু বিব্রত বোধ করছে। তাই বললুম : চেহারাটাও তো বোকা বোকা, তাই এ কথা মেনে নিতে নিশ্চয়ই কোন কষ্ট হবে না।

ছি ছি, এ সব আপনি কী বলছেন ?

হেসে বললুম : দাদা বউদি কোথায় ?

ঋতা খানিকটা আরাম পেয়ে বলল : ওঁদের এখন মাঝ রাত। তারপরেই আমাকে জিজ্ঞাসা করল : আপনারা কত দিন থাকবেন এখানে ?

রামানন্দবাবুর কথা আমি জানি নে। জিজ্ঞাসা করি নি। নিজের কথাও ঠিক জানি নে।

সে কি !

পাঠশালা থেকে পালিয়ে এসেছি। গুরুমশাই অভয় না দিলে ফিরতে পারব না।

ঋতা খিলখিল করে হেসে উঠল; গুরুমশায়ের ভয় আপনার এখনও যায় নি! খুব মার খেতেন বুঝি?

ভাল গুরুমশায়রা মারেন কম, শুধু লাঠি উঁচিয়ে রাখেন। আমার গুরুমশায় ভাল না মন্দ, এখনও জানতে পারি নি।

এখনও আপনার গুরুমশায় আছেন?

আছেন বইকি। গুরুমশায়ের শাসন সারা জীবন ধরে। শুধু পাঠশালায় কেন, সমাজে সংসারে সর্বত্র গুরুমশায় আছেন। বাপ মা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র কন্যা সবারই শাসন আছে। যার কোন বালাই নেই, তার আছে বিবেক। বিবেকের বেত সব চেয়ে কড়া, মনের ওপর চাবুকের মতো দাগ কেটে পড়ে।

ঋতা হঠাৎ প্রশ্ন করে উঠল: আপনি বুঝি দর্শনের ছাত্র?

দর্শনের ছাত্র তো আমরা সবাই। আপনা থেকে তো জ্ঞান হয় না, জ্ঞান হয় দেখে। আমার মতো বোকারাই শুধু ঠেকে শেখে।

নিজেকে আপনি বারে বারে বোকা বলছেন কেন?

সবাই বলে কিনা, আমারও তাই সত্য বলে বিশ্বাস হয়েছে।

ঋতা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: দেখুন দেখুন।

পূর্ব দিকে মুখ করেই আমরা দাঁড়িয়েছিলুম। দেখলুম, দিগন্তের নিচে থেকে সূর্য উঠছে। চাঁদের মতো সূর্য। একটু বেশি লাল, কতকটা সিঁদুরের মতো। খানিক ক্ষণ পরে চাঁদের মতো সোনালী হবে না, হবে রূপোর মতো সাদা। জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ আলো ঝরবে না, বিদ্যুতের মতো তীব্র আলোয় চোখে ধাঁধা লাগবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, ক্যামেরার মালিক তখন তৎপর হয়ে উঠেছেন। আর তাঁর স্ত্রী এসে পাশে দাঁড়িয়ে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন।

কান পেতে আমি তাঁদের কথা শোনবার চেষ্টা করলুম। আমার মনে হচ্ছিল, আমি কিছু শুনতে পেয়েছি। সে হয়তো আমার অনুমানের কথা। মহিলা বলছিলেন: এইবারে তুলে নাও, আর দেরি কোরো না। সময় থাকলে আর একখানা নিও।

মামীর কথা আমার মনে পড়ল। তিনিও মামাকে নানা উপদেশ দেন। ভাবেন তাঁর পরামর্শ ছাড়া মামার এক পা-ও চলবার ক্ষমতা নেই। খানিকটা অহংকার হয়তো আছে, বাকি সবটাই মমতা। দীর্ঘ দিন এক সঙ্গে থাকার অনিবার্য ফল।

ঋতা বলল: আপনার চোখ আকাশে আছে, কিন্তু মন তো নেই!

মন অন্য দিকে আছে।

ঋতা বোধ হয় ভেবেছিল, আমি আবার কোন অসংলগ্ন কথা বলব। তাই সাহস করে কিছু জানতে চাইল না। আমিই বললুম: আপনার দিকেও মন নেই।

আমার দিকে কেন থাকবে!

সেই ভয় করেছিলেন বলেই তো জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলেন না!

আপনি একটু বাড়াবাড়ি করছেন।

তবে থাক।

আমি এগিয়ে যাচ্ছিলুম, কিন্তু ঋতা বাধা দিয়ে বলল: রাগ করছেন কেন?

রাগ নয়, হতাশ হয়েছি।

কেন?

আপনাকে খুব প্র্যাকটিকাল মনে হয়েছিল। মিনমিনে ন্যাকামির জন্যে সিনেমার নায়িকা খুঁজব কিংবা উপন্যাসের। আপনাকে আমি নায়িকা ভাবি নি।

এখন কি তাই ভাবছেন?

কিছুই ভাবছি নে। ভাবা আমার স্বভাব নয়।

তবে আপনি কী করেন?

কিছু না।

এ কি কোন উত্তর হল?

আপনি কী করেন?

আমি?

হ্যাঁ আপনি।

আমি তো কিছুই করি না।

দেখলেন তো। উত্তরটা একই হল। কোন মেয়ে সামনে এলে তাকে দেখেই আমরা ক্ষান্ত হই। তাকে নিয়ে ভাবতেও বসি নে, হা-হুতাশও করি নে। মেয়েদের সম্বন্ধে দুর্বলতার যুগ চলে গেছে। বুদ্ধির একটু গোলমাল না থাকলে নিজেকে কেউ রোমিও ভাবে না। আর পথচারী নারীকে ভাবে না হেলেন।

আপনার মধ্যে কবিত্বও আছে দেখছি।

আমি কিন্তু সূর্যের উপর থেকে আমার চোখ সরাই নি। আকাশের রঙের খেলা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। স্বল্পালোকিত আকাশ দেখে একটু আগে মনে হয় নি যে আজ সূর্যোদয় হবে। এমন দুর্ঘটনার কথা শুনেছি। অগণিত তৃষিত নরনারীকে হতাশ করে সূর্য একেবারে উপরে উঠেছে। জ্যোতিষ্মান সূর্য। আজ আমরা সমুদ্রের উপর সূর্যোদয় দেখছি। মনে হচ্ছে, সূর্য উঠছে সমুদ্রের ভিতর থেকে। আরও মনে হচ্ছে, চুম্বকের মতো একটা শক্তি তাকে টেনে রাখছে। সূর্যকে আর গোল দেখাচ্ছে না। কলসের মতো আকার হয়েছে। ঋতার উত্তর দিতে আমি ভুলে গেলুম।

হঠাৎ এক সময় মনে হল যে সূর্যের নিচের আকর্ষণ গেল ছিঁড়ে। এক লাফে খানিকটা উঠেই আবার গোল হয়ে গেল। দেখতে পাই নি, আকাশ আবার কখন রক্তিম হয়ে গেছে। দূরে বুঝি সমুদ্রের সীমা দেখতে পাচ্ছি। সমুদ্র ফুলে উঠে আকাশের সঙ্গে মিশেছে।

এমন দৃশ্য আরও বোধ হয় অন্য স্থানে দেখেছি। কোথায় দেখেছি মনে করতে পারলুম না।

ঋতাও মুগ্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখল। এক সময় স্বগত ভাবে বলল অদ্ভুত সুন্দর

সামনের মহিলার গলা শুনতে পেলুম: কলসীর ছবি ঠিক নিয়েছ তো?

নিয়েছি সময় মতোই, এখন উঠলে হয়।

কেন উঠবে না?

শাটারটা কেমন শব্দ করছে। নোনা জলে মরচে না পড়ে।

তা হলে কী হবে?

ভদ্রলোক তাঁর সন্দেহের কথাটা চেপে গিয়ে বললেন: চল, এবারে ফেরা যাক। চায়ের জন্যে মন কেমন করছে।

কাল সূর্যাস্তের সময় সমুদ্রের রঙ দেখেছি। নীল নয়, এনামেল পেইন্টের মতো ঝকঝকে সাদা। নীলের রেখা দেখেছি তরঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে। সূর্যাস্তের পরও ঠিক নীল হল না। কালচে ছাইএর মতো একটা গম্ভীর রঙ হল। জল কখনও নীল হয় কিনা জানি নে।

সমুদ্রের তীরে তীরে আমরা ফিরছি। পায়ের নিচের বালিও কতকটা জলের মতো। এই বালিকে দূর থেকে জল মনে হবে।

ঋতা হঠাৎ বলে উঠল: পশ্চিমের আকাশটাকে এখন অন্য পৃথিবীর আকাশ মনে হচ্ছে।

আর জলটাকে?

ঋতা একবার পিছনে ফিরে পূর্বের আকাশ আর জল দেখল, তারপর বলল: একেবারে অন্য রকম।

সমুদ্রের স্থির জল খানিকটা দূর থেকে সাপের ফণার মতো ফুলে উঠছে। ধেয়ে আসছে, কিন্তু তীরের উপর আছড়ে পড়ছে না। কাছাকাছি এসেই ফেটে ভেঙে জলপ্রপাতের মতো গড়িয়ে পড়ছে। এক রাশ সাদা জল নীল জলের উপর পড়ে তীরের

কাছটা তোলপাড় করে দিচ্ছে। কাল স্নান করতে এসে আমি সমুদ্রের এই রূপ দেখেছি প্রাণ ভরে।

হঠাৎ এক জায়গায় ভিড় দেখে আমরা থমকে দাঁড়ালুম। ভ্রমণ-বিলাসী একদল নরনারী কী একটা ঘিরে কৌতূহল ও আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে। ঋতা বলল : ও কী গোপালবাবু ?

বললুম : মাছ।

মাছ !

এই দিকে দেখুন। জেলেদের ঐ ছোট নৌকোটা আসছে। ওটাকেও অমনি ঘিরে ফেলবার জন্যে এই মানুষগুলো অপেক্ষা করে আছে।

উঁকি দিয়ে আমরা মাছ দেখলুম। ছোট ছোট মাছে জাল ভর্তি হয়ে গেছে। জেলেরা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে সেই মাছ নৌকোর ভিতর রাখছে।

ঋতা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : দেখছেন গোপালবাবু !

তার ছেলেমানুষির পরিচয় পেয়ে আমি হাসলুম। যে নৌকোটা তীরে এসে ঠেকেছিল, জেলেরা সেটা কাঁধে করে শুকনো ডাঙ্গার উপর সরিয়ে আনছে। এই দৃশ্য ঋতার অদ্ভুত ভাল লেগেছে। বলল : এই সব জিনিসের ছবি নিতে হয়। প্রকৃতির চেয়ে মানুষই তো বেশি ইণ্টারেস্টিং।

তবে প্রকৃতির আকর্ষণ অনেক বেশি।

মানুষের চেয়েও ?

মানুষ যত বড় হয়, তত বেশি লোককে সে আকর্ষণ করতে পারে। প্রকৃতির আকর্ষণ ধর্মের মতো, তার শেষ নেই।

মনে হল, ঋতা আমার কথা পুরোপুরি বুঝতে পারে নি। তাই বললুম : সাধারণ মানুষ টানে এক জন দু জন দশ জনকে। সেই মানুষ যত অসাধারণ হবে, তত বেশি লোককে সে টানবে। একদা নীলাচলে মহাপ্রভুকে দেখবার জন্য দেশের সমস্ত লোক ভেঙে

পড়ত। আজ তারা জগন্নাথ দর্শনে আসে, আসে সমুদ্র দেখতে। শেষ রাতে উঠে এত লোক এসেছে সমুদ্রের ধারে। কিন্তু ঐ ক্যামেরাওয়ালা ভদ্রলোকের জন্যে শুধু তাঁর স্ত্রী এসেছেন। কাল হয়তো আমার জন্যে আপনি আসবেন, কিংবা আপনার জন্যে আমি।

ঋতা রাগত ভাবে বলল: বলিহারি আপনার শখ।

শখ নয়, আকর্ষণ বলুন। ওটা তো যুক্তি মেনে চলে না, চললে সুবিধে হত।

ঋতা অনেক ক্ষণ কোন কথা কইল না। অনেক দূরে বড় রাস্তার প্রায় শেষ প্রান্তে আমাদের হোটেল দেখা যাচ্ছে। বাহিরের চেয়ারে বসে কারা সমুদ্রের শোভা দেখছেন।

এক সময় ঋতা বলল: আজ আপনারা কী করবেন?

বললুম: বালির উপর শুয়ে থাকবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু রামানন্দবাবু আজ পুরী পরিক্রমায় বেরোতে চান। আমি সঙ্গে থাকলে তাঁর রিক্সা ভাড়া আদ্ধেক লাগবে।

আপনি যাবেন তা হলে?

পুরো ভাড়াটা যদি রেহাই পাই, তবে যাব না।

ঋতা আশ্চর্য হয়ে বলল: বেড়াতে আপনার ভাল লাগে না?

না।

তবে এখানে এসেছেন কেন?

কিছু না করতে।

ঋতা আমার মুখের দিকে তাকাল। কী ভাবল সে-ই জানে, পথে আর কোন কথা কইল না।

একজন বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে রামানন্দবাবু বাহিরে বসে ছিলেন। ঋতাকে আমার সঙ্গে ফিরতে দেখে চমকে উঠলেন ভূত দেখার মতন। ঋতা তাঁকে আরও চমকে দিয়ে বলল : রামানন্দবাবু আজ কোথায় বেড়াতে যাচ্ছেন ?

সসম্ভ্রমে রামানন্দবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বললেন : যেখানে বলবেন।

আপনি নিজে কিছু ঠিক করেন নি ?

সে আবার ঠিক করা ! নটবর যা বলেছে, তাই মেনে নিয়েছি।

নটবর বুঝি আপনার রিক্সাওয়ালা ?

নটবর্ নয়, নটবর, রঅ ।

ঋতা হেসে বলল : কোথায় কোথায় আপনাকে নিয়ে যাবে ?

ভদ্রলোক এক রকম ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন, তার পরমুহূর্তেই তাঁর খাতা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। খসখস করে পাতা উল্টে পড়তে শুরু করলেন : স্বর্গদ্বারে নিমাই চৈতন্যের মঠ, বিদুরাশ্রম, মুলুকদাস বাবাজীর মঠ, স্বর্গদ্বার সখী, কানপাতা হনুমান—

ঋতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

ও পাশের ঘর থেকে তার বৌদি ডাকলেন : ঋতা—

আসছি বৌদি।

হাসি শুনে রামানন্দবাবু থেমে গিয়েছিলেন, আবার শুরু করবেন কিনা ভাবছিলেন। ঋতা বলল : আমাকে সঙ্গে নেবেন ?

সঙ্গে ?

রিক্সার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আমাদের নাথ আসবে।

ঋতা নাথ্ বলল না, শুদ্ধ ভাবে নাথ বলল, থঅ। তার পরেই ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রামানন্দবাবু বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে। হেসে বললুম: আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে চাইছিল।

রামানন্দবাবু অভিভূত হয়ে বললেন: সত্যি!

সত্যি কি মিথ্যে, সে তো নিজের কানেই শুনতে পেলেন।

ব্যস্ত ভাবে ভদ্রলোক বললেন: তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিই আসুন।

যে বুড়ো ভদ্রলোক হাঁ করে বসে ছিলেন, আমি তাঁকে নমস্কার করেছিলুম। তিনিও নিঃশব্দে আমাকে উত্তর দিয়েছেন। এইবার পরিচয় হল। ভদ্রলোকের নাম মিস্টার নিগম, দেশে এবং বিদেশে ব্যবসা আছে, সাদাসিধে অমায়িক ভদ্রলোক। হিন্দীতে আমার সঙ্গে কথা শুরু করেছিলেন। কিন্তু রামানন্দবাবুর তর সইছিল না। তিনি আমাকে তৈরি হবার জন্য টেনে নিয়ে গেলেন। আমার দিকে চেয়ে নিগমবাবু শুধু হাসলেন।

নটবর সাতটার আগেই এল। রামানন্দবাবু তখন অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন। নটবরকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন: নাথ কোথায়?

নাথ!

আরে তোদের রিক্সাওয়ালা নাথ।

আমি বললুম: আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! প্রভু নাথ জগন্নাথ সবাই এসে সময় মতো হাজির হবে।

আস্তে আস্তে বললুম: এবারে তো ভাল সঙ্গী পেয়েছেন, আমাকে রেহাই দিন না।

একা আমার সঙ্গে বেরোবেন কি?

আমার সঙ্গে তো বেরিয়েছিলেন!

তা বটে।

আমার প্রস্তাব যে রামানন্দবাবুর ভাল লেগেছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে সে কথা কী করে বলা যায়! একটু ভেবে

বললেনঃ আপনার তো যাবার একেবারে ইচ্ছেই ছিল না, আমিই জোর করে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

ঠিক কথা।

তবে সে কথাটা আপনিই বলুন।

নিশ্চয়ই বলব।

নিগমবাবু অল্প অল্প বাঙলা বোঝেন। হিন্দিতে আমাকে বললেনঃ ঘরে বসেই বা কী করবেন! তার চেয়ে একটু ঘুরে আসলে মন ভাল লাগবে।

মন ভাল লাগার কথায় আমি চমকে উঠলুম। বুড়ো কি আমার মনের সংবাদ খানিকটা পেয়েছেন, না এই নিস্পৃহতায় সন্দেহ করছেন আমাকে। বললুমঃ আপনার সঙ্গেই গল্প করে সময়টা বেশ কাটবে।

ঠিক এই সময়েই ঋতা বেরোল সেজেগুজে। রামানন্দবাবু আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাড়া দিলেন নটবরকে।

ঋতা বললঃ নাথ তো একা আসবে না, আরও একজনকে ধরে আনবে। দাদা বৌদিও বেরোবেন তো!

তাই বুঝি!

রামানন্দবাবু খানিকটা ঝিমিয়ে পড়লেন। তার পরে সামলে নিয়ে আমাকে বললেনঃ এখানে বসে থেকেই বা কী করবেন!

নিগমবাবু বললেনঃ যান যান, ঘুরে আস্থন। বসে গল্প করবার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

ঋতা বললঃ আপনি কি যাবেন না ভাবছেন?

রেহাই পেলে কৃতার্থ হই।

না, খোশামোদ চাই?

চাইবার অনেক বড় জিনিস আছে। সামান্য খোশামোদের জন্যে কেন ভিখিরি সাজব!

এক সময় নাথ এল। সঙ্গে আর একজন রিক্সাওয়ালা। ঋতা

তার বোনের সঙ্গে মাথের রিক্সায় উঠল, তার দাদা উঠলেন আর একখানায়। ইচ্ছে করলে রামানন্দবাবু ওদের সঙ্গেই যেতে পারতেন। কিন্তু নটবর আগে থেকে এসে বসে আছে। সে গোলমাল শুরু করবে। কাজেই আমাকে ছেড়ে যেতে তাঁর আপত্তি হল। ঋতার দাদাও বললেন: এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে, দুর্গা বলে উঠে পড়ুন।

বেশি আপত্তি করলে বিসদৃশ দেখাবে, তাইতেই আমি রিক্সায় উঠলুম।

ঋতারা আগে চলেছে, আমরা পিছনে। রামানন্দবাবুর বাঁ হাতে নোট বুক আর ডান হাতে কলম। আমাকে বললেন: এদের মশাই বিশ্বাস নেই। যখন ভাড়া ঠিক করে, তখন নাম করে ছত্রিশ জায়গার। মনে না রাখলেই বিপদ। রাস্তার ধারের গাছ আর পাথর দেখিয়ে সংখ্যা পূর্ণ করে দেবে।

আপনারি সঙ্গে তো আর চালাকি চলবে না!

রামানন্দবাবু খুশী হয়ে বললেন: এই নটবর, মুখ বন্ধ করে চলেছিস কেন?

নটবর বলল: এই যা, ওরা তো বেঁকল না বাবু। হরিদাস ঠাকুরের সমাধি কি দেখবেন না?

কী বিপদ!

রামানন্দবাবু এক বার এ ধারে দেখলেন, আর এক বার তাকালেন সামনের দিকে। আমার মুখের দিকেও তাকালেন এক বার। নটবর থামতে চাইছিল, কিন্তু রামানন্দবাবু বললেন: চল চল, ওদের পেছনেই চল। ও জায়গা না হয় ফেরার পথেই দেখব।

তার তো সুবিধে নেই বাবু, ফেরার অন্য রাস্তা।

আমি বললুম: দেখবার কী ছিল তাই বল!

নটবর বলল: হরিদাস ঠাকুরের নাম তো শুনেছেন, গৌরাঙ্গ

ভক্ত হরিদাস! সেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত মহাপ্রভু আর রাধারমনের মূর্তি।

বাস্ বাস্, ওতেই আমাদের কাজ চলবে।

নটবর বলল: ঐ পথেই ছিল সারস্বত গৌড়ীয় মঠ। সেখানে বিষ্ণু লক্ষ্মী ও শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি। এখানে মঠের শেষ নেই বাবু, পুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ, মিশন গৌড়ীয় মঠ, আর গোবর্ধন মঠ।

গোবর্ধন মঠ তো শঙ্করাচার্যের!

এ সব পুরনো কথা। শঙ্করাচার্য ভারতে যে চারটি মঠ স্থাপন করেছিলেন বেদান্ত চর্চার জন্য, তার মধ্যে দ্বারকার সারদা মঠ দেখেছি, দক্ষিণে শুনেছি শৃঙ্গেরী মঠের নাম, আর হিমালয়ের উপর যোশী মঠ। শঙ্করাচার্য শুধু ধর্ম রক্ষা করেন নি, দেশকেও রক্ষা করেছিলেন। আজ তাঁর সম্মান রক্ষার কী ব্যবস্থা আছে, চুপি চুপি গিয়ে দেখে আসব।

রামানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: গোবর্ধন মঠে কী দেখবার আছে?

নটবর এক নিঃশ্বাসে বলে গেল: ভুবনেশ্বরী, পঞ্চরুদ্র, সত্যনারায়ণ, গৌরীশঙ্কর মহাদেব, গোপাল মূর্তি ও শঙ্করাচার্যের মূর্তি। রাস্তা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে মন্দির। টবে তাদের প্রচুর ফুলপাতার গাছ।

পথ চলতে চলতেই নটবর বলল: ওদিকে না গিয়ে ভালই হয়েছে। বালিবে কিম্‌তি যিবা।

নটবরের মুখে হঠাৎ তার দেশের ভাষা শোনা গেল। রামানন্দবাবু বলে উঠলেন: ওটা কী হল!

নটবর তার অনবধানতার জন্য লজ্জা পেল। বলল: সমুদ্রের মতো বালি বাবু, গাড়ি ঠেলতে হয়, অথচ পা চলে না।

রিক্সা থেকে নেমে নেমে আমরা কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখলুম। বাসুদেব আশ্রমে কৃষ্ণ মূর্তি দেখলুম, সিদ্ধ বকুলে সেই প্রাচীন বকুল

গাছ। গাছের গোড়া ফেটে গেছে চোচির হয়ে, শুধু বাকলের সঙ্গে যুক্ত থেকে অত বড় একটা গাছ মাটি থেকে রস গ্রহণ করছে। নটবর বলল : বুঝলেন বাবু, এই বকুলের নিচে তপস্যা করে যবন হরিদাস সিদ্ধি লাভ করছিলেন।

নাথ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল : বকুলের কাহিনী বড় অদ্ভুত বাবু।

ঋতা বলল : থাম থাম, রাস্তায় আর তোমায় কাহিনী শোনাতে হবে না।

পরে শুনেছি যে এই বকুল গাছটি আর নেই।

গম্ভীরার আবহাওয়া সত্যিই বড় গম্ভীর, বড় শান্তিপ্রদ। সেখানে আমরা মহাপ্রভুর পাদুকা কমণ্ডলু ও কাঁথা দেখতে পেলুম। আর দেখলুম রাধাকান্ত মন্দির। বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য যেখানে মহাপ্রভুর সঙ্গে বেদান্তের তর্ক করেন, সে জায়গাটিও দেখলুম। মনে হল, এ সব জায়গা ঠিক এমন করে দেখবার নয়। এখানে এসে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে হয়। এই ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে হৃদয় আপ্লুত হবে, দেবতার দর্শন হবে চিন্তার গভীরতায়।

রিক্সায় চেপে রামানন্দবাবু বললেন : বকুলের কাহিনীটা বল তো নটবর।

নটবর যে ফাঁপরে পড়েছে তা আমি পিছনে বসেই বুঝতে পারলুম। কিন্তু হার মানবার ছেলে সে নয়, বলল : সে আর এমন কী গল্প! তেমন বাজ পড়লে তো গাছ পুড়েই যায়!

তাকে একটু আরাম দেবার জন্য আমি বললুম : থাক তোমার বকুলের গল্প, তার চেয়ে এবারে কী দেখাবে তাই বল।

নটবর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, বলল : এবারে সোজা শ্বেত গঙ্গা, সেখানে শ্বেত মাধব দেখবেন। সেখান থেকে মার্কণ্ড সরোবর।

রামানন্দবাবু বললেন : ওঁদের রিক্সাওয়ালা এর চেয়ে জানে বেশি।

আমি বললুম : তার জন্যে আপনি ভাবছেন কেন! বাজার থেকে একখানা জগন্নাথক্ষেত্র মাহাত্ম্য কেনা যাবে। এ সব খবর তাতে নির্ভুল থাকবে।

রামানন্দবাবু অপরিমিত খুশী হলেন, বললেন : ঠিক বলেছেন।

শ্বেত গঙ্গা একটি বাঁধানো চতুষ্কোণ সরোবর। পথের ধারে নেমে এই সরোবরের তীরে এসে দাঁড়াতেই অপর পারে খানিকটা দূরে জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া দেখা গেল। ঋতা তার দাদা বৌদির সঙ্গে অনেকটা এগিয়ে গেছে, কিন্তু পিছনে রামানন্দবাবুকে দেখতে পেলুম না। কোথা থেকে এক ব্রাহ্মণ এসে শ্বেত গঙ্গার বিবরণ শোনাতে শুরু করলেন। ত্রেতা যুগের কাহিনী। শত বৎসর অনশন করবার পর শ্বেতরাজ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে জগন্নাথদেবের অর্চনা করেছিলেন। এখন তিনি ভগবানের মৎস অবতারের সঙ্গে শ্বেত মাধব রূপে বিরাজিত।

ব্রাহ্মণকে আমি ইশারায় এগিয়ে দিয়ে রামানন্দবাবুর খোঁজে রাস্তায় ফিরে এলুম। ভদ্রলোক নাথর সঙ্গে কথা কইছিলেন। কথা শেষ করে প্রসন্ন মনে ফিরে দাঁড়াতেই আমাকে দেখতে পেলেন। লজ্জিত হলেন কিনা বুঝতে পারলুম না। বললেন : বুঝলেন গোপালবাবু, সেই গল্পটা শুনে নিলুম। আমাদের হতভাগাটা কিছুই জানে না।

বললুম : তাড়াতাড়ি দেখে নিন, নইলে আমাদের ফেলে রেখেই ঋতারা চলে যাবে।

অ্যাঁ, বলেন কি! এত তাড়াতাড়ি তারা চলে যাবে!

ভদ্রলোক তীরের মতো ছুটে গেলেন। শ্বেত গঙ্গা শ্বেত মাধব দর্শন করে ঋতাদের সঙ্গে এক সঙ্গেই ফিরলেন। ব্রাহ্মণটি সঙ্গ ছাড়েন নি। রিক্সার কাছে এসে তাঁর ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। নাথ বলল : খাণ্ডব বন দাহনের গল্প বলেছ তো ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ করুণ ভাবে তাকালেন।

বল নি?

কী করে বলি! কিছু বলতে গেলেই তো বকুনি খাচ্ছি!

চল চল।

বলে ঋতা তার বৌদির পাশে বসল।

আমরাও তাদের পিছনে চললুম। আমাদের রিক্সাচালক নটবরের অজ্ঞতায় যে রামানন্দবাবু ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তা তাঁর মুখের ভাব দেখেই বুঝতে পারছিলুম। কিন্তু তিনি কিছু বলবার আগেই নটবর বলল: নাথর এই দোষ। নিজের কাজ না করে সারাক্ষণ পরের চর্কায় তেল দেয়। আরে বাবা, তুই রিক্সাওয়ালা। ভাল করে রিক্সা চালালেই তোর ছুটি। ব্রাহ্মণ কী করল আর বলল, তা নিয়ে তোর মাথা ব্যথা কেন! কোনদিন কড়া সওয়ারি ওর গাড়িতে উঠলে নিশ্চয়ই লাথি খাবে।

খানিক ক্ষণ চুপ করে থেকে রামানন্দবাবু বললেন: হতভাগার পাকামি দেখেছেন! পাছে ওকে খাণ্ডব বন দাহনের গল্প জিজ্ঞাসা করি, তাই আগেই সাফাই গাইছে।

সে গল্প তো আপনি জানেন!

বলেছেন বেশ! এই শ্বেত গঙ্গার সঙ্গে সম্বন্ধটাও কি মহাভারতে লেখা আছে!

যা নেই, তা সত্য নয়। তা না জানার জন্যে দুঃখ কিসের!

মানে?

আমি নটবরকে জিজ্ঞাসা করলুম: এবারে কোথায় নটবর?

আজ্ঞে মার্কণ্ডেয় সরোবর।

রামানন্দবাবু খনিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন, তারপর বললেন: সিদ্ধ বকুলের গল্পটা বোধ হয় জানেন না?

জানি না স্বীকার করলুম।

ভদ্রলোক বললেন: যবন হরিদাস মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। তপস্যা করতেন প্রখর সূর্যের নিচে। এক দিন এক খণ্ড

বকুলের ডালে দাঁত ঘষতে ঘষতে মহাপ্রভু তাঁকে দেখতে এলেন। এসে তাঁর কষ্ট দেখে সেই ডালটি মাটিতে পুঁতে দিলেন। দেখতে দেখতে একটি বকুল গাছ বেড়ে উঠে তাঁর মাথার উপর স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করল।

অলৌকিক ব্যাপার!

তার পর শুনুন। জগন্নাথদেবের নবকলেবর হবে। রাজা বললেন, ঐ বকুল গাছটি চাই। কিছুতেই কোন কথা মানলেন না। লোক পাঠালেন গাছটা কাটবার জন্যে। তারা এসে দেখল, আশ্চর্য ব্যাপার! গাছ আছে, গুঁড়ি নেই। কাঠের বদলে ভেতরটা একেবারে ফাঁপা। শুধু বাকলের ওপর ডালপালা। সিদ্ধ বকুলের আজও সেই একই অবস্থা।

আমি কোন মন্তব্য করলুম না দেখে রামানন্দবাবু বললেন: বিশ্বাস করলেন না বুঝি?

বিশ্বাস না করে তো উপায় নেই। সিদ্ধ বকুল যে নিজের চোখে দেখে এলুম।

ঠিক বলেছেন। নিজের চোখে না দেখলে এ সব গল্প বিশ্বাস করা কঠিন।

মন্দিরের পিছন দিয়ে ঘুরে আমরা মার্কণ্ডেয় সরোবরে পৌঁছে গেলুম। বেশ গ্রাম্য পরিবেশ। কিন্তু সরোবরটি বাঁধানো। মন্দির রাস্তার ধারেই। রিক্সা থেকে নেমেই রামানন্দবাবু নাথর পিছনে ছুটলেন। কিন্তু আমি সবিস্ময়ে দেখলুম যে নাথ তাঁর কথার জবাব দিল না। রাগত ভাবে ভদ্রলোক ফিরে এলেন। আমি তাঁর ক্ষোভের কথা শুনলুম: ভারি দেমাক দেখছি। দু গণ্ডা পয়সা দিলে ঢের লোক পাওয়া যাবে!

পাওয়া নিশ্চয়ই গিয়েছিল। কেননা রিক্সায় বসেই ভদ্রলোক আমাকে শোনালেন মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র কথা। বললেন: এ সব গল্প আপনাকে গায়ে পড়ে কেন শোনাচ্ছি জানেন?

জানি না।

মানুষের স্মৃতি শক্তির একটা সীমা আছে। এতগুলো জায়গা দেখে ফেরবার পর সবই হয়তো গুলিয়ে ফেলব।

আমাকে কি আপনি সাক্ষী রাখছেন ?

আপনার বয়স কম, আপনার তো মনে রাখার বাধা নেই !

বাধা কারও নেই, কিন্তু মনে থাকে না সকলের।

বলবার জন্য রামানন্দবাবু ব্যস্ত হয়েছিলেন। বললেন: মহা-প্রলয়ের সময় মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে শ্রীক্ষেত্রের নিকটে এলেন এবং নীল পর্বতের ওপর অক্ষয় বটগাছ দেখতে পেলেন। কাছে গিয়ে আরও আশ্চর্য হলেন। বৃক্ষমূলে ভগবান নীল মাধব। তিনি বললেন, বৎস, ওপরে সর্বকালাত্মা বালকমূর্তি, তুমি তাঁর উদরে প্রবেশ কর। মহর্ষি তাঁর উদরে প্রবেশ করে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জীব-জগতের সাক্ষ্য পেলেন।

আশ্চর্য !

শুনুন তার পর। মহর্ষি যখন সেই উদর থেকে বেরিয়ে এলেন, ভগবান বললেন, তুমি তীর্থ নির্মাণ কর। তাঁরই আদেশে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় সুদর্শন চক্র দিয়ে অক্ষয় বটের বায়ু কোণে এই সরোবর নির্মাণ করলেন। নাম হল হরির খাত। মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেবের যে মন্দির দেখলেন, সত্য যুগে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তা নির্মাণ করে দিয়েছেন। আজ এই তীর্থ দর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হয়। এখন প্রতি বৎসর উৎসব হয় বারুণীতে।

গল্প শুনতে শুনতে আমার ঘুম আসছিল। রামানন্দবাবু আমায় জাগিয়ে দিয়ে বললেন: হতভাগা নাথর জন্যে আমার দু গণ্ডা পয়সা খরচ হয়ে গেল।

কেন খরচ করলেন ?

উপায় কী বলুন !

উপায় তো বলেছিলুম, বাজারে একখানা তীর্থ মাহাত্ম্য কেনা

যাবে।

রামানন্দবাবু তখন অন্য কথা ভাবছিলেন, বললেন: আমার কী মনে হয় জানেন? ঐ মেয়েটা নাথকে কিছু শিখিয়েছে।

কি করে বুঝলেন?

হাসছিল আমাকে দেখে। বলছিল, খাতায় টুকে রাখুন, নইলে ভুলে যাবেন।

তারপর একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললেন: কী ভুলই করেছি এক সঙ্গে বেরিয়ে।

বললুম: যেতে দিন না ওদের। আমরা ধীরে ধীরে যাব।

রামানন্দবাবুকে বড় অসহায় দেখাল। বললেন: এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে!

তারপর করুণ ভাবে তাকালেন সামনে রিক্সার দিকে।

৮

দ্রষ্টব্য স্থানের শেষ নেই পুরীতে। জগন্নাথদেবের মন্দির আজ আমরা দেখব না, তবু আমাদের দেখা আর শেষ হচ্ছে না। মহাদেবই কত! মার্কণ্ডেশ্বর কপোতেশ্বর লোকনাথ। রামানন্দবাবুর জেদ চেপে গেছে। নাথকে জিজ্ঞাসা না করেই তিনি সমস্ত খবর সংগ্রহ করছেন। কপোতেশ্বর নামের কাহিনীও যোগাড় করেছেন। মহাদেবের নাকি ইচ্ছা হল, তিনিও জগতে পূজ্য হবেন। কাজেই জগন্নাথ দেবকে সন্তুষ্ট করা দরকার। বিরজামণ্ডল ও নীলাচলের মধ্যে কুশস্থলী এক ভয়ানক স্থান। জল নেই, বৃক্ষলতা নেই। মহাদেব সেখানে জলাশয় খনন করলেন, উদ্যান করলেন সুদৃশ্য বৃক্ষ লতার। তারপর তপস্যার ক্লেশে কপোতাকার ধারণ করলেন। জগন্নাথ করুণাময়, তাই মহাদেব এখানে কপোতেশ্বর নামে পূজা পাচ্ছেন।

লোকনাথ মহাদেবেরও একটা কাহিনী আছে। সে রামায়ণের যুগের কাহিনী। রাম সীতা উদ্ধারে চলেছেন। এই নীলাচলের পশ্চিমে শবরদের দেশে এসে শিবলিঙ্গ পেলেন না। তখন শবর প্রদত্ত একটি লাউ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করলেন। সেই শিব আজ লাউক নাথ বা লোক নাথ নামে পরিচিত। শিবরাত্রিতে এখানে মেলা হয়।

তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই। তর্কের যে শেষ নেই। সীতা অপহৃতা হয়েছিলেন দণ্ডক বন থেকে, সেখান থেকে কিষ্কিন্ধ্যা দক্ষিণের পথ। শ্রীক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়ই আসেন নি। শবরীর সঙ্গে যুক্ত করেই বোধ হয় এই গল্প। অন্য সব কাহিনীও খুব দুর্বল। তা হোক। বুকে বিশ্বাস বেঁধেই মানুষ বাঁচে। বাঁচুক তারা।

সদর রাস্তার ধারে জগন্নাথবল্লভ একটি মঠ। প্রশস্ত উদ্যানের মধ্যে একটি মনোরম স্থান। রামানন্দবাবু একটা প্রবাদ সংগ্রহ

করেছেন। একদা পুরীর কোন রাজা বাম হাতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন ভ্রমে। তারপর গভীর ক্ষোভে সেই হাতটি কেটে ফেলে এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেন। সেই হাত নাকি বৃক্ষ রূপে আজও এই বাগানে আছে।

রায় রামানন্দ গোস্বামীর নামের সঙ্গে এই মঠের নাম বোধ হয় যুক্ত আছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কারও কোন আগ্রহ দেখলুম না।

নিকটে নরেন্দ্র সরোবর। স্বচ্ছ জলের বিরাট পুষ্করিণী। লোকে চন্দন পুষ্করিণীও বলে। এরই ধার দিয়ে বাঁধানো রাস্তায় আমরা আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি মন্দিরে এলুম। মনে হল না যে এই আচার্যের নামের সঙ্গে কেউ পরিচিত আছেন। এক জায়গায় তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাবের সন তারিখ লেখা। রামানন্দবাবুকে ডেকে ঋতা বলল: আপনার নোট বুক তাড়াতাড়ি বার করুন।

রামানন্দবাবু এগিয়ে এলেন হন্তদন্ত ভাবে।

ঋতা বলল: লিখুন, আবির্ভাব ১২৪৮ সন উনিশে শ্রাবণ ঝুলন পুর্ণিমা, আর তিরোভাব ১৩০৬ সন বাইশে জ্যৈষ্ঠ। হল?

হাতের উপর খাতা ধরে রামানন্দবাবু লিখছিলেন, বললেন: ১৩০০ সন—

ঋতা বলল: বাইশে জ্যৈষ্ঠ।

রামানন্দবাবু টেনে টেনে বললেন: বাইশে জ্যৈষ্ঠ।

তারপর লিখুন, গোস্বামী প্রভুর ঢাকাস্থ ভজন কুটীর গাত্রে স্বহস্তে লিখিত উপদেশ—

ওঁ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যায় নমঃ

এইছা দিন নাহি রহেগা।

১। আত্মপ্রশংসা করিও না।

২। পরনিন্দা করিও না।

৩। অহিংসা পরমোধর্ম।

৪। সর্বজীবে দয়া কর।

৫। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর।

৬। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর।

৭। নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ।

রামানন্দবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন: দাঁড়ান দাঁড়ান। আস্তে আস্তে বলুন।

আমি অন্য ধারে একটি নির্জন স্থানে এসে বসলুম।

বিজয়কৃষ্ণের জীবনের সমস্ত ঘটনা আমার জানা নেই। যেটুকু জানি তা আমার ভাল লাগে। ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা আমরা তাঁর প্রথম জীবন থেকেই দেখতে পাই। এক বার এক শিষ্য তাঁর পা ধুইয়ে দিচ্ছিল। তিনি তাতে খুশী হতে পারলেন না। ভাবলেন যে মানুষকে তিনি ঠকাচ্ছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে উপনিষদের ব্যাখ্যা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। সমাজের আচার্যও ছিলেন। তার পর তিনি অন্য পথ নিলেন।

আর একটি গল্প আমার মনে পড়ল। জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরকে অনেক সাধু বঞ্চনা করেছেন। তাই এক বার বিজয়কৃষ্ণের কাছে সাধুর লক্ষণ জানতে পাঠিয়েছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ জানিয়েছিলেন, যিনি নিজের প্রশংসা করেন না, পরের নিন্দা করেন না, আর ধনীর অতিথি হন না, তিনিই সাধু।

এই নিঃসম্বল সাধু পুরীতে এসে ধনী হয়েছিলেন। মানুষ তাঁকে অঞ্জলি ভরে দিয়েছে। প্রাণের আবেগে দিয়েছে। বিজয়কৃষ্ণ তাঁদের কী দিয়েছিলেন তারাই জানে। সে সব কথা এই সমাধি মন্দিরে সম্পূর্ণ লেখা নেই। সংক্ষেপে যা আছে ঋতা তাই রামানন্দবাবুকে লিখতে বলছে। বলছে: তাড়াতাড়ি লিখুন। দাদা বৌদি দেখা শেষ করে বেরিয়ে গেল।

রামানন্দবাবু বলছেন : আপনার সবটাতেই একটু বেশি তাড়া।

তাড়া একটু বেশি বলেই তো আলাপও হয় তাড়াতাড়ি। আপনার বন্ধু কোথায়?

আমি আড়ালে ছিলুম, কিন্তু নিকটে। পরিষ্কার ভাবে তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলুম।

গোপালবাবু?

রামানন্দবাবু যে চমকে উঠেছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই তা বুঝতে পেরেছি।

ঋতা বলল : ভদ্রলোকের মাথায় একটু গোলমাল আছে, তাই না!

ঠিক বলেছেন।

কী গোলমাল বলুন তো?

নিশ্চয়ই গোলমাল।

তাতে তো সন্দেহ নেই। কিন্তু আর কিছু সন্দেহ করেছেন?

আর কী বলুন তো?

ঋতা বলল : চলুন তা হলে।

আমি জানি, রামানন্দবাবুর উত্তরে ঋতা খুশী হয় নি। হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তার কৌতূহলের কী কারণ! আমি কি নির্লিপ্ত থাকবার চেষ্টা করে সবার কৌতূহলের কারণ হচ্ছি! ছি ছি, এ যে আরও লজ্জার কথা!

ঋতার পাশে পাশে রামানন্দবাবু এগিয়ে গেলেন। আর দেরি না করে আমিও তাদের অনুসরণ করলুম।

একটুখানি এগিয়েই কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি আশ্রম। নিরিবিলি নির্জন্ স্থান। আশ্রমই বটে। কিন্তু আমার মন তখন অন্য রাজ্যে চলে গেছে। রামানন্দবাবু ঋতার দাদা বৌদির সঙ্গেও গল্প জমিয়ে ফেলেছেন। উৎসাহের সঙ্গে নানা কথা আলোচনা করছেন।

আমি ঋতার কথা ভাবছিলুম। মেয়েটার আচরণে আমার খটকা লেগেছে। রামানন্দবাবুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা যেন বাহিরের ব্যাপার। ভিতরে কোন মতলব হয়তো আছে। আমি কিছু অনুমান করতে পারি নি। কিন্তু সন্দেহ করবার সুযোগ পেয়েছি।

স্বাতির সঙ্গেও আমার এমনি করেই দেখা হয়েছিল, এমনি অকস্মাৎ অভাবিত রূপে। ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে সেই পরিচয় আমাদের ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছে। মতলব সে দিন কারও ছিল না, ছিল শুধু দুটি বীণার মতো প্রাণ। কখন এক সময় একই সুরে বাজতে শুরু করেছিলো। তাই দেখে দুজনেই বিস্মিত হয়েছিলুম, বিহ্বল হয়েছিলুম। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গিয়েছিল। ফেরার আর পথ ছিল না, বালির উপর পিছনের পায়ের চিহ্ন গিয়েছিল মুছে। এগিয়ে চলতেই হয়েছিল।

তার পর ?

তার পর আজ আমি পালিয়ে এসেছি। ভয়ে পালিয়েছি। সাহস থাকলে এমন করে লুকিয়ে থাকতুম না। ঋতা কে ? সে কি আর এক ছলনা নয় ! নারীই তো ছলনা ! আমার মনে হল, এই ঋতারা আমার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করবে, কারণ হবে আমার অপমৃত্যুর।

ছি ছি, এ সব আমি কী ভাবছি ! এ তো সুস্থ মানুষের ভাবনা নয় ! এ সব অদ্ভুত কথা আজ আমার কেন মনে হচ্ছে ! আমার মনোবল কি আজ আমি হারিয়ে ফেললুম !

এখান থেকে আমরা গ্রাম্য পথে আঠারো নালা দেখতে গেলুম। শহর ছাড়িয়ে সেই মনোরম স্থান। রাস্তার ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত দিগন্ত বিস্তৃত। শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য। রামানন্দবাবু বললেন: এও আবার কোন দ্রষ্টব্য বস্তু নাকি !

নটবর একটা উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করল। বলল: এ

নালা নয় বাবু, এ নদী, নাম ভাগীরথী। অনেক দিন আগে সমুদ্রের সঙ্গে যোগ ছিল। আজও তাই প্রতি বারো বছরে সমুদ্রের পুজো হয় এখানে।

রামানন্দবাবু বললেন: তবে আঠারো নালা নাম হল কেন?

সে, বাবু, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার জন্যে। নিজের আঠারোটা ছেলেকে তিনি এইখানে কেটেছিলেন।

বল কি!

রামানন্দবাবু যেন চমকে উঠলেন।

ঠিকই বলছি বাবু।

আরে নিজের ছেলেদের কেন কাটলেন, তা তো বলবে।

নটবর যে বিপদে পড়েছে তা বুঝতে পেরেছি। তাকে রক্ষা করবার জন্য বললুম: ছেলেদের কাটবার জন্যে নিশ্চয়ই কাটেন নি। দেশের বা দশের কল্যাণের জন্যেই বোধ হয় এমন একটা মর্মান্তিক কাজ করেছিলেন।

রামানন্দবাবু বললেন: নটবর একেবারেই নটবর। নাথ হলে নিশ্চয়ই বলতে পারত।

ধানের ক্ষেত দেখিয়ে নটবর বলল: এরই নাম লক্ষ্মী জলা। এই জমিতে বারো মাস ধান হয়।

এইখান থেকেই আমরা শহরের দিকে ফিরলুম নটবর বলল: এখন আমরা মাসির বাড়ি যাচ্ছি।

রামানন্দবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন: সে আবার কী!

গুণ্ডিচা বাড়ির নাম মাসির বাড়ি।

রামানন্দবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন: শুনুন কথা। মাসির বাড়ি যদি বা বুঝতে পাচ্ছিলুম, এ একেবারে গুলিয়ে দিল।

আমি তাঁকে সাহস দিয়ে বললুম: চলুন না, গিয়েই দেখি।

এক সময় একটা দেওয়ালের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নটবর বলে উঠল: এই হল মামার বাড়ি।

মামার বাড়ি!

রামানন্দবাবু বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

নটবর এক বার পিছন ফিরে তাকাল। দেখে আশ্চর্য হলুম যে সে দু পাটি দাঁত বার করে মনের আনন্দে হাসছে। রামানন্দবাবু চটে গিয়ে বললেন: হাসছিস যে!

বললুম: কোন রসিকতা করেছে নিশ্চয়ই।

আরও খানিকটা এগিয়ে ডান হাতে মোড় ফিরে তার রসিকতাটা বুঝতে পারলুম। সদর দরজায় প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। পুরীর জেলখানা এটি।

মন্দিরের সামনে থেকে যে বড় রাস্তাটা সোজা এগিয়ে গেছে, তারই শেষ প্রান্তে গুণ্ডিচা বাড়ি। দূরত্ব প্রায় দু মাইল হবে। ফটকের সামনে এসে আমরা রিক্সা থেকে নেমে পড়লুম।

ঋতা বলল: হাতি দেখেছ বৌদি?

সত্যিই একটা হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে শুঁড় নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। ঋতা বলল: ওরে বাবা, এ দিকেই আসছে যে!

ঋতার দাদা বললেন: ভয় কিসের, পিঠের ওপর তো মানুষ বসে আছে!

রামানন্দবাবু তখন নাথকে চেপে ধরেছেন। গুণ্ডিচা বাড়ির গল্প তাঁকে জানতেই হবে। এই তীর্থের সঙ্গে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। গুণ্ডিচা নাকি তাঁর পাটরাণীর নাম। এই নামেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। পণ্ডিতরা কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইন্দ্রদ্যুম্নের কোন রাণীর নাম পান নি। কিন্তু নানা পুরাণে গুণ্ডিচাগারের নাম আছে। ব্রহ্ম পুরাণ নারদ পুরাণ সাম্ব পুরাণেও আছে। মন্দিরকে তবু পুরাণের মতো পুরনো মনে হয় না। বাহির থেকে প্রাচীর দেখে জেলখানার মতোই লাগে। কুড়ি ফুট

উঁচু আর পাঁচ ফুট চওড়া প্রাচীর। ভিতরের প্রাঙ্গণ লম্বা ও চওড়ায় হবে চার শো বত্রিশ আর তিন শো একুশ ফুট। পশ্চিমে সিংহ দ্বার ও বিজয় দ্বার উত্তরে। রথযাত্রার সময় জগন্নাথের দারুমূর্তি সিংহ দ্বার দিয়ে ভিতরে আসে, আর বাহির হয় বিজয় দ্বার দিয়ে। বিশ্বকর্মা নাকি এই গুণ্ডিচা বাড়িতেই দারু ব্রহ্মের ওঙ্কার মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। সে স্বতন্ত্র গল্প।

দূরে দাঁড়িয়ে আমি মন্দিরের গঠন প্রণালী লক্ষ্য করছিলুম। ঋতা আমার কাছে এসে বলল: অমন মনোযোগ দিয়ে কী দেখছেন?

কিছু না।

কিছু নয় বলবেন না; বলুন, বলবেন না।

সত্যিই আমি মিথ্যা বলেছি। তাই তাড়াতাড়ি বললুম: উড়িষ্যার সমস্ত মন্দির একটা বিশেষ ধরনে তৈরি। দেউল জগমোহন নাটমন্দির ভোগ মণ্ডপ।

বুঝিয়ে বলবেন?

এগিয়ে দেখুন। সবচেয়ে উঁচুটা মূল মন্দির, তার নাম দেউল। জগমোহন তার গায়ে লেগে আছে চার চালার মতো। নাটমন্দিরের সমতল ছাদ, আর ভোগ মণ্ডপ জগমোহনের মতো।

আপনি বুঝি এই সব দেখতে ভালবাসেন?

উত্তর দেবার ইচ্ছা ছিল না, তাই বললুম: যা চোখে পড়ে তাই দেখি।

দেউলের মধ্যে আমরা কালো পাথরের একটা রত্নবেদী দেখতে পেলুম। রথযাত্রার দিন থেকে উল্টোরথ পর্যন্ত জগন্নাথ এই বেদীর উপর অবস্থান করেন। ব্রাহ্মণেরা ঋতার দাদা বৌদিকে এই গল্প শোনাচ্ছেন পরম আগ্রহে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর বেশি দূরে নয়। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নাকি

যজ্ঞের দক্ষিণায় অসংখ্য গাভী দান করেছিলেন। সেই গরুর ক্ষুরে গর্ত ও উৎসর্গের জলে জলাশয় হয়েছে। স্কন্দ পুরাণের উৎকল খণ্ডে এই গল্প আছে। এই সরোবরে স্নান ও তর্পণ করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তাই এই তীর্থের নাম অশ্বমেধাঙ্গ। পাথর দিয়ে বাঁধানো এই সরোবরটি ছোট নয়। লম্বায় চার শো ছিয়াশি ফুট আর চওড়ায় তিন শো ছিয়ানব্বই ফুট। অসংখ্য কচ্ছপ দেখে ঋতার পুলক আর ধরে না।

রামানন্দবাবু ততক্ষণ কচ্ছপের পূর্বপুরুষকে চিনে ফেলেছেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নেরই তারা বংশধর। বংশ থাকলে কীর্তিনাশ, এই ছিল রাজার ধারণা। তাই তিনি জগন্নাথের কাছে বংশলোপের প্রার্থনা জানান। জগন্নাথ তাঁর প্রার্থনা রাখেন নি, কিন্তু অভিলাষ পূর্ণ করেছেন। তাঁর বংশধরেরা কচ্ছপ রূপে বেঁচে রইল বটে, কিন্তু তাঁর কীর্তিকে অতিক্রম করবার সুযোগ পেল না। আজ এই সরোবরের তীরে নৃসিংহ ও নীলকণ্ঠের মন্দির।

বেলা অনেক হয়েছিল দেখে ঋতার দাদা বললেন: এইবারে ফেরা যাক, কী বলেন!

রামানন্দবাবু তাড়াতাড়ি খাতা দেখে বললেন: সবই প্রায় সেরে ফেলেছি। শুধু চক্রতীর্থ আর সোনার গৌরাঙ্গ বাকি আছে।

সে আর এক দিন হবে।

রামানন্দবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: সেই ভাল।

ঠিক এই উত্তরটি তিনি আশা করেন নি, বললেন: সেই ভাল মানে!

ঋতারা তাদের বিস্ময় চেপে বসেছিল। বললুম: পুরী থেকে তো পালিয়ে যাচ্ছি না! আর একদিন বেরলেই চলবে।

বেশ বলেছেন! আর এক দিন দেখব বললে কি নটবর তার পয়সা কম নেবে, না সে দিন বিনি পয়সায় দেখাবে!

কাজেই আমাদের ফেরা হল না। ঋতারা আমাদের সামনে দিয়ে হোটেলের দিকে চলে গেল, আর আমরা গেলুম চক্রতীর্থের দিকে।

সমুদ্রের তীরে একটি ক্ষুদ্র সরোবর, তারই নাম চক্রতীর্থ। শ্রীকৃষ্ণ দেহ ত্যাগ করেছিলেন প্রভাস তীর্থে। যে গাছটির নিচে দেহ ত্যাগ করেছেন, সেই গাছটিই এক দিন ভেসে এসে এই চক্রতীর্থে ঠেকেছিল। এরই নাম দারু-ব্রহ্মের আবির্ভাব। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করে লোকে বালির পিণ্ড দেয়।

আমরা চক্রনারায়ণ দেখলুম, তারপর দেখলুম সোনার গৌরাঙ্গ। রামানন্দবাবু শুনেছেন, এখানে কোন কাহিনী আছে। কাঞ্চি কাবেরি মুকুন্দদেবের কাহিনী। কিন্তু নটবর কোন খবরই রাখে না। নাথ আর নেই। কাজেই রামানন্দবাবুকে শান্ত হতে হল।

ফেরার পথে নটবর আমাদের রেলের হোটেল দেখাল। বিরাট ব্যাপার। আমাদের হোটেলের সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না। মানুষগুলোও বোধ হয় অন্য জাতের। ঐ জাতের হলে আজ আমাকে কলকাতা থেকে পালিয়ে আসতে হত না।

রামানন্দবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার দেশ কোথায় গোপালবাবু?

ভারতবর্ষ।

আরে না মশাই, আমি আপনার বাড়ি কোথায় জানতে চাইছি।

বাড়ি নেই।

মরণ! কোথায় থাকেন?

উত্তরপাড়ায়।

কে কে আছেন বাড়িতে?

কেউ না।

আত্মীয় স্বজন?

নেই।

স্ত্রী-পুত্র ?

জোটে নি।

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন খানিক ক্ষণ, তারপর বললেন: কী করেন আপনি ?

কেরানীগিরি।

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন না ঠিকই, কিন্তু মনে হল যেন একটু সরে বসলেন। সংকীর্ণ রিক্সার উপর স্পর্শ বাঁচাতে পারলেন না। আমি জানি, মজুর বললে তিনি চমকে উঠতেন, হয়তো বা লাফিয়ে নামতেন রিক্সা থেকে। বললুম: আপনি তো মাস্টারি করেন!

গম্ভীর ভাবে ভদ্রলোক বললেন: প্রফেসরি।

আমিও গম্ভীর ভাবে বললুম: কলেজের মাস্টার।

বাকি পথটুকু ভদ্রলোক নীরবে অতিক্রম করলেন।

শুনতে পাই, পুরীতে রেলের হোটেলের বোলবোলাও এখনও আগের মতোই। এই অঞ্চলেই সমুদ্রের ধারে গড়ে উঠেছে উড়িষ্যা সরকারের টুরিস্ট বাংলো, তার নাম পান্থ নিবাস। দৈনিক ভাড়ায় ঘর পাওয়া যায়, খাবার ভাল ব্যবস্থা আছে। পুরী হোটেল ছাড়িয়ে স্বর্গদ্বারের দিকে যেতে আরও একটি টুরিস্ট বাংলো সম্প্রতি তৈরি হয়েছে। এর ব্যবস্থা নাকি আরও ভাল। খরচও বেশি। আর একটু এগিয়ে নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছে সমুদ্রের মুখোমুখি ভারি সুন্দর পরিবেশে। পাশাপাশি তিনটি কক্ষ একই মন্দিরে। কিন্তু দেবতা নেই একজনও। তাঁদের বদলে আছেন শঙ্করাচার্য, জয়দেব ও তাঁর পত্নী পদ্মাবতী। ধর্মের নামে যাঁদের গোড়ামি নেই, তাঁদের কাছে এই মন্দিরের আকর্ষণ কিছুমাত্র কম নয়। রাম ও কৃষ্ণকে আমরা দেবতায় পরিণত করেছি, এঁরাও কি একদিন দেবতায় পরিণত হবেন না!

৯

আজ আর সমুদ্র স্নানের সময় ছিল না। মধ্যাহ্নের সূর্য উঠেছে মাথার উপরে, পায়ের নিচে সমুদ্রবেলার বালি উত্তাপে জ্বলছে। তবু সেখানে মানুষ আছে, কী করে আছে তা জানি নে। আজকের স্নান আমি কলের জলেই সেরে নিলুম।

খাবার টেবিলে রামানন্দবাবু বললেন: কাণ্ডটা দেখুন।

কিসের কাণ্ড?

তাও বলতে হবে!

ধমক খেয়ে আমি চুপ করে গেলুম।

খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বললেন: একটা পয়সাও হতভাগা কম নিলে না, অথচ দেখবার জিনিস তো অর্ধেকই রয়ে গেল।

বুঝতে পারলুম, তিনি রিক্সাওয়ালার কথা বলছেন। বললুম: যেতে দিন।

যেতে দিন মানে! আপনার না হয় উপরি আমদানি আছে—

বললুম: মনে পড়েছে। বাড়ি ফেরার পথে নিজের পরিচয় আমি দিয়েছি বৈকি।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক থেমে গেলেন, বাকিটা শেষ করবার আর সাহস পেলেন না। এ শুধু তাঁর কেন, এ অনেকেরই ধারণা। অফিসের কেরানীর তুটো উপরি পয়সা আছে, নেই আর কোন বড় মানুষের। যারা তু হাতে নেয়, তাদের নেওয়াকে উপরি বলে না, বলে প্রাপ্য; ওটা দিতে হয়। তাদের কাজের কেউ সমালোচনা করে না। সরকারের তুর্নীতি দমনের খড়্গ ঝুলছে গরিব কর্মচারীর মাথার উপরে।

অনেক ক্ষণ পরে ভদ্রলোক কথা কইলেন, বললেন: আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না।

কেন জানি না, আমার একটা উত্তর দেবার লোভ হল। বললুম: আমি শুনেছিলুম, মাস্টারদেরও তু পয়সা উপরি আছে। ছেলে পড়িয়ে আর পরীক্ষার খাতা দেখে নয়, নম্বর বাড়িয়ে আর প্রশ্নপত্র বিক্রি করে।

রামানন্দবাবু যেন মারতে উঠলেন, এমনি ভাবে বললেন: কী বললেন!

এ কথা বলা নয়, একেবারে হুঙ্কার। খাওয়া দাওয়া সেরে যাঁরা ঘরে ঢুকেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তু এক জন ছিটকে বেরিয়ে এলেন। উত্তর না দিয়ে আমি নিঃশব্দে খেতে লাগলুম।

কিন্তু ভদ্রলোক ছেড়ে দেবার পাত্র নন, বললেন: কথা কইছেন না যে?

ম্যানেজারও বেরিয়ে এসেছিলেন। উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: কী হল?

রামানন্দবাবু বললেন: কী হল আবার! আজই আমার অন্য ঘরের ব্যবস্থা করুন।

খেতে খেতেই আমি বললুম: যদি খুশী হন, তাহলে অন্য হোটেলে উঠে যাই।

আড়াল থেকে ঋতা হেসে উঠল খিলখিল করে। এই হাসি শুনে রামানন্দবাবু বোধ হয় লজ্জা পেলেন। আর কোন কথা কইলেন না।

আহারের পর তিনি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমি বাহিরে বারান্দায় বসলুম খবরের কাগজ নিয়ে। মনে হল, আমি ভুল করেছি। কোন মন্তব্য করা আমার উচিত হয় নি। দেশটা যা তাই থাকবে, আমার কথায় বদলাবে না, বদলাবে না আমার মতো লোকের চেষ্টায়। পৃথিবীর সকল দেশেরই নাকি আজ এক অবস্থা।

যারা প্রতিবাদ করছে, তাদের হাতে ক্ষমতা নেই। যাদের আছে, তারাই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। হয়তো এ আমার ভুল ধারণা, অভিজ্ঞতার গণ্ডি বড় সংকীর্ণ বলেই এ ভুল হয়তো ধরা পড়ছে না।

নিগমবাবু কখন আমার পাশে এসে বসেছিলেন দেখতে পাই নি। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন ঃ প্রফেসার সাহেব কেন চটে উঠেছিলেন ?

বললুম ঃ এমনি।

আমার ওপরেও এমনি চটেছিলেন।

কখন ?

কাল সন্ধ্যেবেলায়।

কেন চটলেন ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন ঃ ভুল করে মাস্টারবাবু বলেছিলাম।

বুড়োর হাসি দেখে আমিও হাসলুম।

ভদ্রলোক বললেন ঃ আপনার তো আত্মীয় হন ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললুম ঃ আপনার সঙ্গে কি আমার আত্মীয়তা আছে ?

না তো।

ওঁর সঙ্গেও আমার এই রকম সম্বন্ধ।

আমরা ভেবেছিলাম—

কথাটা ভদ্রলোক শেষ করলেন না। শেষ করবার দরকার নেই। তাঁর সন্দেহের কথাটা তিনি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এবারে বললেন ঃ ভদ্রলোকের মাথাটা কি কিছু খারাপ ?

মাথা খারাপ হবে কেন!

যে সব কথা বলছিলেন, তা শুনে আমাদের সন্দেহ হচ্ছিল।

নিগমবাবুর কথায় মনে হল যে তিনি সস্ত্রীক এসেছেন। তাইতেই বারে বারে আমরা ও আমাদের বলছেন। মিসেস নিগম অসূর্যম্পশ্যা কিনা জানি নে, তাঁকে আমরা এখনও দেখি নি। বললুম ঃ বেশি

পড়াশুনো করলে বোধ হয় কথাবার্তা একটু বেয়াড়া হয়। এ সব পণ্ডিতের লক্ষণ।

নিগমবাবু মেনে নিয়ে বললেন: তা ঠিক। এই আমাদের বিজনেসেই দেখুন না, লেখাপড়া শেখা বাঙ্গালীবাবুরা ফেল হয়ে যাচ্ছে আর আমরা মূর্খরা বেশ চালিয়ে যাচ্ছি।

উত্তরে একটা শক্ত কথা মুখে এসেছিল। এ যুগের ব্যবসা তো প্রতারণা ও অসাধুতার ব্যবসা। খাদ্যে যারা ভেজাল মেশায় তারা মানুষকে বঞ্চিত করে স্বাস্থ্য গঠনে, আর ওষুধে ভেজাল মিশিয়ে মানুষ খুন করে অবিচলিত চিত্তে। পেটে খানিকটা বিদ্যা থাকলে এই বিবেকটা বিসর্জন দেওয়া একটু কঠিন হয়। কিন্তু নিজেকে আমি সংবরণ করে নিলুম, কোন উত্তর দিলুম না।

একটা কথা ভেবে আমার দুশ্চিন্তা হল। আমি খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়েছি। অন্যের কথায় আমি তো কখনও উত্তেজিত হই নি! আজ কেন হচ্ছি! এ তো সুস্থ মনের লক্ষণ নয়!

নিগমবাবু কিছু সন্দেহ করবার সুযোগ পান নি, বললেন: বিজনেসে বাঙ্গালী যে নেই, তা নয়। যারা আছে, তারা প্রায় আমাদেরই মতো।

বললুম: কিছু দিন থাকবেন বোধ হয় এখানে?

ইচ্ছা তো ছিল—

বাধা কিসের?

বাধা কিছু নেই।

তবে?

ভদ্রলোক কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বললেন: থাকলেই হল।

বললুম: জায়গাটা ভাল লাগছে না বুঝি?

ভদ্রলোক এবারে সত্যি কথা বললেন: কলকাতা থেকে এসে এখানে বেশি-দিন ভাল লাগে না। এই সমুদ্র আর এই শব্দ—

আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে ভাল করে তাকালুম।

গোলগাল ফর্সা চেহারা, বয়েস হবে ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। একটু ক্লান্ত, একটু যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। শরীরের চেয়ে মনটা যেন বেশি ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

আমি উত্তর দিলুম না দেখে বললেনঃ ভেবেছিলাম, এবারে গোপালপুর অন সী যাব। অনেক দিন আগে দেখেছি, হয়তো ভাল লাগবে।

কেন গেলেন না, তাও ভদ্রলোক বললেনঃ সেখানে মন্দির নেই, বাড়ি থেকে আপত্তি হল। তারপর লোকজনও কম।

সমুদ্রের ধারে গোপালপুর আমি দেখি নি। উড়িষ্যার একটা চমৎকার স্বাস্থ্য-নিবাস বলে নাম আছে। আর কী আছে জানি নে। লোকজন কম শুনে মনে হল, পালিয়ে থাকবার জন্য সে বোধ হয় পুরীর চেয়ে ভাল জায়গা। এই ভাবে এখানে জড়িয়ে পড়বার আগে আমারই তো পালিয়ে যাওয়া উচিত। বললুমঃ থাকবার জায়গা নিশ্চয়ই ভাল আছে ?

তা আছে। তখন তো সবই সস্তাগণ্ডা ছিল। এখনকার খবর ঠিক বলতে পারি নে।

গোপালপুর নাম আমি রেলের টাইম টেবিলে পাই নি। সেই কথা শুনে নিগমবাবু বললেনঃ গোপালপুরে কোন স্টেশন নেই। বরহামপুরে নেমে আট মাইল পথ বাসে যেতে হয়। একেবারে সমুদ্রের ধারে একটি ছোট শহর। ভাল মন্দ কয়েকটা হোটেল আছে। সঙ্গে সঙ্গী থাকলে নির্জনতা বেশ উপভোগ করা যায়।

তিনি কেমন সঙ্গী নিয়ে গিয়েছিলেন, সে কথা আর জানতে চাইলুম না।

নিগমবাবু বললেনঃ বেড়াবার আর একটা ভাল জায়গা আছে। সে হল চিল্কা।

চিল্কার নামে আমার আর এক দিনের কথা মনে পড়ল। সে দিন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাচ্ছি। গভীর রাত, একটা ছোট

অন্ধকার স্টেশনে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। খানিকটা দূরে গাড়ির ভিতরে ও বাহিরে প্রবল উদ্যমে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। কোন রকমে ঘাড় বেঁকিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বার করে দেখলুম, এক দল ছোকরা নামল এই স্টেশনে। স্টেশনের নাম রম্ভা।

সহযাত্রী শ্রীনিবাসলু আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করতে বললেন, ছেলেরা চিল্কায় পিকনিক করবে বলে এসেছে। পিকনিক করবারই জায়গা বটে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। বললেন, এইবারে দেখুন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। দক্ষিণের দিগন্ত যেন হারিয়ে গেছে। অসংখ্য তারার আবছা আলোয় মনে হল, বাম দিকের আকাশ এসে রেল লাইনকে ছুঁয়ে আছে। আকাশে আর জলে যেন পার্থক্য নেই, আকাশের তারায় আর জলের ছায়ায়। পার্থক্য বুঝি আমরাই গড়েছি। মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, ভাষায় ও ধর্মে। এর গণ্ডি তো খুঁজে পাই নে, কতটা ডিঙোলে এর পার পাওয়া যায়! সংকীর্ণতার শেষ আছে তো!

স্থানে স্থানে অন্ধকার জড়ো হয়ে আছে। মনে হচ্ছে ওগুলো পাহাড়। শ্রীনিবাসলু বললেন, পাহাড় জলের নিচে, আমরা শুধু মাথাগুলোই দেখতে পাচ্ছি। নৌকোয় বেড়াবার সময় খুব সাবধানে ও সব এড়িয়ে চলতে হয়। মাঝিদের ব্যাপারেও হুঁশিয়ার থাকতে হয়। সুবিধে পেলে মাথায় বাড়ি দিতে এরা দ্বিধা করে না।

চোখ বুঁজে আমি অন্য ছবি দেখলুম। সেই ছেলের দল ছোট ছোট নৌকোয় হালকা জলের উপর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কেউ বা মাঝিদের কাছে ধার নিয়ে ছোট ছিপ ফেলে বসেছে চুপটি করে। মাছ উঠলে সেই মাছ ভেজে খিচুড়ির সঙ্গে খাবে পাথরের উপরে বসে। চারিদিকে জল আর জল। মনে হবে মাথার উপরের আকাশ নেমে এসেছে পায়ের তলায়, কিংবা পায়ের নিচের জল ছেয়ে ফেলছে উপরের আকাশ।

নিগমবাবু আমাকে জাগিয়ে দিলেন, বললেন: ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

আমি চমকে উঠে বললুম: না তো।

ভাত জিনিসটাই ঐ রকম। খেলেই নেশা হয়।

তার পরেই বললেন: আপনারা দিনে ভাত আর রাতে রুটি না খেয়ে দিনে রুটি আর রাতে ভাত খান না কেন বুঝি না। দিনে রুটি খেলে আলস্য আসে না, আর রাতে ভাত খেলে ঘুমটা ভাল হয়।

আপনি বুঝি তাই করেন?

না। ভাতে জল থাকে বলে বারে বারে আমাকে উঠতে হয়।

চিল্কার কথা আমি তখনও ভুলি নি। বললুম: চিল্কায় আপনি নিশ্চয়ই পিকনিক করেছেন?

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, বৃদ্ধের দৃষ্টি হঠাৎ ঝকঝক করে উঠল, বললেন: করেছি বৈকি।

তারপর?

একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললেন: সে তো যৌবনের গল্প।

তারপর আর কিছু বললেন না।

আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, তাঁর দৃষ্টি কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন, কিন্তু সমুদ্র তাঁকে আর আকর্ষণ করছে না। তিনি কি তাঁর যৌবনের দিনে ফিরে যাবার চেষ্টা করছেন! আস্তে আস্তে আমি বললুম: সে গল্প বোধ হয় একটু একটু আপনার মনে পড়ছে!

সে সব কথা কি ভোলা যায়!

যায় না।

আত্মস্থ ভাবে বৃদ্ধ বললেন: গোপালপুরের সমুদ্র দেখে সময় আর কাটে না। বালির উপর হেঁটে হেঁটে আর সমুদ্রের জলে স্নান করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একই জিনিস নিয়ে কত মাতামাতি কত দপাদপি করা যায়! বয়েসটা যে কাঁচা!

এই আমরা কারা, বৃদ্ধ সে কথা বললেন না। আমিও কোন প্রশ্ন করে তাঁকে বাধা দিলুম না।

ভদ্রলোক বললেন : এক দিন জিনসপত্র বেঁধে বাসে এসে বসলুম। তার পর ট্রেনে। কিন্তু মন চাইল না কলকাতায় ফিরতে। কলকাতায় সে স্বাধীনতা কই, সেই মুক্তি, সেই প্রাণ! বালুগাঁ স্টেশনে আমরা নেমে পড়লুম। আপনি চিল্কা দেখেছেন?

ট্রেন থেকে দেখা দেখা নয়। তাই বললুম : না।

চিল্কা এখান থেকে বেশি দূর নয়, পুরী জেলার দক্ষিণ প্রান্তে। আজ ভোরবেলায় এক দল যুবক মোটরে করে বেড়াতে গেলেন। এই হোটেল থেকেই গেলেন।

মনে হল, বৃদ্ধ বুঝি সেই থেকে চিল্কার কথাই ভাবছেন, তাঁর যৌবনের কথা। তা না হলে আজ এমন করে চিল্কার গল্প কেন শোনাবেন। বললেন : এক দিকে পূর্বঘাট পাহাড় নীল বনময়। অন্য দিকে সমুদ্র, কিন্তু সমুদ্রের মতো নয়। মাথাকাটা ছোট ছোট পাহাড় আর বালির দ্বীপ দিয়ে অকূল সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন। একটি বিস্তৃত হ্রদের মতো মনে হবে।

মনে পড়ল, ভূগোলে এই রকম হ্রদের নাম পড়েছি লেগুন। কিন্তু নিগমবাবুকে বাধা দেবার দুঃসাহস হল না।

ভদ্রলোক বললেন : বেশি চওড়া নয়, হয়তো মাইল দশেক। কিন্তু লম্বায় পঁয়তাল্লিশ মাইলের কম হবে না। আমরা এ সব হিসেব নিকেশ করতে যাই নি, গিয়েছিলাম জীবনটাকে যথেচ্ছ উপভোগ করতে। করেছিলাম।

বৃদ্ধের মুখের দিকে আমি আর এক বার চেয়ে দেখলুম। গোলগাল চেহারা, ফর্সা মুখ। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। একটু ক্লান্ত, একটু যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন। শরীরের চেয়ে মনটাই তাঁর বেশি ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

কাল সকালবেলার কথাও আমার মনে পড়ল। স্নানে যাবার

সময় আমি তাঁকে বাইনকুলার হাতে বসে থাকতে দেখেছিলুম। ঐ যন্ত্রটি চোখে লাগিয়ে তিনি অন্যের স্নান দেখছিলেন। বোধ হয় নিজের অতীতটাকেই দেখছিলেন। তাঁর যৌবনের মাতামাতি দাপাদাপির দৃশ্য। আমার মতো অপরিচিতের কাছে সে গল্প তিনি নিশ্চয়ই বলবেন না। জিজ্ঞাসা করাও সৌজন্য বিরুদ্ধ হবে। তাই নিঃশব্দে তাঁর পরের কথার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম।

বৃদ্ধ বললেন: চিল্কার জল খুব গভীর নয়, তাই অগণিত নৌকো সারা দিন ছুটোছুটি করে। নৌকোগুলোর গড়ন দেখে আমরা আশ্চর্য হয়েছিলাম। তলাটা ত্রিভুজের মতো নয়, একেবারে সমতল। প্রথমটায় উল্টে যাবার ভয় করত। কিন্তু কী করে উল্টোবে! সমুদ্রের তরঙ্গ আসে না উত্তাল হয়ে, একটার পর একটা ঢেউ দুরন্ত আক্রোশে নৌকোর উপর ভেঙে পড়ে না। জলের উপর একটু যে চঞ্চলতা, সে তো অগণিত মাছ ও নানা রঙের পাখির খেলায়।

দক্ষিণের দরজার দিকে চেয়ে ভদ্রলোক সহসা থেমে গেলেন। আমিও সে দিকে চাইলুম। কিন্তু দেখতে কিছুই পেলুম না।

ভদ্রলোক বললেন: অনেকক্ষণ বাইরে বসে আছি। এবারে একটু আরাম করি।

আমার মনে হল, আরাম করার বাসনাটা তাঁর নিজের নয়, এটি অন্তরালে থেকে অন্য কেউ তাঁর উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে। বললুম: নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বৃদ্ধ ভিতরে গেলেন।

কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে আমারও ভাল লাগছিল না। এ হোটেলে আরাম-চৌকি নেই। বাধ্য হয়ে সবাইকে বিছানায় আরাম করতে হয়। কিন্তু ঘরে যেতেও আমার মন চাইল না। রামানন্দবাবু হয়তো আজকের ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখছেন। সেখানে গেলেই বিবাদ বাধবে। কাজেই এখানে বসে থাকাই সঙ্গত।

একটু পরে বেলা পড়বে, তখন সমুদ্রের ধারে বালির উপরে গিয়ে বসা যাবে।

নিজের ঠিক পিছনে ফিসফিস করে কথা শুনতে পাচ্ছিলুম। বারান্দায় নয়, পিছনের ঘরে। দু জন মানুষ কথা কইছে। আমি উৎকর্ণ হতেই তারা থেমে গেল। ওরা কি আমায় দেখতে পাচ্ছে! কিন্তু আমাকে দেখবে কেন!

অনেক দূরে দু-তিন জন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলুম, মাথায় বড় বড় ঝাঁকা নিয়ে সমুদ্রের তীর থেকে শহরের দিকে যাচ্ছে। আরও দূরে বালির উপর ছড়িয়ে বসে জন কয়েক পুরুষ কী কাজ করছে। মাথার উপর রৌদ্র বোধ হয় তীব্র নয়, তীব্র নয় নিচের বালিও। তা না হলে এমন নিশ্চিন্ত মনে কী করে কাজ করবে! আমার ইচ্ছে হল তাদের কাজ দেখতে যাই। কাঠের চেয়ারের চেয়ে আকাশের রোদ বুঝি বেশি আরামের হবে।

বেরোবার আগে ঘরের ভিতরে এক বার দেখতে গেলুম। কী আশ্চর্য! গভীর ঘুমে আজও রামানন্দবাবু অচেতন। তাঁর নাক ডাকছে। কিন্তু সমুদ্রের গর্জনের জন্য বাহির থেকে সেই নাকের ডাক আর শোনা যাচ্ছিল না।

টেবিলের উপরটা একবার দেখে নিলুম। তাঁর কাগজপত্র সব খোলা ছড়ানো আছে। হাওয়ায় সব এলোমেলো হয়ে গেছে। ভদ্রলোক আজ প্রচুর লিখবেন বলেছিলেন। যা দেখেছেন, আর যা শুনেছেন, তা নিশ্চয়ই লিখে ফেলবেন। খাবার আগে আমাকে একাধিকবার এই সংকল্পের কথা শুনিয়েছেন। ইচ্ছা হল, ঋতাকে ডেকে এনে এই দৃশ্য দেখাই।

ছি ছি, ঋতার কথা কেন মনে এল! ঋতা তো স্বাতি নয় যে দু জনে মিলে কিছু উপভোগ করার ইচ্ছা জাগবে! ক্ষিপ্র পায়ে আমি বেরিয়ে এলুম। তরতর করে নেমে গেলুম সিঁড়ি দিয়ে। কিন্তু মনে হল, পিছনের ঘরে সেই দু জন লোক ফিসফিস করে তখনও কথা কইছে। আর—

ঋতার কথা আমি কিছুতেই ভাবব না।

১০

অমন হনহন করে কোথায় চললেন ?

একি! পিছনে যে ঋতাই ডাকছে। আমাকে মুখ ফেরাতে দেখেই ঋতা হেসে ফেলল, বলল : দু জনের এক জনও সুস্থ নন।

বললুম : শরীর দু জনেরই সুস্থ।

ঋতাও রাস্তার উপরে নেমে এল। পাশে পাশে চলতে চলতে বলল : ঠিক ধরেছেন, আমি আপনাদের মাথার কথাই বলছি।

এই হোটেলে উঠেই মাথাটা অসুস্থ হল।

কেন ?

মাথা খারাপ হবার মতো কাণ্ড বারে বারেই ঘটছে।

যথা ?

পিছনে টিকটিকি এবং মেয়ে দুই-ই লেগেছে।

ঋতা খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল : টিকটিকি কে ?

খবর পান নি ?

না তো।

সন্দেহও করেন নি কিছু .

কিছু করছি বলেই ভয় পাচ্ছি।

তবে আমার সঙ্গে আর পথ চলবেন না, লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘরে ফিরে যান।

আপনি কি খুনের আসামী ?

তা হলে ভয় পাবার কারণ ছিল না।

কেন ?

সব কিছু চুকেই গেছে। ভয় পাওয়া উচিত খুনের মতলব আঁটছি জেনে। কেননা জড়িয়ে পড়বার ভয় আছে।

হেঁয়ালি ছেড়ে এবারে সত্যি কথাটা বলুন তো!

সত্যি কথাটা জানি নে, তবে সন্দেহের কথাটা বলতে পারি।

তাই বলুন।

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ আসছেন, সে খবর আপনাদের বাসওয়ালা দিয়েছে। আর আমাদেরই হোটেলের একটা ছোট ঘরে দু জন ভদ্রলোক ফিসফিস করে কথা বলছে। হোটেলে সন্দেহ করবার মতো দুটো মানুষই আছে—রামানন্দ আর গোপাল। রামানন্দ একটা গবেষণার জন্য এসেছেন, গোপাল কেন এসেছে সেটা কারও জানা নেই। তার হাবভাব কথাবার্তা এমন কি আচার-আচরণও একটু সন্দেহজনক।

এ ইংরেজের রাজত্ব নয়, স্বদেশীর যুগও নয়। তবু কেন সন্দেহ করবে?

সন্দেহ করা ওদের কাজ। ওদের চাকরিই এই। কাউকে সন্দেহ না করলে মাসের পর মাস মাইনে নেবে কোন্ যুক্তিতে!

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলবার পর ঋতা বলল: আপনার একটু সাবধানে চলা উচিত।

আমি হেসে ফেললুম।

হাসি নয় গোপালবাবু, অনর্থক ঝামেলা বাধিয়ে তো লাভ নেই।

আপনি আর আমার সম্বন্ধে কতটুকু জানেন! অনর্থক তো নাও হতে পারে!

আমার বিশ্বাস হয় না।

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললুম: আপনার ভোরবেলার কথাগুলো বেশ ভাল লেগেছিল।

এখন বুঝি খারাপ লাগছে?

খারাপ নয়, বড় পানসে কথা। এ ধরনের কথা ঘরের ভেতর মানায়।

বললুম না, স্বামী-স্ত্রীতে। কিন্তু ঋতা বলল: পরিচয় নাম মাত্র হলেও বোধ হয় মানায়। অন্তত সৌজন্যটা প্রকাশ পায়।

আন্তরিকতার গন্ধটা আপত্তিকর কিনা, তাইতেই বলি, সৌজন্য তোলা থাক। উপদেশ না দিলেও কেউ অভদ্র বলবে না।

অভদ্র বললেও আমি লজ্জা পাব না।

এ সব কথা রামানন্দবাবুকে কেন বলছেন না? তিনি খুশী হতেন।

তা বুঝতে পেরেছি।

আর কিছু কি বোঝেন নি?

ঋতা হেসে বলল: আপনাকে বললে যে উল্টো ফল হবে, তাও বুঝেছি।

তবু বলছেন কেন?

ঝগড়টা করতেই আমার ভাল লাগে যে!

তবে এমন মিনমিনে ঝগড়া করছেন কেন? আসুন না, চেঁচিয়ে ঝগড়া করি। লোক জানাজানি হোক।

আসুন।

বলে ঋতা আবার হাসল। তারপর বলল: আপনাকে ধাক্কা-খাওয়া মানুষ বলে মনে হচ্ছে।

আপনি কি অনেককে ধাক্কা দিয়েছেন?

আমার সম্বন্ধে তো আপনি কিছু জানেন না!

এই সমস্ত কথাতেই অনুমান করতে সুবিধে হচ্ছে। তবে আমাকে যে ধাক্কা দিতে পারবেন না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আপনি এমন নিশ্চিন্ত কেন?

এমন নিচের তলায় আমরা শুয়ে আছি যে সমাজের উপর তলার ধাক্কা সেখানে পৌঁছয় না।

আপনি যে কেরানীগিরি করেন, তা শুনেছি।

এত তাড়াতাড়ি খবরটা সংগ্রহ করেছেন?

ঋতা হাসল।

বললুম ঃ লোকে যে বদনাম করবে!

কেরানী না হলে করত।

কেরানী কি পুরুষ নয়?

মেয়েদের আকর্ষণ করতে পারে, এমন পুরুষ নয়। তার জন্যে পদস্থ হওয়া দরকার।

না হলে অপদস্থ তো করতে পারেন!

পুরুষদের অপদস্থ করে বেড়ালে মেয়ে-মহলে সুনাম হয়।

আপনি তা হলে সুনামেরই চেষ্টা করুন।

আর আপনি করুন আত্মরক্ষা।

বললুম ঃ কিছু করব বলে এখানে আসি নি।

কিন্তু এসেছেন যখন, তখন কিছু করতেই হবে।

তার জন্যে রামানন্দবাবুকে ধরুন। দরকার হলে—

দরকার হলে কী?

নায়কের ভূমিকা নিতে তাঁর আপত্তি হবে না।

ও ভূমিকাটি অনেকের কাছেই লোভনীয়। বুদ্ধিমান যারা, তারা বোকা সেজে লুকিয়ে থাকে। গভীর জলে অনেক দিন খেলে।

লোকে কি এখানে খেলবার ও খেলাবার জন্যেই আসছে?

ভেতরে কোন গোলমাল না থাকলে সহজ হতে বাধা কিসের!

কথাটা যে খুব খাঁটি তা মেনে নিতে দ্বিধা হল না। আর আমি যে ভিতরের গোলমালের জন্যই সহজ হতে পারছি নে, তা এই মেয়েটার কাছেও ধরা পড়ে গেছে। বললুম ঃ কৌতূহল জিনিসটা ব্যক্তিগত না হলেই ভাল। এই যে লোকগুলো এখানে কাজ করছে, এদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগলে অনেক কিছু জানা যেত।

উত্তর না দিয়ে ঋতা চারি দিকের কর্মরত মানুষগুলোর দিকে তাকাল। তারা মাছ ধরার বড় বড় জাল বালির উপর বিছিয়ে বসেছে। নিঃশব্দে মেরামত করে চলেছে। কারও মাথায় সাদা

টুপি, কারও কাপড়-জড়ানো মাথা। দূরে দূরে বসেছে, কেউ কারও সঙ্গে কথা কইছে না।

ঋতা বলল : কাণ্ড দেখেছেন ?

আমি চারি দিকে চেয়ে দেখলুম।

ঋতা আমাকে আঙুল দিয়ে ঘুমন্ত মানুষ দেখাল। উদার আকাশ থেকে এখন উত্তাপ বৃষ্টি হচ্ছে। প্রসারিত সমুদ্র সৈকতের কোনখানে একটু ছায়া নেই। তবু কতগুলো মানুষ এই গরম বালির উপরে নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ছোট বড় অসংখ্য নৌকো বালির উপরে ইতস্তত ছড়ানো আছে। তারই গা ঘেঁষে একটুখানি ছায়া। সেই ছায়ায় মানুষ শুয়েছে। কেউ আবার কাপড় টাঙিয়ে ছায়ার সৃষ্টি করেছে। ঋতা বলল : সমুদ্রকে এরা সত্যিই ভালবাসে।

তাতে বুঝি সন্দেহ নেই। কষ্টিপাথরের মতো কালো দেহ পাথরের মতো মজবুত। রোদে জলে ঝড়ে নির্বিকার ভাবে সমুদ্রে নামছে, ঢেউএর সঙ্গে লড়াই করে পয়সা আনছে জীবনধারণের জন্য। শেষ রাত থেকে শেষ বেলা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম। তার উপর উটকো কাজ। নৌকো আর জাল মেরামত লেগেই আছে। কখনো হাতুড়ি কখনো সূঁচ। বেশি দিন মেরামত করেও চলে না, আবার নতুন করে গড়তে হয়। কেউ মাছ বিক্রী করে, কেউ হাত ধরে সমুদ্রে স্নান করায়। ঐ তো মাথায় ঝাঁকা ভর্তি মাছ নিয়ে মেয়েরা শহরের দিকে যাচ্ছে। এই তো নুনিয়া জাত। এরা যদি সমুদ্রকে ভাল না বাসে, তা হলে আর কে বাসবে ?

ঋতা বলল : আপনি বুঝি মানলেন না আমার কথা ?

এদের কথাই ভাবছি।

কী রকম ?

সমুদ্রের গরম বালির ওপর কেমন নিশ্চিন্তে এরা ঘুমোচ্ছে।

সমুদ্রের গর্জন এদের ঘুমপাড়ানি গান। ছোট ছোট ছেলেরাও দেখুন সমুদ্রের টানে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ঋতা আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি লজ্জা পেলুম। সহসা মনে হল, আমার দুর্বল মনের কোন পরিচয় বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বললুম: সমুদ্রের প্রতি মেয়েদের কোন টান দেখছি না। ওদের মন নিশ্চয়ই ঘরমুখো।

ঋতা বলল: এই বাড়িগুলোর পেছনেই নুনিয়াদের একটা বস্তি আছে। দেখেছেন?

না।

চলুন না, এক বার দেখে আসি।

আমি কোন উত্তর দিলুম না।

ঋতা বলল: ভয় পেলেন নাকি?

আপনি সঙ্গে থাকলে আর ভয় কিসের?

মানে?

বস্তিতে এখন শুধু মেয়েরা আছে। কোনও পুরুষকে ঘুরঘুর করতে দেখলে—

খিলখিল করে ঋতা হেসে উঠল। অবাধ উদ্দাম হাসি। যে লোকগুলো একান্ত মনে কাজ করছিল, আমি তাদের চমকে উঠতে দেখলুম। হাসি থামলে ঋতা বলল: মারের ভয়!

দুর্নামেরও।

আমি সঙ্গে থাকলে বুঝি সে সব ভয় নেই।

সভ্য সমাজের দৃষ্টি তখন আপনার ওপরেই পড়বে।

আর ওদের দৃষ্টি?

ওদের কৌতূহল কম। আমি একা গেলেও যেমন, আপনি সঙ্গে থাকলেও তেমনি। পুরুষ ও নারীকে নিয়ে কোন বিচিত্র সম্পর্ক ভাবতে ওরা অভ্যস্ত নয়।

তা হলে আপনি মারের ভয় কেন পাচ্ছিলেন?

সে তো ওদের কাছে নয়, সে আপনাদেরই প্রতিনিধির কাছে। মারের চেয়ে ছুর্নামেরই বেশি ভয় পাই।

আমি সঙ্গে থাকলে?

ছুর্নামটা আপনি বিশ্বাস করবেন না। আর রামানন্দবাবু কিছু সন্দেহ করলে আমার উপকার আছে। আমাকে তিনি পরিত্যাগ করলে আমিও পরিত্রাণ পাই।

নুনিয়াদের বস্তির দিকে চলতে চলতে ঋতা বলল: বলে দেব।

ছদ্ম গাম্ভীর্যে মুখ তার থমথম করছে।

সমুদ্রের তীরে যে বাঁধানো সড়ক, তারই সমান্তরাল রাস্তা ঠিক প্রথম সারির বাড়িগুলোর পিছনেই। কিন্তু সেই রাস্তায় পৌঁছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে এও পুরীর পথ। ছু ধারে অসংখ্য খড়ের ঘর, মাঝখানটা প্রশস্ত বটে, কিন্তু ধূলায় অপরিচ্ছন্ন। মনে হবে, পায়ে পায়ে সমুদ্রের সমস্ত বালি এসে এইখানে জমা হচ্ছে। সমুদ্রের মানুষগুলোর গায়ে নোনা জলের প্রলেপ যায় শুকিয়ে, কিন্তু পায়ের বালি ঘরের ছুয়ার পর্যন্ত চলে আসে। ছেলেদের পায়ে পায়ে সেই ধুলো উড়ছে। ছেলেরা চক্রাকারে কোন খেলা খেলছে।

নদীর মানুষ নিয়ে অনেক লেখা আছে পদ্মা, তিতাস আর গঙ্গার মাঝিদের নিয়ে। সমুদ্রের মানুষ নিয়েও নাকি লেখা হয়েছে, আমি পড়ি নি। ঋতা ঠিক এই প্রশ্নই করল: এই সব মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু জানেন?

না।

কোন কৌতূহল নেই?

একদা ছিল।

আজ কেন ফুরিয়ে গেল?

বড় ক্লান্ত বোধ করছি।

আপনি খুব আয়েশী লোক মনে হচ্ছে।

এ কথার প্রতিবাদ করলুম না। প্রতিবাদ করতে গেলেই কিছু অপ্রয়োজনীয় কথা এসে পড়বে। সব কথা সকলের সামনে বলা যায় না।

ঋতা বলল: এদের জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে। একটা জিনিস ভারি অদ্ভুত দেখছি। পুরুষরা সারা ক্ষণই সমুদ্রে আছে। অথচ মেয়েদের দেখি না। মেয়েরা বোধ হয় সমুদ্রকে ঘেন্না করে। কেন এমন হয় বলতে পারেন?

আমি এদের লক্ষ্য করবার সুযোগ পাই নি। ঋতার কথা সত্য কিনা তাও জানি নে। সত্য হতেও পারে। স্বামী যদি সমুদ্র নিয়ে সারা ক্ষণ মেতে থাকে, স্ত্রী সেই সমুদ্রকে সতীন ভাবলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সভ্য সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অসন্তোষের এই প্রধান কারণ। এদের বিবাদ বোধ হয় তত তীব্র নয়। জীবনের সমস্যাকে এরা সহজ ভাবে মেনে নিতে পারে। বললুম: সমুদ্র এদের সতীন।

ঋতা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল: বেশ বলেছেন। সে দিন সন্ধ্যেবেলায় এদের ঝগড়া দেখেছি। পুরুষেরা নেশা করে ঘরে ফিরেছিল—

বললুম: দোষ ঐ পুরুষদেরই। ওরা নেশা করে বলেই ঝগড়া হয়।

না না, দোষ ঐ মেয়েদের। অমন নেশা না করলে সমুদ্রের সঙ্গে লড়বে কী করে!

বলে আমার দিকে চেয়ে ঋতা সকৌতুকে হাসল। আমাকেও হাসতে হবে।

নুনিয়াদের জীবন যাত্রা আমাদের দেখা হল না। দেখা সম্ভব নয়। জীবন যদি ঘটনা হত, তা হলে তার খবর সংগ্রহ করা যেত, ছাপা চলত খবরের কাগজের পাতায়। জীবনের খবর পাওয়া যায় জীবনের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে। আমরা তা পারি নে। দূর

থেকে দেখে আমরা একটা ধারণা করি সে ধারণার ভিত্তিতে কোন সত্য নেই। এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলুম।

বাহিরের বারান্দায় রামানন্দবাবু অপেক্ষা করছিলেন। ঋতার সঙ্গে আমাকে দেখে একেবারে চমকে উঠে বললেন: আপনি!

হ্যাঁ আমি।

দুপুর রোদে কোথায় বেরিয়েছিলেন?

ঋতা উত্তর দিল: বেড়াতে।

রামানন্দবাবু ঠিক এমনটি আশা করেন নি। আমতা আমতা করে বললেন: তাই তো দেখছি!

তাঁকে আরাম দেবার জন্য আমি বললুম: আপনাকেও সঙ্গে নেব ভেবেছিলুম, কিন্তু—

কিন্তু কী?

আপনি ঘুমোচ্ছিলেন।

কী যা-তা বলছেন! দুপুরে আমি কখনও ঘুমোই?

এ কথার উত্তরে ঋতা হেসে উঠল উচ্ছলিত কৌতুকে, বলল: না না, দুপুরে আপনি ঘুমোবেন কেন! আমরা সমুদ্রের গর্জন শুনেছি।

আমি হেসে বললুম: শুনেছেন বুঝি!

ঋতা আর দাঁড়াল না, দ্রুত পায়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আমাকে একা পেয়ে রামানন্দবাবু ক্ষেপে উঠলেন, বললেন: এ নিশ্চয়ই আপনার কাজ।

কোন্ কাজ?

এই যে আমার নামে লাগিয়ে বসে আছেন!

এক সঙ্গে থাকলেই এ সব নানা বিপদ। আমাকে যেতে দিন না!

রামানন্দবাবুর মনে পড়ল হোটেলের কনসেসনের কথা। দু

জনে এক ঘরে থাকার জন্য কিছু সুবিধা পাওয়া গেছে। আলাদা হলেই খরচ বাড়বে। রাগত ভাবে বললেন: যেতে দিচ্ছি বৈকি।

আর যা বললেন, তা আমার কানে গেল না। শুধু এইটুকু বুঝলুম যে রামানন্দবাবু অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁকে হোটেলে ফেলে রেখে আমাদের বেরিয়ে যাওয়া উচিত হয় নি।

বললুম: বুঝতেই পারছেন—

রামানন্দবাবু সব বুঝতে পারছেন বৈকি!

১১

রামানন্দবাবু সময় নষ্ট করা পছন্দ করেন না। ঘরে গিয়ে বেশ পরিবর্তন করে এলেন। গলাবন্ধ কোটের উপর গরম চাদর। জিজ্ঞাসা করলুম ঃ কোথায় বেরোচ্ছেন?

জানি না।

বেড়াতে বেরোচ্ছেন তো?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না।

বললুম ঃ সমুদ্রের ধারে, না শহরে?

আপনারা কি এ সব ঠিক করে বেরিয়েছিলেন?

হেসে বললুম ঃ না।

তবে আমাকেই বা কেন জিজ্ঞেস করছেন!

আপনি বুঝি—

ঋতার সঙ্গে বেরোবেন কিনা জিজ্ঞাসা করবার আগেই রামানন্দবাবু বললেন ঃ আমি কি আপনার সঙ্গে বেরোব ভেবেছেন?

কিন্তু তিনি যদি বেরোতে আর রাজী না হন?

আলবৎ রাজী হবেন। আপনার সঙ্গে দুপুরবেলায় যদি বেরোতে পারেন তো এ বেলায়—

রামানন্দবাবু হঠাৎ নির্বাক হয়ে গেলেন।

চেয়ে দেখলুম যে দরজার আড়ালে ঋতার শাড়ির আঁচল দেখা গেছে। বলছে ঃ সেই ভাল, আজ সন্ধ্যেবেলায় বিশ্রামই নেওয়া যাক।

কথাটা আমাদের নয়, বলল তার দাদা কিংবা বৌদিকে। তার পরেই বেরিয়ে এল।

রামানন্দবাবু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ঋতা বলল : আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?

রামানন্দবাবু বললেন : এঁর কথা ইনিই জানেন, আমি আজ বেরোব না।

দেখে তো উল্টো মনে হচ্ছে !

ভদ্রলোক নিজের কোট আর চাদরের দিকে চেয়ে বললেন : শরীরটা তেমন ভাল নেই।

ঋতা হেসে বলল : আপনিও বসে থাকবেন নাকি ?

এ প্রশ্নের জন্য আমি তৈরি ছিলুম, বললুম : না।

কোথায় যাবেন ?

বললুম : মন্দিরে।

মন্দিরে !

দু জনেই যেন চমকে উঠলেন।

আমি উত্তর দিলুম না দেখে ঋতা বলল : মন্দিরে গিয়ে কী করবেন ?

গম্ভীর গলায় বললুম : জগন্নাথ দর্শন এখনও হয় নি।

ঋতা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, বোধ হয় বুঝবার চেষ্টা করল আমি সত্যি বলছি কিনা। তারপর বলল : ধর্মে অনুরাগ থাকা ভাল।

রামানন্দবাবু ভেংচি কেটে বললেন : অনুরাগ, না আহ্লাদ ?

বললুম : আহ্লাদ থেকেই অনুরাগের জন্ম। আমাকে দেখে আপনার আহ্লাদ হচ্ছে না বলেই এই রাগ বিরাগ বীতরাগ। রাগারাগি না করে আসবেন আমার সঙ্গে ?

রামানন্দবাবু তেড়ে উঠলেন : ক্ষেপেছেন আপনি !

কিন্তু ঋতা তাঁকে চমকে দিল, বলল : আমাকে সঙ্গে নেবেন ?

বললুম : ছি ছি, আপনি কেন মন্দিরে যাবেন !

রামানন্দবাবু বলে উঠলেন : চলুন না, আমরা সবাই মিলে যাই।

ঋতা বলল : তবে আর কি, আপনারা দু জনেই বেরিয়ে পড়ুন। বেশ মানাবে।

বলে ভিতরে চলে গেল।

আমি চায়ের অপেক্ষা করছিলুম। রামানন্দবাবু এবারে কী করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। অনেকক্ষণ পরে বললেন : ব্যাপার কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

আমি উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলুম না।

রামানন্দবাবু বললেন : কথা কইছেন না যে ?

কী বলব ?

কিছু বলবেন তো !

যা বলবার তা আপনিই বলুন।

ভদ্রলোক গলা নামিয়ে বললেন : মেয়েটার আক্কেল দেখছেন ? এই যাব বলছে, এই না।

আপনিও তো তাই করছেন।

আমি ! ক্ষেপেছেন আপনি !

তার পরেই নরম হয়ে বললেন : আমি কি নিজের ইচ্ছেয় এমন করছি !

বড় অসহায় স্বর। আমি আর প্রতিবাদ করলুম না।

চা এসেছিল। চা খেয়ে আমি পথে নেমে পড়লুম।

রামানন্দবাবু বললেন : আপনি চললেন তা হলে ?

যেতে দিন, যেতে দিন। পেছনে আর ডাকবেন না।

এ নিগমবাবুর কণ্ঠস্বর। ভদ্রলোক তাঁর বাইনকুলার নিয়ে বেরিয়েছিলেন। আর তাঁর পকেট-রেডিও। পকেটের ভিতর আস্তে আস্তে রেডিও বাজবে, আর তিনি চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে সমুদ্র তীরের জনতা দেখবেন। বসে বসেই তাঁর সময় কাটবে।

রামানন্দবাবু এক বার ভিতরের দরজার দিকে তাকালেন।

ডান হাতে আমি মন্দিরের পথ ধরেছিলুম। খানিকটা এগিয়ে

মনে হল, এ ভুল করেছি। মন্দির আজ নির্জন নাও হতে পারে। ঋতা যদি বেরোয় তো মন্দিরের দিকেই আসবে। আমার শান্তি ভঙ্গ করে সে কৌতুক উপভোগ করবে। তবে কি সমুদ্রের দিকে যাব? কিন্তু তা হলে তো হোটেলের সামনে দিয়েই ফিরতে হবে। রামানন্দবাবু ঘাঁটি আগলে বসে আছেন। কোন রকমে তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও নিগমবাবুর বাইনকুলারকে ফাঁকি দিতে পারব না। তিনি দেখতে পেলেই রামানন্দবাবুকেও দেখাবেন। হয়তো ঋতাও দেখবে। তার চেয়ে আর কোথাও যাই। কোন মঠে কিংবা আশ্রমে।

পুরীর পথে তখন আলো আছে, কিন্তু রৌদ্র নেই। পথিক আছে, কিন্তু জনতা নেই। পায়ে পায়ে আমি মন্দিরের দরজাতেই পৌঁছে গেলুম। চমক ভাঙল পাণ্ডাদের কথায়। তারা সামনের পথ রোধ করে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গেল। আমি কি সত্যিই খুব অন্যমনস্ক ছিলুম, না অন্যমনস্কতার নামে কোন সুপ্ত ইচ্ছারই প্রশ্রয় দিয়েছি!

অন্যমনস্ক থাকা আর অসম্ভব। পাণ্ডারা ছেঁকে ধরেছেন: পুজো দেবেন?

আটকিয়া বন্ধন?

আপনার কোন চিন্তা নেই। পঞ্চায়েতের খাতায় শুধু চার পুরুষের নাম লিখে দিন, বাকি ব্যবস্থা আমরাই করে দেব।

সাত রকম আটকিয়া আছে, এক শো বত্রিশ থেকে পাঁচ হাজার ছ শো পর্যন্ত। যা আপনার খুশি। কোন জবরদস্তি নেই।

আটকিয়া মানে আমি জানি না, কিন্তু আমাকে এরা খুবই আটকেছে। পুলিসের মতো ঘেরাও করে বোধ হয় পঞ্চায়েতের দপ্তরের দিকেই নিয়ে চলল।

আমি প্রতিবাদ করি নি, আত্মরক্ষার চেষ্টাও করি নি। এই মৌন সহিষ্ণুতা আমার সমর্থন মনে করে পাণ্ডারা উল্লসিত

হয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই এক রকমের কুরুক্ষেত্র বাধল। কে আমাকে আগে ধরেছে, অর্থাৎ আমার পাণ্ডা হবার অধিকার কার, এই নিয়েই যুদ্ধ। বচসা যখন হাতাহাতিতে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে, আমি তখন সযত্নে সরে পড়লুম। ধরা পড়বার সমূহ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী তখন দু জনে ঠেকেছে। অন্য পাণ্ডারা বোধ হয় দেখেও দেখলেন না।

আটকিয়া বন্ধনের গল্প পরে জেনেছিলুম। বাঙালীরা সংক্ষেপে বলেন আটকে। মানে পঞ্চায়েতের খাতায় টাকা জমা দিয়ে জগন্নাথ দেবের ভোগের ব্যবস্থা করা। এক শো বত্রিশ টাকায় সাধারণ ডাল ভাত তরকারি। সাদা খিচুড়ি তিন শো ষাট, মসলা দেওয়া চার শো চৌত্রিশ। সাড়ে পাঁচ শোয় পুরী ও ক্ষীর ভোগ, সাড়ে সাত শোয় মালপোয়া, আর মোহনভোগ এক হাজার পাঁচ শো পঞ্চাশে। পাঁচ হাজার ছ শো টাকা খরচ করলে ছাপান্ন পদ ভোগে পড়বে। এই ব্যবস্থা শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্র মাহাত্ম্যে মুদ্রিত আছে। সাধারণ যাত্রীর জন্য সংক্ষেপ ব্যবস্থাও আছে। পাণ্ডার সঙ্গে সে সব দরাদরির ব্যাপার। সাড়ে সাত টাকার নিচে আর আটকে হবে না। অন্য ভোগ হবে, পূজো হবে, মালা হবে। পুরীতে তখনও এক পয়সার মূল্য ছিল।

পাণ্ডার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ভেবেছিলুম, কোন নির্জন স্থানে গিয়ে বসব। কিন্তু পিছন থেকে এক বালক বলল: যে দ্বার দিয়ে আপনি ভিতরে এলেন, তার নাম সিংহ দ্বার। এইটিই প্রধান দ্বার।

আমার বড় কৌতুক বোধ হল।

বালক তা লক্ষ্য করে বলল: উত্তরে হস্তী দ্বার, অশ্ব দ্বার দক্ষিণে, আর পশ্চিমে খাজা দ্বার।

আমি তাকে থামিয়ে দিলুম না।

উৎসাহ পেয়ে বালক বলল: মন্দিরের চারি দিকে এই

প্রাচীরকে মেঘনাদ বলে। উঁচু চব্বিশ ফুট, আর বাইশ ফুট চওড়া। উত্তর দক্ষিণে লম্বা ছ শো ছেষট্টি ফুট, আর ছ শো সাতাশি ফুট লম্বা পূর্ব পশ্চিমে।

আমার পিছনে চলতে চলতে বালকটি বলে চলেছে: উড়িষ্যার অন্য সব মন্দিরের মতো এ মন্দিরেও চারটি ভাগ—মূল মন্দির নাট মন্দির ভোগ মন্দির ও জগমোহন। প্রাঙ্গণ দুটি—অন্তর্প্রাঙ্গণ ও বহিপ্রাঙ্গণ।

বালকটি প্রচুর সাহস সঞ্চয় করেছে। বলল: অরুণ স্তম্ভ থেকে দেখাব?

আমি কোন উত্তর দিলুম না।

বালকটি আর দ্বিতীয় বার প্রশ্ন না করে বলল: মন্দিরের সিংহ দ্বারের সামনে বাইশ হাত উঁচু কালো পাথরের স্তম্ভ। গরুড় স্তম্ভ ভোগ মন্দিরে। প্রথমেই এঁকে প্রণাম করে আলিঙ্গন করতে হয়। অন্তর্প্রাঙ্গণের দেবদেবীর নাম বলব?

আমি উত্তর দিলুম না।

বালক বলল: পূর্ব দিকে চৈতন্য, রাধাশ্যাম ও ভাণ্ডার, রাধাকৃষ্ণ বদরি নারায়ণ ও পুরনো রন্ধনশালা। উত্তর দিকে কৃষ্ণ পটলেশ্বর জগন্নাথ সূর্য নারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ। দক্ষিণ দিকে রোহিণী কুণ্ড বিমলা ভূষণ্ডি কাক গণেশ চন্দনগৃহ নৃসিংহ মুক্তিমণ্ডপ ক্ষেত্রপাল সূর্য বটেশ্বর মার্কণ্ডেয় মঙ্গলা ও বটকৃষ্ণ। পশ্চিম দিকে লক্ষ্মী সরস্বতী মাখনচোরা গোপীনাথ বড় গণেশ রাধাকৃষ্ণ ও রথযাত্রার আসবাব গৃহ।

বালক এর পরে যে বহিপ্রাঙ্গণের দ্রষ্টব্য তালিকা শোনাবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আগে একটু এগিয়ে এসে আমাকে লক্ষ্য করল। আমি শুনছি কিনা সে কথা হয়তো জানা দরকার। মনে মনে কিছু বিবেচনা করে বলল: বাহিরের প্রাঙ্গণে একবার যাবেন কি? এখনো পরিষ্কার আলো আছে।

কোন উত্তর না দিলে সে কী করে আমি দেখতে চাইলুম।

বালক বলল : নতুন রন্ধনশালা হয়েছে পশ্চিম দিকে। অসংখ্য উনুন। প্রতিটি উনুনের উপর সারি সারি হাঁড়ি চাপিয়ে ভাত রান্না হয়। দেখবার জিনিস।

দেখবার জন্য আমি কৌতূহল প্রকাশ করলুম না।

বালক বলল : ভাণ্ডার গৃহ একাদশী গৃহ গঙ্গা-যমুনা কূপ ভেত মণ্ডপ কৃষ্ণ ও ময়দার কল—সবই ঐ দিকে। উত্তর দিকে মহাদেব ঈশানপুর লোকনাথ শীতলা উত্তরায়ণ মহাবীর রাধাকৃষ্ণ মহাদেব ও বৈকুণ্ঠপুরী। দক্ষিণ দিকে আনন্দ বাজার স্নানবেদী ও চাহনি মণ্ডপ। শিব পূর্ব দিকে।

আমি নিশ্চিন্ত হলুম। আর তার নিশ্চয়ই কিছু বলবার নেই। এবারে কয়েকটা পয়সা পেলেই সরে যাবে। আমি পকেটে হাত দিলুম।

বালক তা দেখেও দেখল না। বলল : অক্ষয় বট দেখুন। ভগবানের বপু স্বরূপ।

অন্য ব্রাহ্মণেরা পথ রোধ করে বললেন : স্পর্শ করুন। ধন মান ও পত্নী পুত্র কন্যা যা চাইবেন, তাই পাবেন। এ হল কল্পতরু।

এক জন স্ত্রীলোক আঁচল পেতে বসে আছে। কখন এই কল্পতরু থেকে পাকা ফল পড়বে, তারই অপেক্ষা। কল্পতরুর সেইতো বর। খানিকটা খাবে, খানিকটা মাতুলী করে গলায় পরবে।

ব্রাহ্মণদের আমি এড়িয়ে গেলুম।

বালক বলল : এইখানে দাঁড়িয়ে মন্দিরের কারুকার্য দেখুন।

বলে ঠিক উপরের দিকে তাকাল।

তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। মন্দির গাত্রে যে এমন অশ্লীল মূর্তি খোদিত থাকতে পারে, তা আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। কোনারকের মন্দিরে নাকি এমন মূর্তি

অনেক আছে। কিন্তু পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে এ দৃশ্য মর্মান্তিক মনে হল। আমি চোখ নামিয়ে নিলুম।

আর সেই মুহূর্তেই শুনলাম ঋতার কণ্ঠস্বর : মন্দিরের কারুকার্য দেখছেন?

আমার লজ্জার সীমা রইল না। পালিয়ে গিয়ে যে আত্মরক্ষা করব, তার পথ নেই। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছি। কিন্তু তার পরেই নিজেকে সামলে নিলুম। আমার লজ্জা কিসের! যারা এ মূর্তি গড়েছে, তারা লজ্জা পাক। কিংবা লজ্জা পাক এই মেয়েটা। আমাকে অনুসরণ করে এর এখানে আসবার তো কোন প্রয়োজন ছিল না। সঙ্গে তো কাউকেই দেখছি না! দাদা বৌদি নেই, রামানন্দবাবুও নেই! তবে কি সে একা এসেছে?

ঋতা বলল : এমন মুষড়ে পড়লেন কেন?

বললুম : আপনাকে দেখে।

কিন্তু আমাকে রক্ষা করল সেই ব্রাহ্মণ তনয়। বলল : এই দেউল নির্মাণ হয় উৎকলের রাজা গজপতি বংশীয় অনঙ্গ ভীম দেবের অধিকার কালে। তিরিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। জগন্নাথ দেবকে রণজিৎ সিং সাড়ে তিন কোটি টাকার কোহিনুর দিয়েছিলেন।

বাধা দিয়ে ঋতা বলল : এ সব কথা রামানন্দবাবুকে শোনাতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলুম : কোথায় তিনি?

ঋতা হেসে বলল : দাদা বৌদির সঙ্গে চাল কিনছেন। পুরীর চাল ভাল।

তাঁর চালটিও ভাল।

ঋতা আমার কথায় হেসে উঠল।

বালক তখন মুল মন্দিরের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে।

চেঁচিয়ে বলল: তাড়াতাড়ি চলে আসুন। এখন একেবারে ভিড় নেই মন্দিরে।

আমরা দু জনেই এক সঙ্গে এগিয়ে গেলুম।

কালো পাথরের বেদীর উপর আমরা জগন্নাথ দর্শন করলুম। ঠুঁটো জগন্নাথ একা নন, সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রা, সুদর্শন চক্রও আছে। রঙ করা কাঠের মূর্তি। তাই কলেবর পরিবর্তন করতে হয়। নবকলেবর বিরাট উৎসব।

ঋতা বলল: সুভদ্রা তো কৃষ্ণের বোন। এরা বলছিল বউ।

এ নিয়ে অনেক তর্ক। সে সব তর্কে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা আমার ছিল না। তাই বললুম: একটা কিছু ভেবে নিলেই হল।

বেশ বলেছেন!

কেন?

বউ আর বোন কি এক জিনিস হল?

এ কালে অবশ্য দাদা বলে আলাপ শুরু করে বরমাল্য গলায় দেবার গল্প শুনেছি।

ঋতা রাগত ভাবে বলল: প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন।

রামানন্দবাবু হলে এড়িয়ে যেতেন না।

তা ঠিক। নিজের জানা না থাকলে জেনে নেবার চেষ্টা করতেন।

রামানন্দবাবু ঠিক এই সময়েই এলেন। দু হাতে দুটো ভারি ঝোলা। বোধ হয় পুরীর চাল বইছেন। তাঁর পিছনে ঋতার দাদা বৌদি। দাদা ভদ্রলোক লজ্জিত ভাবে বললেন: রামানন্দবাবু একেবারে নাছোড়বান্দা। একটা ঝোলাও আমাকে বইতে দিচ্ছেন না!

বৌদি বললেন: তুমি তো নিশ্চিন্ত হয়েছ দেখছি।

কিন্তু রামানন্দবাবু এ সবের ধারে কাছেও ঘেঁষলেন না। বললেন: আমার সম্বন্ধেই কোন কথা হচ্ছিল মনে হচ্ছে!

বললুম : ঠিক ধরেছেন। ইনি আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলছেন, আপনি হলে একটা সদুত্তর তিনি নিশ্চয়ই পেতেন।

প্রশ্নটা না শুনেই রামানন্দবাবু বললেন : তা পেতেন বৈকি। আপনার মতো কোন প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া আমার স্বভাব নয়।

বললুম : তা হলে সুভদ্রা জগন্নাথের বোন না স্ত্রী সেই কথা বলুন।

সর্বনাশ! সুভদ্রা কেন জগন্নাথের স্ত্রী হবেন! জগন্নাথের স্ত্রী তো লক্ষ্মী!

ঋতা বলল : পাণ্ডারা যে অসম্ভব কথাই বলছে!

ব্রাহ্মণ বালকটি চুপিচুপি বলল : চন্দন যাত্রার সময় সুভদ্রার ভোগমূর্তি লক্ষ্মী সঙ্গে যান।

বিপদ দেখুন।

রামানন্দবাবু তাঁর ঝোলা দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন : ধরুন তো।

আমি হাত বাড়িয়ে সেই ভারি ঝোলা হাতে নিলুম।

রামানন্দবাবু পকেট থেকে তাঁর খাতা পেন্সিল বার করলেন। একটা পাতা খুলে খসখস করে কিছু লিখেও ফেললেন। বললেন : টুকে নিলুম। এ বিষয়ে—

গবেষণা করতে হবে।

কথাটা আমি সম্পূর্ণ করলুম।

রামানন্দবাবু কটমট করে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম : কিছু যদি মনে না করেন তো আমি আপনাকে একটু সাহায্য করতে পারি।

উত্তর ঋতা দিল, বলল : করুন না।

বললুম : দেবতা তিন জাতের। বৈদিক, পৌরাণিক ও গ্রাম্য। গ্রাম্য দেবতাকে টানাটানি করে যখন পৌরাণিক সম্মান দেবার চেষ্টা হয়, তখনই হয় এই রকমের গোলমাল।

ঋতার দাদা বিস্ময় প্রকাশ করলেন: জগন্নাথকে আপনি গ্রাম্য দেবতা বলছেন?

কারণ আছে। শুধু আকার আকৃতির জন্যে নয়। সম্বন্ধের এই সব অসামঞ্জস্যের জন্যও আমাদের সন্দেহ করা উচিত। পুরাণে যদি বিশ্বাস থাকে তো দেখবেন, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতিকে পাঠিয়েছিলেন নীলমাধব দর্শনে। চণ্ডালের দেবতা নীলমাধব। বসু শবরের গৃহে বাস করে বিদ্যাপতি সেই মূর্তি দর্শন করেছিলেন। বসুর পুত্র দ্বৈতাপতি, তারই বংশধর দ্বৈতা ও পতি। দ্বৈতারা শ্রীমূর্তির অঙ্গরাগ করে। পতিরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে পূজার অধিকার পেয়েছে। রন্ধনশালার শোঁয়ার শবর শব্দেরই অপভ্রংশ।

রামানন্দবাবু আমার দিকে তাকালেন বিহ্বলের মতো। কোন কথা কইতে পারলেন না।

বললুম: আর একটি কথা নোট বুকে টুকে রাখুন। বৌদ্ধরা এক সময় জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তিকে বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতীক বলে মনে করতেন। এ কথার আলোচনা না করলে আপনার গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকবে।

সকলের মুখের দিকে চাইলে নিজেকে হয়তো হিরো ভাবতে ইচ্ছে করবে। তাই কোন দিকে না চেয়ে আমি মন্দির থেকে বেরিয়ে এলুম।

১২

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়েছিল। বাহিরে বেরিয়ে দেখলুম সেজেগুজে রামানন্দবাবু বারান্দায় পায়চারি করছেন। আমাকে দেখে খুশী না হয়ে যেন একটু অসন্তুষ্ট হলেন, বললেন: আর একটু পরে উঠলেই পারতেন।

ভালোমানুষের মতো জবাব দিলুম: আপনি আমাকে ফেলে যাবেন ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম।

আপনাকে ফেলে যাওয়া উচিত।

কেন ?

আপনার পেটে নানা রকমের দুরভিসন্ধি।

আর সে জিনিস যে আপনার মাথায়। আমি ক্ষিধের সময় কাতর, আপনি সারা ক্ষণ।

কী রকম ?

এই দেখুন না, রাতে বাতি জ্বেলে আপনি মোটা মোটা বই পড়তে লাগলেন। শুয়েও রক্ষা নেই, টর্চ জ্বেলে সারা রাত ঘড়ি দেখেছেন। আপনার আর কী! সারা দিন ঘুমিয়ে আপনি সারা রাত জাগলেন। বাসে চেপে আবার ঘুমোবেন। কিন্তু আমার হয়ে গেল।

এতে দুরভিসন্ধির কী দেখলেন ?

দেখলাম না! আপনি তো চেয়েছিলেন আমি ঘুমিয়েই থাকি। রাতে তারই জন্যে জাগিয়ে রেখেছিলেন।

আপনি আমাকে এত নীচ ভাবেন! আমিই আপনার যাবার ব্যবস্থা করি নি!

ঋতাদের ঘরে উচ্ছ্বলিত হাসির শব্দ পাওয়া গেল। বোধ হয় শোনাও গেল: ঝগড়া বেধেছে।

কিন্তু আমাদের ঝগড়া বাধল না হোটেলের বেয়ারা এসে খবর দিল : টেবিলে চা দেওয়া হয়েছে।

ঋতা যখন বাহিরে এল, আমাদের চা খাওয়া তখন শেষ হয়েছে। অত্যন্ত তৎপর ভাবে রামানন্দবাবু দাঁড়ালেন। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত প্রসন্নতা দেখলুম। ঋতাই তার সঙ্গে এনেছে প্রসন্নতা। উজ্জ্বল দেহে সোনালী শাড়ির নেশা আছে। নেশাটা ফিকে করবার জন্য সাদা জামা পরেছে। লালে কড়া হত। রামানন্দবাবুর দৃষ্টি উপেক্ষা করে ঋতা বলল : আজ ভুবনেশ্বর চলছেন তো?

রামানন্দবাবু গদগদ ভাবে বললেন : একেবারে তৈরি।

আপনি?

ঋতার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললুম : সমুদ্রের ধারে যাব।

সে কি!

দু জনেই বোধ হয় চমকে উঠলেন।

আমি হেসে বললুম : রামানন্দবাবু আরাম পাবেন, আমিও পাব।

ঋতা আশ্চর্য হয়ে বলল : নতুন জায়গা দেখতে আপনার ভাল লাগে না?

কিছু না করতেই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে।

এ কথা আমার সাময়িক সত্য। এত দিন ঘুরে বেড়াতেই আমার ভাল লাগত। পথ আমাকে টানে, টানে পথের মানুষ। সেই অদৃশ্য শক্তি আমাকে এমন গভীর ভাবে টানে যে বারে বারে আমি পথে বার হই। কিন্তু এদের কাছে সে কথা আজ গোপন করে আনন্দ পেলুম।

ঋতা বলল : ভালই হল, এক জন সঙ্গী পাওয়া গেল।

রামানন্দবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন : কী বলছেন আপনি?

উত্তরে ঋতা শুধু হাসল।

না না, হাসি নয়, এমন ছেলেখেলা করলে চলে না। ব্যবস্থা যখন করা হয়েছে, তখন পিছিয়ে থাকা উচিত নয়।

তাঁর কণ্ঠে আমি শিক্ষকোচিত গাম্ভীর্য দেখলুম। ঋতা হেসে উঠল। রামানন্দবাবু বুঝি আরও গম্ভীর হলেন।

ঋতার দাদা বাহিরে বেরোতেই রামানন্দবাবু তাঁকে আক্রমণ করলেন: আপনারা যাচ্ছেন না?

ভদ্রলোক এই প্রশ্নের কোন কারণ খুঁজে পেলেন না, বললেন: কেন বলুন তো?

সেই রকম শুনছিলুম।

না না, যাব না কেন! দুপুরের খাবার পর্যন্ত আমরা তৈরি করে নিয়েছি।

রামানন্দবাবু বললেন: এই দেখুন!

আমরা তো কিছুই সঙ্গে নিলুম না।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন: আপনি কী নিলেন?

বললুম: আমি তো যাচ্ছি না।

তা হলে—

ঋতা হেসে বলল: তা হলে আপনিও থেকে যান।

ভদ্রলোক আমার উপরেই হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন, বললেন: আপনি মশাই যত নষ্টের গোড়া। কাল সন্ধ্যাতেও আমাদের কম হয়রানি করেছেন!

আমি তো কাল একাই বেরিয়েছিলুম!

আজকেও তো যাবেন না বলে গোলমাল পাকিয়েছেন!

গেলেই তো গোলমাল, না গেলে আবার গোলমাল কিসের!

হুঁঃ।

এবারে ঋতার দাদাও হাসলেন।

ঋতা আমাকে চুপিচুপি বলল: ভদ্রলোকের পেছনে এমন

লেগেছেন কেন বলুন তো!

সে তো আপনিই লেগেছেন!

ঋতা এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল: ভদ্রলোক মাস্টার মানুষ। একটু মেনে চললেই তো পারেন।

আপনি মানলে ভদ্রলোক বেশি খুশী হবেন!

শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই গিয়ে বাসে উঠলুম। এক রকমের ছোট বাস। স্টেশন ওয়াগনের চেয়ে কিছু বড়। পনর ষোল জন যাত্রী স্বচ্ছন্দে বসতে পারে, এমন ব্যবস্থা। ঋতা তার বৌদির পাশে বসল। রামানন্দবাবু বসলেন তার দাদার পাশে। আমি একটু পিছনে। কয়েকটা হোটেল থেকে যাত্রী সংগ্রহ করে বাস ছাড়ল। সকালের রৌদ্র তখনও প্রখর হয় নি।

পুরী থেকে ভুবনেশ্বর ট্রেনে আটত্রিশ মাইল পথ, খুর্দা রোড জংসন হয়ে কলকাতার দিকে। দু ঘণ্টার পথ। মোটরে পথও কম, সময়ও সংক্ষেপ হয়। মাঝ পথে পিপলি নামে একটা জায়গা থেকে কোনারকের রাস্তা বেরিয়েছে। পুরী থেকে কোনারক আর ভুবনেশ্বর থেকে কোনারক প্রায় একই রকমের দূরত্ব। সামান্য পথ যা কাঁচা আছে, অদূর ভবিষ্যতে তা পাকা হয়ে যাবে। কোনারক দর্শনের কষ্টের কথা মানুষ তখন অবিশ্বাস্য ভাববে।

পুরী থেকে সাক্ষীগোপাল বারো মাইল উত্তরে। ঠিক হয়েছিল, আমরা প্রথমে সাক্ষীগোপাল দেখব। তার পর ভুবনেশ্বর। ফিরব উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখে। শীতের বাতাস বইছে ঝিরঝির করে। চোখ বুজে সেই বাতাস উপভোগ করা ছাড়া এখন আর কোন কাজ নেই।

কিন্তু রামানন্দবাবু চুপ করে বসে রইলেন না। ঋতার দাদার সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। বললেন: এক সঙ্গে আছি, অথচ আপনার নামটা এখনও জেনে নেওয়া হয় নি।

আমার নাম ?

ভদ্রলোক কিছু হয়তো ভাবছিলেন। আচমকা এই প্রশ্নে একটু চমকে উঠে বললেন: আমার নাম নীরদবরণ চট্টোপাধ্যায়।

রামানন্দবাবু নিজের নাম বললেন না। শুধু বললেন: বেশ নাম তো।

নীরদবাবুও কৌতূহলী নন। চুপ করে রইলেন।

রামানন্দবাবু আবার বললেন: পুরীতে আপনারা কত দিন থাকবেন ?

সব কিছু দেখা হয়ে গেলেই ফিরে যাব।

ছুটি ক দিনের ?

যত দিন ভাল লাগে।

মানে ? আপনি চাকরি-বাকরি করেন না বুঝি ?

আজ্ঞে না।

তবে কী করেন ?

রামানন্দবাবুর প্রশ্নের ভিতর কোন সৌজন্যের বালাই নেই। আমি দেখলুম, ঋতা তার বৌদিকে ঠেলা দিয়ে হাসছে। কিন্তু নীরদবাবু রাগ করলেন না, সহজ ভাবে বললেন: কলকাতায় আমার ব্যবসা আছে।

বইএর ব্যবসা ?

আজ্ঞে না।

তবে ?

লোহার।

বইএর ব্যবসা হলে আমাদের সুবিধা হত।

ও।

কেন তা জিজ্ঞাসা করলেন না ?

কেন ?

উড়িষ্যার ওপর আমি একখানা প্রামাণিক গ্রন্থ লিখছি।

আপনাকেই ছাপতে দিতুম। জানেন তো, সব প্রকাশককে আজকাল বিশ্বাস করা যায় না!

মাথাটা কাত করে নীরদবাবু চোখ বুঁজলেন। কিন্তু রামানন্দবাবু থামলেন না। বললেন: উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

আমার সন্দেহ রইল না যে এখন রামানন্দবাবুকে নিয়ে নীরদবাবু বেগ পেতে শুরু করেছেন। কারবারী মানুষের কাছে ইতিহাসের কথার চেয়ে লোহার আঘাত হয়তো মধুর মনে হবে। কিন্তু রামানন্দবাবুর দৃষ্টি সে দিকে নেই। বারে বারে তিনি ঋতার দিকেই তাকাচ্ছিলেন এবং তাকে উৎকর্ণ দেখবার চেষ্টায় অন্যকে উপেক্ষা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত পিছন থেকে আমি বললুম: আমি শুনছি রামানন্দবাবু।

এবারে তিনি আর রাগ করলেন না, বললেন: শুনছেন তো, শুনতেই হবে। ভারি ইন্টারেস্টিং ইতিহাস। এই কলিঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে অত বড় বীর অশোকের হাত থেকে তরোয়াল খসে পড়ল।

এ গল্প তো শুনি নি!

শোনেন নি! শুনবেন কোথা থেকে! দি গ্রেট কলিঙ্গ ওয়ার অব অশোক। কী যুদ্ধ! কী রক্তপাত! কী কান্না! দিগ্বিজয়ী অশোক বললেন, এই শেষ, আর যুদ্ধ নয়। বুদ্ধই ঠিক বলেছেন, অহিংসা পরম ধর্ম। এই গল্প দিয়ে উড়িষ্যার ইতিহাসের শুরু। কিন্তু অহিংসা ধর্ম বেশি দিন টিকল না। দু শো বছর পরেই জৈন রাজা খরবেলা কলিঙ্গ সেনা নিয়ে দিগ্বিজয়ে বার হলেন। কলিঙ্গের শ্রেষ্ঠ রাজা খরবেলা খ্রীষ্টের জন্মের দেড় শো বছর আগে প্রবল প্রতাপে রাজ্য পালন করেছেন। শুধু অন্ধ্র মহারাষ্ট্র ও বেরার নয়, মগধের রাজা পুষ্যমিত্রকেও পরাজিত করেছিলেন। এই পুষ্যমিত্র গ্রীকদের হটিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

কলিঙ্গের এই সম্মান কিন্তু বেশি দিন ছিল না। জৈন রাজাদের পর এলেন বৌদ্ধ রাজারা। মগধের রাজা শশাঙ্কের এক শিলালিপিতে দেখা যায় যে ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিঙ্গ মগধের অন্তর্গত ছিল। কনৌজের হর্ষবর্ধন কলিঙ্গ জয় করেন ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে এলেন কেশরী রাজারা—জনমেনজয় যযাতি ও ললাটেন্দু। ভুবনেশ্বরের শিব মন্দির সব এই রাজাদেরই কীর্তি। এই সময়েই এলেন প্রাচ্য গাঙ্গ রাজা বজ্রহস্ত। ত্রিকলিঙ্গাধিপতি উপাধি নিয়ে কলিঙ্গ শাসন শুরু করলেন। তালপাতার পুঁথি মাদলা পঞ্জীতে পাওয়া যায় যে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই রাজা অনন্ত বর্মন চোড় গঙ্গ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বিমান আর জগমোহন নির্মাণ করেন। গঙ্গা বংশের রাজারা ছিলেন বৈষ্ণব। প্রথম ও দ্বিতীয় রাজারাজ, প্রথম ও দ্বিতীয় অনঙ্গ ভীম, প্রথম ও দ্বিতীয় নরসিংহ দেব। লোকে বলে কোনারকে সূর্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন প্রথম নরসিংহ দেব।

তার পরে মুসলমান আক্রমণের যুগ। ফিরোজ শাহ তুঘলুক নিজে এসেছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীতে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সূর্য বংশীয় রাজা কপিলেশ্বর দেব দক্ষিণে পেন্নার নদী পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। পরে গোলকুণ্ডার সুলতানদের চাপে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল। উত্তরের মুসলমানদের চাপ উড়িষ্যা বেশি দিন সহ্য করতে পারে নি। মুকুন্দ দেব এ দেশের শেষ হিন্দু রাজা। বাঙলার সুবেদার সুলেমান কররাণীর সেনাপতি কালাপাহাড়ের হাতে পরাস্ত হন।

কালাপাহাড়ের গল্প আমি শৈশবে শুনেছিলুম। যাত্রার একটা পালা গানও শুনেছিলুম। তার কাহিনী এখন আর মনে নেই। তবে ইতিহাসের কথাটুকু মনে আছে। আকবর নামা তারিখ দাউদী প্রভৃতি গ্রন্থে তাকে আফগান বলা হয়েছে। কিন্তু বাঙলা ও উড়িষ্যায় জনশ্রুতি ছিল তিনি ব্রাহ্মণ, নাম রাজু। নবাবের কোন

কন্যার প্রেমে পড়ে মুসলমান হয়েছিলেন। সত্য যাই হোক, তাঁর মতো হিন্দু বিদ্বেষী ইতিহাসে কম আছে। শুধু আসাম বাঙলা ও উড়িষ্যা নয়, কাশী পর্যন্ত সমস্ত দেবালয়ের উপর তাঁর আঘাতের চিহ্ন আজও স্পষ্ট আছে। মাদলা পঞ্জীতে আছে যে মুকুন্দ দেবের পুত্র গৌড়িয়া গোবিন্দর আমলে কালাপাহাড় পুরী আক্রমণ করেন। জগন্নাথের মূর্তি পাণ্ডারা লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কালাপাহাড় তা খুঁজে বার করে আগুনে পুড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে দেন। এই পাপেই নাকি কালাপাহাড়ের হাত পা খসে পড়ে, অকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

রামানন্দবাবুর বক্তৃতা তখনও শেষ হয় নি। বলছিলেন: আফগানদের হাত থেকে উড়িষ্যা উদ্ধার করেন আকবর বাদশাহের সেনাপতি মানসিংহ। নাগপুরের ভোসলারা দখল করে আলিবর্দী খানের কাছ থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই আসে ইংরেজের হাতে। দেশ স্বাধীন হবার সময়েও পঁচিশটি দেশীয় রাজ্য এ দেশে ছিল।

ঋতার দিকে তাকিয়ে আমি আশ্চর্য হলুম। পরম কৌতুকে সে হাসছে, কিন্তু নিঃশব্দে। এই হাসি দেখে রামানন্দবাবুও থেমে পড়লেন। আমার দিকে পিছন ফিরে অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললেন: ব্যাপার কী?

বোধ হয় আপনার বিদ্যার বহর দেখে খুশী হয়েছেন।

ঋতার হাসিতে যে কৌতুক আছে, তিনি সে কথা ভুলে গেলেন। বললেন: সত্যি!

সত্যি বৈকি। ইতিহাসের এত খবর ক জনে জানে বলুন!

খানিকটা গর্বিত ভাবে রামানন্দবাবু বললেন: কাল রাতে অনেক পরিশ্রম করেছি।

তার পরেই বিমর্ষ ভাবে বললেন: মোটা মোটা বইএ কিছুই তেমন পেলুম না। শেষ পর্যন্ত একখানা চটি গাইড বইএ—

বলেই থেমে গেলেন।

আমিও তাড়াতাড়ি বললুম : বলবেন না, বলবেন না আপনার সম্বন্ধে লোকের অনেক উঁচু ধারণা।

লক্ষ্য করি নি, কখন আমরা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছি। বোধ হয় কোন সময় প্রধান রাজপথ ছেড়ে আমরা অন্য পথে এসেছি। মনে পড়ল, সাক্ষীগোপালের কথা। পুরী থেকে বারো মাইল উত্তরে এই মন্দিরটি আমরা যাবার পথে দেখে যাব বলে স্থির হয়েছিল। বাস এসে একটা গ্রামের মতো জায়গায় দাঁড়াল। আমরা সবাই নেমে পড়লুম।

প্রশস্ত পথ মন্দিরের দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে। সামনেই উঁচু অরুণ স্তম্ভ। তোরণের নিচে দিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলুম। উড়িষ্যার নিজস্ব রীতিতে তৈরি একটি ছোট মন্দির।

মন্দিরের কারুকার্য দেখবার মতো অপর্যাপ্ত সময় আমাদের ছিল না। ভুবনেশ্বর মন্দিরের শহর, নূতন রাজধানীও বটে। তার পরে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাহাড়। বাস থেকে নামবার সময় ড্রাইভার আমাদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি আমরা দেবতার দর্শন করে বেরিয়ে এলুম।

যাত্রীরা সচরাচর এখানে ট্রেনেই আসেন। পুরী-খুর্দা রোড শাখা লাইনের একটি ছোট স্টেশন। মন্দির আধ মাইলের মধ্যে। এক ব্রাহ্মণ বালকের মুখে শুনলুম যে পাশে একটি সরোবরও আছে। তাড়াতাড়ি তা দেখে এলুম। দক্ষিণ ভারতের মতো বাঁধানো টেপ্পাকুলম নয়। গ্রামের পুষ্করিণীর মতো। চারি পাশে সবুজ গাছে ছেয়ে আছে। মনে হয়, যাদের সময় অপর্যাপ্ত তারা এখানে সারাদিন কাটিয়ে তৃপ্তি পাবেন। গুপ্ত বৃন্দাবন এই বাগানের নাম, সার্থক নাম।

এই দেবতার প্রতিষ্ঠার একটা ইতিহাস আছে। বৃন্দাবনের

কৃষ্ণ এক ভক্তের মামলায় সাক্ষী দিতে নাকি বিদ্যানগরে এসেছিলেন। রাজা পুরুষোত্তম দেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই নগর জয় করে বিগ্রহের অধিকার পেয়েছিলেন। তিনি স্থাপন করেন কটকে। নীলাচল পরিক্রমায় এসে চৈতন্য দেব এই মূর্তি কটকেই দেখেছিলেন। সে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মোগল আমলে বোধ হয় এই মূর্তি সত্যবাদী গ্রামে তুলে আনা হয়। এই গ্রামেরই নাম সত্যবাদী।

ঋতাকে দেখতে পেয়ে রামানন্দবাবু বললেন: বৃন্দাবন থেকে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের জন্যে সাক্ষী দিতে এসেছিলেন বলেই দেবতার নাম সাক্ষী গোপাল হয়েছে।

ঋতা বলল: মামলা কিসের?

মামলা!

রামানন্দবাবুর মুখের অবস্থা বড় করুণ হয়ে উঠল। ভক্তের বিপদের একটা কাহিনী নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে দেবতা কেন ছুটে আসবেন! আমরা তখন বাসে উঠে বসেছি। মন্দিরের নিকটে হলে এক পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করা যেত। পয়সার জন্য যারা বাসটাকে ঘিরে ধরেছে, তাদের মুখ দেখে রামানন্দবাবু ভরসা পেলেন না। আমি বললুম: জিজ্ঞাসা করুন না কাউকে।

কাকে করব?

বড় অসহায় সুর। আমি যখন পাণ্ডাদের দেখিয়ে দিচ্ছিলুম, বাস তখন ছেড়ে দিয়েছে। রামানন্দবাবু খুবই মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু ঋতার দিকে চেয়ে দেখলুম, কৌতুকে তার দু চোখ চকচক করছে।

১৩

রামানন্দবাবু এবারে আর কোন নূতন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন না। মনে হল, তাঁর ব্যর্থতায় তিনি মর্মাহত হয়েছেন। একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারার জন্য তাঁর সারা রাত্রির পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেছে মনে করছেন। আমি কিছু বলব ভাবছিলুম, এমন সময় আমার পাশের ভদ্রলোক আমাকেই একটা প্রশ্ন করে বসলেন : বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি ?

ভদ্রলোকের উচ্চারণ ঠিক বাঙালীর মতো নয়। হয়তো এই দেশীয় মানুষ, কিন্তু বাঙলা জানেন। বললুম : কী করে জানলেন ?

আপনাদের আলোচনা দেখে।

বেড়াতে বেরোলে আমি নিজেই এই রকম করে মানুষের সঙ্গে পরিচয় করি। প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে দিই। কিন্তু এবারে সে রকম উৎসাহ আর কিছুতেই পাচ্ছি না। এবারে আমার চুপ করে থাকতেই ভাল লাগছে। তবু আমি তাঁকে বললুম : আপনি বুঝি কাজে যাচ্ছেন ?

কাজেই যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে বাসে উঠেছি। কিন্তু টুরিস্ট বাস বলে অনেকটা সময় নষ্ট হয় গেল।

একটু থেমেই প্রশ্ন করলেন : এখানে আপনারা কী কী দেখবেন ?

ঠিক জানি নে।

ভুবনেশ্বরে নতুন রাজধানী তো দেখবেনই, উড়িষ্যার নতুন পরিকল্পনা কিছু দেখবেন কি ?

বোধ হয় সময় হবে না।

সময়ের কথা বলবেন না। সমুদ্র আর মন্দিরে উড়িষ্যার শেষ নয়, এখানেও সভ্যতার প্রসার হচ্ছে। হীরাকুদ আর রাঁউরকেলা দেখে ফিরবেন।

সে তো পুরীর কাছে নয়।

দূরেও নয়। কটক থেকে ঢেনকানল হয়ে সম্বলপুর যাবার রাস্তা আছে। সম্বলপুরেই তো নতুন উড়িষ্যা জাগছে। অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি আর ব্রজরাজনগরের কাগজের কল। মহানদীর ওপর হীরাকুদ বাঁধ তৈরি হয়ে গেছে। এখন র‍্যাউরকেল্লার ইস্পাতের কারখানা। সবই কাছাকাছি। সম্বলপুর থেকে রাউরকেলা শাখা লাইন আছে। কলকাতা মাত্র আড়াই শো মাইল দূরে।

অন্যমনস্ক ভাবে বলে ফেলেছিলুম: এ সব জায়গা বুঝি আপনার দেখা?

এই প্রশ্ন ভদ্রলোক আমার কৌতূহল বলে মনে করলেন। গল্প বলার আগ্রহ তাঁর নিজেরও ছিল। আমার পরিচয় নিলেন, নিজেরও পরিচয় দিলেন। মহান্তি ব্যবসাদার, উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টকে নানা রকমের মাল সরবরাহ করেন। নানা জায়গায় নানা রকমের জিনিস। রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমে মচকুণ্ড নদীর বাঁধ থেকে উত্তর পূর্বের ময়ূরভঞ্জ রাজ্য পর্যন্ত। দক্ষিণে নূতন রাজধানী ভুবনেশ্বর থেকে উত্তরে কারখানা নগরী রাউরকেলা পর্যন্ত। বললেন: পুরনো উড়িষ্যার পাশে নতুন উড়িষ্যা কেমন করে গড়ে উঠছে, ভুবনেশ্বরে গেলেই তা দেখতে পাবেন। বড় দরিদ্র দেশ, বড় নির্যাতিতের দেশ, এ দেশের মানুষ বড় অবহেলার মধ্যে কোন রকমে বেঁচে ছিল। স্বাধীনতার পর আমাদের ঘুম ভেঙেছে, আমরা জেগেছি। মানুষের মতো বাঁচার চেষ্টা আমাদের শুরু হয়েছে।

একে একে ভদ্রলোক ভুবনেশ্বর কটক সম্বলপুরের গল্প বললেন, বললেন ঢেনকানল কেওনঝড় ময়ূরভঞ্জের গল্প। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, রামানন্দবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর মাথা হেলে পড়েছে নীরদবাবুর কাঁধের উপর। ঋতা মুখ ফিরিয়ে একবার রামানন্দ-

বাবুকে, এক বার আমাকে দেখল। একটুখানি হেসে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল।

প্রাচীন কলিঙ্গের রাজধানী ছিল ভুবনেশ্বর। এইখানেই অশোকের কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়েছিল। ইতিহাসের বিখ্যাত জৈন রাজা খরবেলাও এই শহরে তাঁর রাজধানী রেখেছিলেন। কিন্তু মহান্তি এ সব কথা বললেন না। বললেন: প্রাচীন শহরের পাশেই নতুন রাজধানী স্থাপন হয়েছে। বনবাদাড় কেটে এই শহর গড়তে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা খরচ হল।

এর আগে রাজধানী কটকে ছিল। সেইখান থেকে উঠে আসবার কারণও ভদ্রলোক বললেন। মহানদী আর কাঠজুরি এই দুই নদী কটককে তিন দিকে ঘিরে আছে। শহর বাড়াবার প্রচুর প্রয়োজন। অথচ তার উপায় নেই। স্থানাভাব। কাজেই কটক পরিত্যাগ করতে হল।

কটক দেখেছেন?

না।

দেখেন নি! কটকের উপর দিয়েই তো আপনারা এসেছেন!

তা এসেছি বটে। ঘুমিয়ে এসেছি।

তা হলে ফেরার সময় অবশ্য নামবেন। কয়েকটা জিনিস না দেখে গেলে দুঃখ থেকে যাবে।

ভেবেছিলুম, তিনি ঐতিহাসিক কিছু বলবেন। সপ্তম শতাব্দীর শহর, মুসলমান আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এ রাজ্যের রাজধানী ছিল। অনঙ্গ ভীম বা মুকুন্দ দেব নির্মিত দুর্গের কথা, দশম শতাব্দীর বিখ্যাত কাঠজুরি বাঁধের কথা বলবেন। কিন্তু মহান্তি সে ধার দিয়েও গেলেন না, বললেন: কটকের থার্মাল স্টেশন আর কাগজের কলের পরিকল্পনা দেখবেন। কলিঙ্গ রেফ্রিজেরেটার কর্পোরেশান, কোল্ড স্টোরেজ প্লাণ্ট। কটক জেলার কাপড় আর কাচের কারখানা।

বাধা দিয়ে আমি বললুম : একটা তুর্গের কথা শুনেছিলুম।

সে তো ভাঙ্গী তুর্গ। ন তলা বাড়ি একেবারে ভেঙে পড়েছে। শহরের মাইল খানেক উত্তরে, নাম বড়বাটি তুর্গ।

কাঠজুরি বাঁধের কথাও ভদ্রলোক এমনি সংক্ষেপে বললেন। এখন আর তারও কিছু পুরনো অবশিষ্ট নেই। শুধু বন্যার হাত থেকে শহরটা রক্ষা করবার ক্ষমতা আজও আছে। কেশরী রাজাদের এই কীর্তির এখনও সুখ্যাতি করতে হয়।

ইতিহাসে যে আরও একটি কটকের উল্লেখ দেখা যায়, মহান্তি তা বললেন না। মাদলা পঞ্জীর মতে কটকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কেশরী বংশের কোন রাজা। কিন্তু ভবগুপ্তের অনুশাসনে কটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন পঞ্চম শতাব্দীর রাজা। বর্তমানের কটকের মাইল তিনেক দূরে কপালেশ্বর নামে একটি তুর্গ আছে। তার মধ্যে চোরগঙ্গার পুকুর নামে একটি জলাশয় আছে। উৎকল রাজ চোরগঙ্গার নামে নাম। গ্রামের নাম কটক চৌদ্বার। জনমেজয় এই নগর স্থাপন করেছিলেন সর্প যজ্ঞের সময়। গ্রামের আজ কোন শ্রী নেই, কিন্তু প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় আছে ছড়ানো।

বড়বাটির তুর্গ নির্মাণ করেছিলেন রাজা অনঙ্গ ভীম চতুর্দশ শতাব্দীতে। তু ধারে পাথরের প্রাচীর। পরিখা চারি দিক ঘিরে। ভিতরে এক পাথরের স্তম্ভে রাজার পতাকা উড়ত। আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায় যে এই তুর্গের মধ্যেই রাজা মুকুন্দ দেবের প্রাসাদ ছিল ন তলা উঁচু। আজ তার কোন চিহ্ন নেই।

আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, ঋতা এখন আমাকেই লক্ষ্য করে হাসছে। তার বৌদির কানের কাছে মুখ এনে যা বলল, তার কিছু আমার কানে গেল। বাকিটুকু আমি অনুমান করে নিলুম। বলল : আর এক রামানন্দবাবু ধরেছেন।

আমি বলতে পারতুম, ঋতাও তো আমাকে ধরেছে। কিন্তু কেন এরা আমাকে ধরে! আমি কি ভাল শ্রোতা, না ভাল সঙ্গী! আমি তো কাউকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করি না। বরং আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি অনেককে। তবু কেন আমাকে এরা গল্প শোনায়! অবহেলায় কেন দূরে ঠেলে দেয় না! এ আমার সৌভাগ্য ছাড়া আর কী মনে করব!

রামানন্দবাবুর নাক ডাকছে অল্প অল্প। যাত্রীরা কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে কথা কইছেন। ওধারের এক ভদ্রলোক কঠিন দৃষ্টিতে আমাদের লক্ষ্য করছিলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। গলাবন্ধ কোটের উপর গরম চাদর। নাকের পাশ দুটো একটু কুঁচকে উঠেছে। মনে হচ্ছিল, আমাদের কথাবার্তাই তাঁর বিরক্তির কারণ, কিংবা আমাদের আলোচনার বিষয়। তাঁর চোখের দিকে চেয়ে আমি কোন প্রশ্ন করবার সাহস পেলুম না।

মহান্তি বললেন: কটক থেকে সম্বলপুরের রাস্তা সোজা উত্তরে গেছে। কলকাতা-মাদ্রাজ লাইনে কটক। আর কলকাতা-নাগপুর লাইনে রাউরকেলা প্রায় সমান রাস্তা। রাউরকেলা থেকে সম্বলপুর শাখা লাইন। সম্বলপুর থেকে কটক পাকা রাস্তা। রায়পুর বিজয়নগরের মতো রেলে যুক্ত হলে এ মুলুকের সমৃদ্ধি বাড়ত। সম্বলপুর থেকে ছ মাইল উত্তরে মহানদীর দুই ধারার মধ্যে হীরাকুদ একটি দ্বীপ ছিল। নতুন বাঁধ হয়ে তার রূপ একেবারে পালটে গেছে। তেমনি রাউরকেলার চেহারাও।

সামনের ভদ্রলোক বোধ হয় আর নীরব থাকতে পারলেন না। উড়িয়া ভাষায় যা বললেন তার অর্থ বোধ হয়: কল-কারখানা ছাড়াও এ দেশে অনেক দেখবার জিনিস আছে।

তা আছে বৈকি: মহান্তি মেনে নিলেন: সম্বলপুর শহরেই আছে শ্যামলেশ্বরী দেবীর মন্দির। সম্বলপুরের প্রাচীন রাজাদের গৃহদেবতা বলে শুনেছি।

সেই ভদ্রলোক বললেন : বেদব্যাসের কথা বলুন।

বেদব্যাস ?

হ্যাঁ, সুন্দরগড় জেলার বেদব্যাস।

মহান্তি বোধ হয় তাঁদের নিজেদের ভাষায় তাঁর অজ্ঞতা স্বীকার করলেন। ভদ্রলোক তখন আমার দিকে চেয়ে বললেন : মহাভারত রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাসের নাম শুনেছেন তো, তাঁরই জন্মস্থান। পনপোশ নামে রেল স্টেশনের মাইল খানেক দূরে শঙ্খ ও কোয়েল নদীর সঙ্গম থেকে ব্রাহ্মণী নদীর জন্ম। বেদব্যাসের জন্ম হয়েছিল এই তীর্থে।

মহান্তি নাক সেঁটকালেন। মনে হয় এ কথা তাঁর বিশ্বাস হয় নি। ভদ্রলোকও এই কথাই জিজ্ঞাসা করলেন : কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?

কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে বললেন : ধুতি ছেড়ে পাৎলুন ধরেছেন, সংস্কৃত ছেড়ে ইংরেজী। সাহেবদের শেখানো কথাই তো ভাল লাগবে।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : সাহেবরা আমাদের ধর্মে অবিশ্বাস করতে শিখিয়েছে। বেদ হল বুনো লোকের কথা, উপনিষদ পাগলামি, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ হল রূপকথা। এই সব কথা প্রচার করলেই তো পৃথিবীতে পরোপকারী নাম নেওয়া যায়। একটা অসভ্য জাতকে গড়ে-পিটে মানুষ করবার মহৎ দায়িত্ব নিয়েছিল তারা।

বুঝতে পারলুম যে এ আমার ধুতি পাঞ্জাবির কদর হল। আমার বিশ্বাসের প্রশ্ন না তুলেই তিনি ধরে নিলেন যে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা আছে। থাকা অনুচিত নয়। কিছু অসম্ভব ঘটনা আছে বলেই না আমরা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে ইতিহাস না বলে রূপকথা বলছি। কিন্তু বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে অনেক অসম্ভব ঘটনাই তো সত্য বলে মেনে নিতে

বাধ্য হয়েছি। এই কিছু দিন আগে পুষ্পক রথে আকাশে ওড়ার কথা ছিল আমাদের কল্পনায়। আজ তো সবাই আমরা আকাশে উড়ে সেই স্বপ্ন সার্থক করছি। আজ শুধু শব্দভেদী বাণ নয়, যে কোন অস্ত্র যে কোন দিকে নিক্ষেপ করছি। সমুদ্রের নিচে পাতালে নামছি স্বচ্ছন্দে। কোন কোন রাষ্ট্রনেতা আজ শিবের মতো তাণ্ডব নৃত্য শুরু করলেই পৃথিবী রসাতলে যাবে। সভ্যতা আরও উন্নত হলে পুরাণের সমস্ত অসঙ্গতিই বাস্তব বলে বিশ্বাস হবে।

প্রশ্ন করলুম ঃ এ রকমের তীর্থস্থান আরও কিছু আছে নাকি ?

আছে বৈকি। কেওনঝড়ের মাইল দশেক দূরে আছে গন্ধমাদন পর্বত। সাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু। রামায়ণের গন্ধমাদন কিনা জানি না, কিন্তু এই পাহাড়ও নানা রকম ওষধির জন্য বিখ্যাত। তারপর যাজপুর। যাজপুরের নাম নিশ্চয়ই জানেন ?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন ঃ মহাভারতের বন পর্বে এই তীর্থের উল্লেখ পেয়েছেন। পঞ্চপাণ্ডব এখানে এসেছিলেন। কেন আসবেন না! এই তীর্থের সৃষ্টিমাহাত্ম্য পুষ্করের মতো পবিত্র। ব্রহ্মা এই বৈতরণীর তীরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। সেই থেকে যজ্ঞপুর নাম। যজ্ঞের হোমাগ্নি থেকে দুর্গা বিরজা মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁর প্রতিমা করেন। সেই জন্য বিরজাক্ষেত্র নামেও এই তীর্থ প্রসিদ্ধ হয়েছে। পুরাণান্তরে অন্য কথা আছে। গয়াসুর যখন বিষ্ণুর চরণে তার দেহ বিস্তার করে, তখন তার মাথা ছিল গয়ায়, পীঠাপুরমে পা ও নাভিদেশ এই যাজপুরে। যাজপুর তাই নাভি গয়া নামেও পরিচিত। যে প্রস্রবণে যাত্রীরা পিণ্ড দান করে, তারই নাম গয়াসুরের নাভি। বৈষ্ণবরা এই তীর্থকে বলেন গদাক্ষেত্র। বিষ্ণু নাকি এইখানে তাঁর গদা রেখেছিলেন। তীর্থ সম্বন্ধে শেষ কথা, যাজপুর একটি পীঠস্থান। তাঁর বিরজা নামানুসারে এই পীঠের নাম বিরজাক্ষেত্র।

মহান্তি তাঁর পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধূমপানে মনোনিবেশ করেছিলেন। বাহিরের দিকে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন যে এই সব অবিশ্বাস্য প্রসঙ্গে তাঁর কান নেই। না থাক, আমাদের বর্তমান বক্তা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন : আপনারা ইতিহাসকে আজকাল খুব বেশি প্রাধান্য দেন। তাতেও এই স্থানের প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। উড়িষ্যার সোম বংশীয় রাজা মহাশিব গুপ্ত যযাতি এই স্থানে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানীর নাম হয় যযাতি নগর বা যযাতিপুর। প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। একদা যে এই নগর সমৃদ্ধ ছিল, তাতে আজ কোন সন্দেহ নেই। যত মন্দির, তত সৌধ অট্টালিকা। কালের কবলে যত ভেঙে পড়েছে, তার চেয়ে বেশি ধ্বংস করেছে কালাপাহাড়। উৎকলের রাজা মুকুন্দ দেব হরিচন্দন মোগলের সঙ্গে মিত্রতা করেছেন শুনে পাঠানেরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা তখন গৃহশত্রু দমনে ব্যতিব্যস্ত। উড়িষ্যার সমস্ত দেবমন্দির ধ্বংস হয়ে গেল। যাজপুরের মন্দির মুসলমানদের সম্পত্তি হল। আমির-ওমরাহের আবাস তৈরি হল ভাঙা মন্দিরের পবিত্র পাথরে, রাজার প্রাসাদ হল পাঠানের আস্তাবল। ইংরেজের আমলে এগুলিও রক্ষা পায় নি। এই সব শক্ত ইঁট পাথরের ট্রাঙ্ক রোডের সেতু নির্মিত হচ্ছে।

তাই হয়। অপরকে শ্রদ্ধা করেই নিজে শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। পৃথিবীতে রাজার সংখ্যা আকাশের তারার মতো অগণিত। যাঁরা নিজে ভোগ করতে চেয়েছেন সুখ ও সম্মান, পৃথিবীর লোক তাঁদের ভুলে গেছে। যাঁরা প্রজাকে কিছু দিয়েছেন, তাঁরাই আজও বেঁচে আছেন। কৃষ্ণ বুদ্ধ খ্রীষ্টকে কেউ ভোলে না, মানুষের জন্য যে তাঁরা জীবন দিয়েছেন।

ভদ্রলোক বললেন : মুহম্মদের সম্বন্ধেও একটি কাহিনী এ দিকে প্রচলিত আছে।

কিন্তু সেই কাহিনী বলার অবকাশ তিনি পেলেন না। আমি একটা হাই তুলেছিলুম। তাই দেখে ঋতা হেসে উঠে বলল: ঘুম পাচ্ছে তো?

মনে হল যে ঋতা আমাকে রক্ষা করারই চেষ্টা করল। তাই তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম: ঘুম ভাঙলেও হাই ওঠে।

আপনি কি ঘুমিয়েছিলেন এত ক্ষণ?

না, ঘুম নয়, জেগে স্বপ্ন দেখছিলুম।

বেশ অদ্ভুত মানুষ তো আপনি! এই ঝাঁকানিতেও স্বপ্ন দেখেন!

আমি আমার পাশের দু জনকে দেখিয়ে বললুম: ওঁরা যদি অকাতরে ঘুমোতে পারেন তো স্বপ্ন দেখলে আমার দোষ?

কী স্বপ্ন দেখলেন?

আকাশকুসুমের।

সে আবার কী?

আমি সামনের ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, বিরক্ত হয়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। বিরক্ত হবারই কথা। আর একটি কাহিনী বলবার জন্য তিনি তৈরি হয়েছিলেন। বাধা পেলে কে না বিরক্ত হয়। কিন্তু আমি খুশী হয়েছিলুম। মুহম্মদের গল্প আমাকে শুনতে হত। এ কোন্ মুহম্মদ জানি নে। অসম্ভব গল্প শোনাতেও বিপদ আছে। ঋতার উত্তর দিতে আমি তাই দেরি করলুম না: নীল আকাশে এক থোকা চাঁপা ফুল দুলছে।

সহসা ঋতা যে তার নিজের দেহে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল, আমি তা লক্ষ্য করতে ভুল করি নি। তার বৌদিকেও একবার সে দেখে নিল। সে মহিলাও ঢুলছিলেন। আমি অমনি বললুম: ভারি সুন্দর সজীব ফুল।

আকাশে কি ফুল দোলে?

গাছের ফুল দোলে না, দোলে আকাশকুসুম।

আপনি তো চাঁপা ফুল বলছেন!

সত্যি চাঁপার কি থোকা হয়! কিন্তু এত প্রশ্ন করলে স্বপ্নটা বলি কী করে!

আচ্ছা বলুন, আমি আর প্রশ্ন করব না।

বললুম: মাটিতে একটা দাঁড়কাক বসেছিল। বিশ্রী দেখতে। কিন্তু তার চোখ সেই আকাশকুসুমের দিকে।

কথা বলতে বারণ করেছেন, তা না হলে বলতাম, এ অসম্ভব কথা। ভ্রমর নয়, প্রজাপতি নয়, টিয়ে পাখী বললেও আপত্তি ছিল না। দাঁড়কাক ফুলের শোভা দেখছে, এ কথা বিশ্বাস করতে রীতিমতো কষ্ট হয়।

আপনার কষ্ট হলে আমি কী করতে পারি! স্বপ্নটা তো আমি দেখেছিলুম, আর আপনাকে দেখি নি।

আচ্ছা, তার পর বলুন।

দাঁড়কাক ভাবল, ফুলটা বেশ।

ঋতা প্রবল ভাবে আপত্তি জানাল: দাঁড়কাক এ কথা ভাবতেই পারে না।

তবে থাক।

না না, থাকবে কেন, বলুন আপনি।

দাঁড়কাকের ইচ্ছা হল, ঐ থোকাটা তার চাই। কিন্তু আকাশকুসুম তো গাছের ফুল নয় যে গাছের ডালে বসে ঠোকরানো চলে!

তবে কি।—

উঁহু, দাঁড়কাকও সে পাত্র নয়, উড়ল ফুলের পেছনে।

ঋতার মুখে ভারি প্রসন্ন হাসি। সে যে বেশ কৌতুক বোধ করছে তাতে সন্দেহ নেই।

বললুম: কিন্তু ফুল ছোঁয়া কি তার কর্ম! সে যত ওড়ে, ফুলও তত সরে যায়। কখনও ওপরে, কখনও নিচে, কখনও বা আলোয়

লাগে ধাঁধা। আকাশের নীলে হারিয়ে যায় হলুদে চাঁপা।

আমি থামতেই ঋতা বলল: তারপর?

তার পরের কথা আপনার বিশ্বাস হবে না।

আগের কথা কি বিশ্বাস করেছি ভাবছেন?

কোন অসম্ভব আজগুবী কথা তো বলি নি। বিশ্বাস করার বিশেষ কোন বাধা নেই।

কী বলছেন আপনি! আকাশকুসুমের গল্প কি বিশ্বাস করা যায়!

কেন যাবে না! আকাশকুসুমের বদলে চীনে লণ্ঠন ভাবুন, আর দাঁড়কাকের বদলে পাতিহাঁস। মাটির ওপরে পাতিহাঁস লাফাচ্ছে, উড়ছেও। কিন্তু চীনে লণ্ঠন কিছুতেই ছুঁতে পারছে না। এইবারে বলুন তো, এর ভেতরে অসম্ভব কী আছে!

সবই তো আজগুবী কথা!

তা হলে শুনবেন না।

আচ্ছা আর দাম বাড়াবেন না, বলুন বাকিটুকু।

হঠাৎ সেই দাঁড়কাক পাখা ঝাড়তে শুরু করল। পাখা ঝাড়ছে তো ঝাড়ছেই। আর তার সেই ধূসর রঙ বদলাচ্ছে রামধনুর রঙের মতো। ফুল তো হতভম্ব, এ আবার কী! এ তো দাঁড়কাক নয়, এ কী এল তাকে ছলনা করতে!

বেশ জমেছে তো এবারে!

জমবেই তো। স্বপ্ন যদি না জমে তো গল্প জমবে কি আপনার আমার!

ঋতা বলল: আপনার ঘুম ভাঙছে না দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। ঠিক এই রকম সময়ে আমার যায় ঘুম ভেঙে, স্বপ্নের শেষ আর দেখা হয় না।

আমি বললুম: আপনারও বুঝি তাই হয়?

আপনার ঘুমও বুঝি ভেঙে গেল?

একটু পরে।

তবু ভাল, গল্পের শেষটা শোনা যাবে।

শেষ আর দেখলুম কোথায়!

না না, আর দেরি করবেন না। বাকিটা এক নিশ্বাসে বলে ফেলুন।

বললুম: দাঁড়কাককে আর চেনা যাচ্ছে না। মানুষের মতো দেখতে হয়েছে, ঠিক কার মতো চিনতে পারছি না। ফুলের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওমা, ফুলও যে আর ফুল নয়, সেও মানুষ। কেমন চেনা চেনা, অমন মেয়ে যেন কোথায় আমি দেখেছি।

সকৌতুকে ঋতা বলল: নিজেকেই আপনি দাঁড়কাক দেখেন নি তো?

হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়ে বাসটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রশ্নটা ঋতা ভেবেছিল ধাক্কার আগে, করেছিল পরে। আচমকা ধাক্কা খেয়ে বেশ জোরেই প্রশ্ন করেছিল।

বাসের ভিতর সবাই সচকিত হয়ে উঠলেন। যাঁরা ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁরা জেগে উঠলেন। পড়তে পড়তেও সামলে নিলেন কয়েক জন। দুর্ঘটনা নয়। ভুবনেশ্বরের রাস্তায় আমরা চলছিলুম। পথের একটা ভিখারীকে বাঁচাতে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়েছে।

রামানন্দবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন ঋতার মুখের দিকে। অত্যন্ত কাতর স্বরে বললেন: আমাকে দাঁড়কাক বললেন?

নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় গায়ের রঙ দেখলেন। বড় করুণ অসহায় দৃষ্টি। বড় বিপন্ন।

উত্তর না দিয়ে ঋতা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল: আপনি বেশ স্বপ্ন দেখেন!

১৪

ভিখারীটা চাপা পড়ে নি। পড়ে গেলে গড়িয়েও সে আত্মরক্ষা করতে পারত। আত্মরক্ষাই তো তার একমাত্র কাজ। সারা জীবন ধরে সে এই চেষ্টাই করেছে। একটা বক্র রুগ্ন পা নিয়ে জন্মেই সে জেনেছিল, যে যুদ্ধ করবার জন্য সে জন্মেছে। জয়ের জন্য যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ বেঁচে থাকবার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য। সরকার তাকে সাহায্য করবে না, সমাজ করবে না, করবে না তার আত্মীয় পরিজন। যত দিন বাপ মা আছে, তত দিনই তার বিশ্রাম। তার পর জীবন ব্যাপী যুদ্ধ।

চাপা পড়লেই বা কী ক্ষতি ছিল! কার ক্ষতি! বরং লাভই হত ঐ ক্লান্ত সৈন্যটির। প্রাণের যে মায়ায় সে ঐ পঙ্গু দেহটা কোন ক্রমে বয়ে বেড়াচ্ছে, মুহূর্তে সে মায়া ফুরিয়ে যেত। মরে সে বাঁচত। তার জ্বালা জুড়োত। যাত্রীরা রক্ষা পেত তার হাত থেকে। মন্দিরের পথে হাত বাড়িয়ে তাদের বাধা দিত না, এত বড় মোটর বাসেরও পথ আর আটকাত না। এক দিনে মরে কেন বাঁচে না এই হতভাগাগুলো!

অন্যমনস্ক ভাবে আমি আমার পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিয়েছিলুম, সমস্ত পয়সা নিয়েছিলুম মুঠো করে। কিন্তু ছুঁড়ে দিতে পারলুম না। বাসের ড্রাইভার তাকে অকথ্য ভর্ৎসনা করছে, নিঃশব্দ দৃষ্টিতে সমস্ত যাত্রী তাকে সমর্থন করছে। এক মুঠো পয়সা ছুঁড়ে আমি তাদের ভর্ৎসনার প্রতিবাদ করতে পারলুম না। তোমারও বাঁচার অধিকার আছে, এ কথা বলার সাহস আমার নেই।

জনবহুল পথ অনেকটা অতিক্রম করে লিঙ্গরাজ মন্দিরের সামনের রাস্তায় এসে বাস দাঁড়াল। আমরা নেমে পড়লুম। ও ধারের বড় গাছের নিচে বাস আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে।

রামানন্দবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বেদনা বোধ হল। তিনি অপমানিত বোধ করেছেন কিনা জানি না, আঘাত যে পেয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। ভদ্রলোকের রঙ ময়লা, চেহারাটাও কিছু শুকনো। কিন্তু দাঁড়কাকের মতো নিশ্চয়ই নয়। হলেও তা মুখের উপরে কেউ বলে না। শুধু সৌজন্য বিরুদ্ধ নয়, বিবেক বিরুদ্ধও বটে। পুরুষের নিন্দে করে মেয়েরা এমন আনন্দ পায় কেন! এ যে অমানুষিক আনন্দ!

রামানন্দবাবুকে আমি এগোতে দিলুম না, বললুম: একটু দাঁড়িয়ে যান।

মুখ ফিরিয়ে ভদ্রলোক বললেন: থাক থাক।

আমি বললুম: আমার ওপরে কেন রাগ করছেন?

কিন্তু রামানন্দবাবু এ কথার উত্তর দিলেন না। উত্তর নেই। আমার আচরণে আপত্তি করবার মতো তিনি কিছু পান নি। তাঁর ঘুম ভাঙবার পরে আমি কোন কথাই বলি নি।

ঋতা তার দাদা বৌদির সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। মনে হল, তার বৌদি তাকে বকছেন। বোধ হয় সেই মন্তব্য আর হাসির জন্যই বকছেন। পুরো গল্পটা না শোনার ফলে ঐ মন্তব্যটা অভদ্রের মতো শুনিয়েছে। যাদের সঙ্গে পরিচয় নেই ঘনিষ্ঠ, তাদের সঙ্গে পরিহাস কেন! চলতি কথায় একে ছ্যাবলামি বলে। ভারিক্কী হবার বয়স হয়েছে ঋতার।

রামানন্দবাবুকে আমি বললুম: আপনার জন্যেই মেয়েটা বকুনি খাচ্ছে।

কেন?

যে কথা আপনাকে বলে নি, তার উত্তর আপনি কেন দিতে গেলেন?

আমাকে বলে নি!

গভীর বিস্ময়ে ভদ্রলোক অধৈর্য হলেন।

বললুম: আমরা দাঁড়কাকের গল্প করছিলুম—দাঁড়কাক আর আকাশকুসুম। ঋতা আমাকেই ও কথা বলেছিল।

সহসা ভদ্রলোকের বিশ্বাস হল না। বললেন: আপনার রঙ তো—

রঙের কথা কেন ভাবছেন! যখন বামন হয়ে চাঁদে হাত বলি, তখন কি লম্বা লোককে সে কথা বলি নে!

রামানন্দবাবু খানিকটা প্রসন্ন হলেন, বললেন: তা হলে আমাকে কিছু বলেন নি বলছেন!

সে কথা তো অনেকক্ষণ থেকেই বলছি।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের শহর। একদা এখানে নাকি সাত হাজার মন্দির ছিল। আজও আছে শ পাঁচেক মন্দির। সবই ভেঙে পড়ে নি, অনেক মন্দির আছে সগৌরবে দাঁড়িয়ে। অনুসন্ধান করলে এই মন্দিরের প্রাচুর্যের একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টের জন্মের তিন শো বছর আগে থেকেই এ অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জৈন প্রভাবও ছিল। পাঁচ ছ মাইল দূরে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি তার প্রমাণ বহন করছে। প্রমাণ আছে ধৌলিতে অশোকের শিলালিপিতে। হঠাৎ এক দিন এ অঞ্চলের লোক বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চাইল। অষ্টম শতাব্দীর একেবারে শেষে যযাতি হলেন দেশের রাজা। রাতারাতি তিনি দেশের চেহারা বদলে দিলেন। লিঙ্গরাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। পাঁচ শো বছর ধরে এই মন্দিরকে ঘিরে নূতন নূতন মন্দির নির্মিত হল। এ শুধু প্রেরণা নয়, এ পাগলামি! প্রেমের মতো ধর্মের নামেও তো মানুষ পাগল হয়।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। এমন বিশাল মন্দির বুঝি আমি আগে কখনও দেখি নি। পুরীতে জগন্নাথের মন্দির দেখেছি অন্ধকারে। সে কথা এখন মনে পড়ল

না। শ্রীরঙ্গমের গোপুরমের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল মাদুরার মীনাক্ষি মন্দির ও রামেশ্বরমের গোপুরমের কথা। গোপুরম তো মন্দির প্রবেশের দ্বার, মন্দির নয়। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের চেয়ে গোপুরমের উচ্চতাই বেশি। কিন্তু লিঙ্গরাজের মন্দিরের উচ্চতা দেখেই বিস্মিত হলুম। শুধু উচ্চতা কেন, ছোট ছোট অসংখ্য মন্দিরে সমস্ত প্রাঙ্গণ ছেয়ে আছে। গায়ে গায়ে মন্দির, কারুকার্যে কণ্টকিত মন্দির। কাছে যাবার আগে আমি দূর থেকে এই মন্দিরের শোভা দেখলুম।

রামানন্দবাবু আজ আমার কাছে ছিলেন। আমার আগ্রহ দেখে বললেন: এই মন্দিরগুলোর একটা নির্দিষ্ট গঠন রীতি আছে। উড়িষ্যার নিজস্ব রীতি। অনেক দিন আগে নির্মলকুমার বসুর একখানা বই দেখেছিলুম কোনারকের ওপর লেখা। তাতে প্রত্যেকটি অংশের মাপজোখ পর্যন্ত এঁকে দেখানো ছিল। এবারে এখানে আসবার সময় সে বইখানা কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারলুম না।

তাতে দুঃখ কী! আমরা তো আর মন্দির গড়ব না, মন্দির দেখব। মাপজোখ না জানা থাকলেও মন্দিরের সৌন্দর্য বুঝতে আমাদের কষ্ট হবে না।

রামানন্দবাবু আমাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করলেন: ঐ যে উঁচু শিখরটা দেখছেন, তার নাম হল বিমান। তার পর জগমোহন নাট মন্দির, একেবারে এ ধারে ভোগ মন্দির। এই চারিটি অংশ নিয়ে একটি মন্দির সম্পূর্ণ হয়েছে। এই বিমানটি বোধ হয় সোয়া শো ফুটের ওপর হবে। ভিতরে এর সিঁড়ি নিশ্চয় আছে।

বললুম: এ সব কথা বসে বসে শুনব। তাড়াতাড়ি মন্দির দেখে দুটো খেয়েও নিতে হবে।

কোথায় খাবেন?

বাজার তো চারি ধারে, এক আধটা হোটেল কি আর নেই!

রামানন্দবাবু এ কথার উত্তর দিলেন না। নিঃশব্দে মন্দিরের কাছে এগিয়ে গেলেন।

যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা পূজো করবেন, বাহিরে তাঁরা ফুল বেলপাতা কিনেছেন। আমাদের মতো মন্দিরের দেওয়াল না দেখে তাঁরা সোজা ভিতরে চলে গেলেন। মন্দিরের চেয়ে তাঁদের কাছে মন্দিরের দেবতাই বড়। পুরাকালে এই বিধিই ছিল। দেশ দেশান্তর থেকে যাত্রী আসত দেবদর্শনে। তাদের জন্য বিরাট প্রাঙ্গণ তৈরি হত, বিপুল জলাশয়। স্নানাহ্নিক করে তারা এই প্রাঙ্গণে এসে জমা হত। দেবতা আছেন বাতায়নহীন অন্ধকার গর্ভ গৃহে। দিনে রাতে সমান অন্ধকার। মিটমিট করে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলছে, ধূপে ও ধুনায় বাতাস অসাড় হয়ে গেছে, ফুল ও চন্দনের সুগন্ধে আকুল হয়ে আছে দশ দিক। ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করছেন, মন্ত্র পড়াচ্ছেন। গম্ভীর উদাত্ত স্বরে গমগম করছে মন্দিরের অভ্যন্তর। যাত্রীর জনতা এক সঙ্গে এসে কোলাহল করবে না। আসবে একে একে, মাথা নত করে, ফুল চন্দন নৈবেদ্য হাতে। পূজা করবে, নির্মাল্য চরণামৃত নেবে, মন ভরে নেবে অমূল্য ঐশ্বর্যে, তারপর বেরিয়ে যাবে। এমনি করে সকল যাত্রী দেখবে দেবতাকে। আজ পৃথিবীর রূপ বদলেছে, রীতিও বদলেছে। আজ আমরা দেবতার বদলে দেখি মন্দিরের কারুকার্য। সমাজেও আমাদের জীবনের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে বিলাসের আয়োজন। ভোগের উপকরণ নিয়ে জীবনকে আমরা ভুলে আছি।

দু জন শিখ ভদ্রলোককে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। তাঁরা অনেক অধ্যবসায়ে ও প্রচুর পরিশ্রমে মন্দিরের গা বেয়ে উপরে উঠছিলেন। প্রথমটায় আমি এই কষ্ট স্বীকারের কারণ বুঝি নি। পরে নিজের চোখেই সব দেখতে পেলুম। খানিকটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে তাঁরা ক্যামেরা খুললেন। মন্দির গাত্রের ছবি

নেবেন। নিচে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি আমার আবেশে আচ্ছন্ন হল। মনে হল, স্বপ্ন দেখছি। এ তো মন্দির নয়, এ কোন শিল্পীর স্বপ্ন। পাথরে সেই স্বপ্নের রূপ দিয়েছে। অনন্ত কাল স্বপ্ন দেখবে, কিছুতেই আর ঘুম ভাঙবে না।

এক পণ্ডিতের কথা আমার মনে পড়ল। এই মন্দিরের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে যাঁরা এই মন্দির দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে শত পৃষ্ঠা লিখেও এই মন্দিরের সৌন্দর্যের বর্ণনা হয় না। কিন্তু যারা দেখে নি, তাদের জন্য তিনি কিছুই লেখেন নি। ছবি দেখে এই সব মন্দির সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা হয় না।

বিমানের যে অংশ দূর থেকে দেখা যায়, কারুকার্যের বাহুল্য তাতে নেই। পিরামিডের মতো তার দেহ সমতল নয়, গম্বুজের গায়ের মতোও মসৃণ নয়। কতকটা ঢেউ খেলানো, ঢেউ উপর থেকে নিচে। আর তার উপর আঁজি, ঘন বেড় দেওয়া। দূরে না গেলে মন্দিরের এ অংশ চোখে পড়ে না। আর নিচে দাঁড়িয়ে যতটুকু দেখা যায়, ততটুকুই অপূর্ব শিল্পমণ্ডিত। মন্দিরের ছবিতে তা পাওয়া যায় না, তার ছবি আলাদা নিতে হয়।

এই সব মন্দিরের স্থাপত্য রীতিতে আমার কোন অধিকার নেই। তবু আমি মনোযোগ দিয়ে দেখছিলুম। মন্দিরের গায়ে সমতল স্থানের যেন একান্তই অভাব। পাশাপাশি থাম উঠেছে। সে থাম গোল নয়, চার কোণাও নয়, মন্দিরের গা থেকে ধাপে ধাপে সামনে এসে পাশে নেমেছে। আবার এগিয়ে এসেছে। অর্থাৎ মন্দির চতুষ্কোণ নয়, ছ কোণ আট কোণও নয়, শত সহস্র কোণে কণ্টকিত। নিচু স্থানগুলোতে আলো পৌঁছচ্ছে না, কিন্তু শিল্পীর দক্ষ হাত সর্বত্র পৌঁছেছে।

থামগুলিও সমতল নয়। নানা ঢঙের নানা আকারের কানিসে পূর্ণ। মাঝখানের স্থানগুলিতে মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। চারি দিকে লতাপাতার সূক্ষ্ম কাজ। মাঝখানে অপূর্ব ভঙ্গিতে

নানা মূর্তি। দেবদেবীর সঙ্গে নায়িকা অলসকন্যার মূর্তি আছে। পৌরাণিক প্রাণী আছে, মিথুন মূর্তিও আছে। মূর্তির শেষ নেই। নিচের মূর্তিগুলির চেয়ে উপরের মূর্তিগুলি বুঝি আরও সুন্দর। নিচে থেকে ছবি নেবার অসুবিধার জন্য সর্দারজীরা উপরে উঠেছেন। তাঁদের একজন প্রৌঢ়। পড়ে গেলে যে প্রাণ বিপন্ন হবে, সে কথা এখন তাঁদের মনে নেই।

পাশে হঠাৎ ঋতার গলা শুনলুম: এমন মনোযোগ দিয়ে কী দেখছেন?

কোন প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলুম না। বোধ হয় চমকে উঠেছিলুম। তাই লক্ষ্য করে ঋতা হাসল। বললুম: যা আপনারা দেখতে এসেছেন, তাই দেখছি।

আপনি বুঝি অন্য কিছু করতে এসেছিলেন?

আমি কিছু করব না বলে এসেছিলুম।

সে সংকল্প তা হলে রইল না!

মানুষের সংকল্প ভাঙে আর গড়ে, মানুষ বলেই তার দুর্বলতা।

আপনি কি কবিতা লেখেন?

কেন বলুন তো?

আপনার কথাবার্তায় আমার তাই সন্দেহ হয়।

এই দুর্নাম আপনিই প্রথম দিলেন।

এ কি দুর্নাম?

যে খাতা লিখি তা কবিতার খাতা নয়, সওদাগরি অফিসের খাতা, ফিতে বাঁধা ফাইল। ওর কোনখানে এক ছত্র কবিতা লিখলে চাকরি যাবে। যে কাজে চাকরি যায় সে তো প্রশংসার কাজ নয়, নিন্দার জিনিস। আমরা তাকে দুর্নামই বলি।

বাড়িতে লুকিয়ে লিখলেও দুর্নাম?

যত ক্ষণ লুকনো থাকে, তত ক্ষণই ভাল। প্রকাশ হলেই

বিপদের শুরু। যত নাম হবে, বিপদও বাড়বে তত। কর্তারা কোন দোষ না পেয়েও বলবে, ফাঁকি দিচ্ছে অফিসে।

কেন বলবে?

তারা কেউ যে লেখে না। সে পারে না বলে তো নয়, সময় পায় না বলে। লেখবার যে সময় পায়, সে নিশ্চয়ই ফাঁকি দেয়। এই হল কর্তাদের ধারণা।

আপনার যুক্তি খুব ভাল।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখছিলুম না, ঘুরে ঘুরে দেখছিলুম। অশ্লীল নিখুঁত মূর্তি দেখে চকিতে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলুম। ঋতাও তাই করেছে। কারও সামনে এই সব মূর্তির দিকে তাকাতে লজ্জা করে। দেখেছি ভাবতেও অনেকের লজ্জা করবে। এখানে কেন, অনেক তীর্থে অনেক মন্দিরের গায়ে এই অশ্লীলতার নমুনা আছে। কোনারকের মন্দিরেই তার চরম উৎকর্ষ বলে শুনেছি। অনেক আলোচনাও পড়েছি এই সব মূর্তি নিয়ে। এখানে তা ভাববার সময় পেলুম না। ঋতা বলল: আপনার সঙ্গী কোথায়?

রামানন্দবাবুর কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম। ভদ্রলোক কথায় কথায় যে সরে পড়েছিলেন তা খেয়াল করি নি। বললুম: আপনার খোঁজে গিয়েছিলেন।

সে কি!

আপনি তাঁকে দাঁড়কাক বলেছেন বলে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

তাঁকে কেন বলব!

সে কথা তিনি বিশ্বাস করছেন না।

কেন?

আমার চেয়ে নাকি তাঁর গায়ের রঙ কালো।

ঋতা খিলখিল করে হেসে উঠল : ভারি বিপদ তো ভদ্রলোককে নিয়ে!

না নিয়ে আরও বিপদ। মনের দুঃখে ভদ্রলোক হয়তো বাসে উঠেই বসে আছেন।

সত্যি!

কথাটা যে মিথ্যে, তা সেই মুহূর্তেই প্রমাণ হয়ে গেল। খানিকটা দূরে এক ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে ভদ্রলোককে দেখতে পাওয়া গেল। ঋতা বলল : চলুন না, ভদ্রলোক কী করছেন দেখে আসি।

আপনার দাদা বৌদি কোথায়?

শিবের মাথায় ফুল বেলপাতা দিচ্ছেন।

আপনি দেবেন না?

আপনি?

দু জনেই হাসলুম।

রামানন্দবাবু কাছে এসে পড়েছিলেন। বললেন : আপনারা হাসছেন যে?

আমি বললুম : আপনাকে দেখতে পেয়ে। অনেক ক্ষণ থেকে আমরা আপনাকে খুঁজছি।

ভদ্রলোকের চোখে আমি বিহ্বলতা দেখলুম, আমার কথা বিশ্বাস করতে বোধ হয় তাঁর কষ্ট হচ্ছিল।

ঋতা বলল : কী করছেন আপনি?

আমি!

আপনার কথাই তো জিজ্ঞেস করছি!

এর কাছে আমি পুরাণের গল্প শুনছিলুম। ছেলেমানুষ হলে কী হবে, জানে অনেক কথা। শুনবেন?

ঋতার উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি বললেন : এই স্থানের নাম ছিল একাম্রকানন। অদ্ভুত সুন্দর স্থান। এক দিন শিব

পার্বতীকে বললেন যে কাশীর চেয়ে একাম্রকানন তাঁর বেশি প্রিয়। পার্বতীর ভারি কৌতূহল হল। তিনি গোপিনী বেশে এই স্থান দেখতে এলেন। তাঁর রূপ দেখে কৃত্তি আর বাস নামে দুই দৈত্য মোহিত হল। এগিয়ে এসে তাঁকে বিয়ে করতে চাইল। পার্বতী বললেন, বেশ, আগে আমাকে কাঁধে চড়াও। দৈত্যদের মহা পুলক। দু জনে মিলে তাঁকে কাঁধে তুলে নিল। আর যায় কোথায়! দেবীর ভারে তারা ছাতু হয়ে গেল। কিন্তু পার্বতীর পেল তৃষ্ণা। তত ক্ষণে শিব এসে উপস্থিত হয়েছেন। জলের জন্যে তিনি যে সরোবর তৈরি করে দিলেন, তারই নাম বিন্দুসাগর। শিব সমস্ত নদী ও সরোবরকে আহ্বান করে বললেন, এক এক বিন্দু করে জল দাও। সবাই দিল বিন্দু বিন্দু জল। বিন্দু সরোবরে তাই সমস্ত তীর্থের জল, বিন্দু সরোবরে স্নান করে সমস্ত তীর্থ স্নানের পুণ্য হয়।

এই সরোবর কোথায়?

বালক বলল: খুব কাছে। মন্দির থেকে বেরিয়ে উত্তরের পথ ধরতে হবে। বাজারের ভেতর দিয়ে সেই রাস্তা বিন্দু সরোবরে পৌঁছেছে। পূব পারে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির।

আমাদের সহযাত্রীরা একে একে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। এবারে তাঁরা বাসে গিয়ে উঠবেন। সঙ্গে খাবার আছে সবার, নেই আমাদের দু জনের। আমাদের কোন হোটেলে গিয়ে পাত পাড়তে হবে। তা না হলে সারা দিন যাবে উপবাসে। বললুম: আমাকে ক্ষমা করবেন।

বলেই আমি মন্দিরের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়লুম। দেবতাকে না দেখে কি ফিরে যাওয়া যায়!

জানি না আমার কী হল। বেদনার মতো একটা বিচিত্র অনুভূতি আমার সমস্ত চেতনাকে অভিভূত করে দিল। মনে হল, আমার বিষয় বুদ্ধি কোন পবিত্র ধারায় স্নান করে রূপান্তরিত হচ্ছে। অনেক ক্ষণ আমি দেবতাকে দেখতে পাই নি। আরও অনেক

মন্দিরে আমার এমনি অবস্থা হয়েছে। ভাল করে বোঝবার আগেই আবার চেতনার জগতে ফিরে এসেছি। দেখেছি দেবতাকে।

আজও দেখলুম, শিবের লিঙ্গরাজ নাম সার্থক হয়েছে। এত বড় শিবলিঙ্গ আমি আগে কখনও দেখি নি। মাটি থেকে এক বিঘৎ উঁচু কিন্তু ব্যাস হবে পাঁচ হাতের বেশি। কালো পাথরের গৌরী পীঠ। কিন্তু এ সবই বাহিরের রূপ। আমার অন্তরে আজ অন্য সুর বাজছে। নত হয়ে আমি দেবতাকে প্রণাম করলুম।

উঠে দাঁড়িয়ে আমি আরও আশ্চর্য হলুম। ঋতার সঙ্গে রামানন্দবাবুও মন্দিরের ভিতরে এসেছেন। এক সঙ্গে প্রণাম করছেন দেবতাকে। আর সেই ব্রাহ্মণ বালক তাঁদের মন্ত্র পড়াচ্ছেন:

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং—

মন্দিরের বাহিরে বেরোতেই ঋতার বৌদি চেঁচিয়ে উঠলেন : কী দস্যি মেয়ে বাবা, খুঁজে খুঁজে পাণ্ডা বেচারা হয়রান হয়ে গেল !

কেন, আমি কি হারিয়ে গেছি ভেবেছ ?

ফিরতে হবে না বুঝি !

এঁরাও তো সব ফিরবেন !

এর পরে আর তর্ক চলে না। তাই নীরদবাবু বললেন : চল চল, গাড়িতে বসেই খেয়ে নেওয়া যাক।

ঋতা চলতে চলতে বলল : আপনারা কোথায় খাবেন ?

বললুম : চেষ্টা করে দেখি।

ঋতা তার বৌদির চোখের দিকে চেয়েই থেমে গেল। এক জন নয়, দু জন মানুষ। তিন জনের আহার্য থেকে দু জনকে ভাগ দিতে হলে কারও পেটই ভরবে না। তার চেয়ে নীরব থাকাই ভাল।

বেলা তখনও বেশি হয় নি। কিন্তু এই বাজার ছেড়ে বেরোলে খাবার জায়গা আর পাওয়া যাবে না। তাইতেই ভাবনা। মোড়ের কাছে পৌঁছে ঋতারা বাসের দিকে গেল। আমরা সোজা চললুম। এই রাস্তার শেষেই বিন্দু সরোবর। পথে হোটেলও পাওয়া গেল। আর একটু পরেই ভাত ডাল তরকারি পাওয়া যাবে। রামানন্দবাবুকে বললুম : চলুন না, একটু এগিয়ে বিন্দু সরোবর দেখে আসি।

ভাল বলেছেন।

বলে ভদ্রলোক আমার পাশে পাশে চললেন।

বেশি দূর হাঁটতে হল না। কয়েক পা এগিয়েই একেবারে সরোবরের তীরে পৌঁছে গেলুম। বিশাল সরোবর। পূর্ব পারের বাঁধানো ঘাটে অনেকে স্নান করছে। অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরও

দেখতে পেলুম। জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে ঐ মন্দির কৃষ্ণ বলরামের। একখানি শিলালিপিতে ভবদেব ভট্টের নাম আছে। ইনি বাঙলার রাজা হরি বর্মার সচিব ছিলেন। ধার্মিক সর্বশাস্ত্রবিৎ এই বাঙালী ব্রাহ্মণ শুধু মন্দিরটিই নির্মাণ করেন নি, বিন্দু সরোবরও তাঁর কীর্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। অনন্ত বাসুদেবের মন্দির যাঁরা ভুবনেশ্বরের প্রাচীনতম মন্দির বলেন, তাঁরা মনে করেন যে ভবদেব ভট্ট এটি নির্মাণ করেন নি, শুধু সংস্কার করেছিলেন। মন্দির গাত্রে যে শিলালিপি আছে, তাতে আছে ভবদেবের কুলপ্রশস্তি। রচনা করেছেন দার্শনিক কবি বাচস্পতি মিশ্র। তাঁর কাল দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ। তিনি ভবদেবের বন্ধুও ছিলেন। কাজেই এই মন্দিরের নির্মাণ কাল দশম শতাব্দী বললে তর্কের অবসান হয়।

রামানন্দবাবু বললেনঃ এইবারে ফেরা যাক। দেরি হলে আমাদের ফেলে হয়তো চলে যাবে।

সে ভয় যে ছিল না তা নয়, তবু আমি নির্ভয় হতে বললুম।

মুখে দুটো ভাত গুঁজে বাসে এসে বসতে আমাদের বেশি সময় লাগল না। অনেকেই তখন উঠে বসেছেন। যাঁরা ওঠেন নি, তাঁরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন। ড্রাইভার এসে উঠে বসতেই তাঁরাও উঠলেন।

মহান্তিকে আমি দেখতে পেলুম না। আমার পাশে তাঁর স্থানটা খালি ছিল। সামনের ভদ্রলোক বললেনঃ এবারে একটু পা ছড়িয়ে বসুন। ফাউ নেমে গেছে।

এই ফাউ কথাটার মানে পরে বুঝেছিলুম। যত জন নেবার কথা, তার চেয়ে এক জন বেশিই নিয়েছিল। তার টিকিট ছিল এই পর্যন্তই।

প্রথমেই আমরা সিদ্ধারণ্যে এলুম। একদা এখানে একটি

আম্রবন ছিল, আর ছিল সুস্বাদু জলের প্রস্রবণ। তাই দেখে কয়েক জন সিদ্ধ এসে বসবাস শুরু করেন। পাহাড় নেই, সমুদ্র নেই, নদীও নেই। তবু এই মনোরম স্থান মন্দির নির্মাণের উপযোগী বলে রাজাদের মনে হল। একে একে অনেক মন্দির নির্মিত হল—মুক্তেশ্বর কেদারেশ্বর সিদ্ধেশ্বর ও পরশুরামেশ্বর।

সিদ্ধারণ্যে আজ আম্রবন নেই, কোন অরণ্যই নেই। শুধু প্রস্রবণ আছে—কেদারগৌরী আর গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ড এখন একটি বাঁধানো সরোবর—ছেচল্লিশ হাত লম্বা আর চওড়ায় বিশ হাতেরও কম। অনেক মেয়ে পুরুষ ঘাটে স্নান করছে। কেদার-গৌরীর জলে যেমন নানা গুণ আছে, স্বাদও তেমনি সুন্দর।

মুক্তেশ্বর মন্দিরকে একটি খেলার মন্দির বলে মনে হল। লিঙ্গরাজ মন্দিরের বিশাল চূড়া তখনও মন থেকে মুছে যায় নি। তাইতেই বোধ হয় এই মন্দিরকে এত ছোট মনে হচ্ছিল। বড় জোর হাত চব্বিশেক উঁচু।

তোরণের নিচে দিয়ে ভিতরে ঢোকবার সময় ঋতা থমকে দাঁড়াল, বলল: খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

আমারও তাই মনে হয়েছিল। দুটি থামের উপর একটি অর্ধ বৃত্ত। অদ্ভুত তার কারুকার্য। কিন্তু কিছুই স্মরণ করতে পারলুম না।

একজন ব্রাহ্মণ আমাদের পেছু নিয়েছিল। সে বলল: রেলের টাইম টেবিলে দেখেছেন।

হবেও বা।

বাহিরটা দেখবার আগে আমরা মন্দিরের ভিতরে গেলুম। দেবতার দর্শনের পরে ব্রাহ্মণ আমাদের আরও কিছু দেখাল। বলল: অন্য কোথাও নেই এমন জিনিস দেখুন—গণেশের বাহন ইঁদুর, কার্তিকের বাহন ময়ূর আর কোলে শিশু নিয়ে সপ্ত মাতৃকা।

অষ্টম শতাব্দীর এই মন্দিরকে নাকি বালিপাথরের একটি

স্বপ্ন বলা হয়। বলতেই হবে। প্রতিদিনের জীবনে তো এমন সুন্দর জিনিস আমরা দেখি না, দেখি স্বপ্নে। সুন্দরের বর্ণনা করতে তাই স্বপ্নের সঙ্গে তুলনা করি। সে যুগের স্থপতিরা কবি ছিল, কবির মতো স্বপ্ন দেখত, আর সেই স্বপ্নকে শাশ্বত রূপ দিত পাথরে। আজ আমরা পাথর দেখে তাদের স্বপ্নকে আবিষ্কার করছি।

একে একে আমরা কেদারেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর মন্দির দেখলুম। এগুলি নাকি লিঙ্গরাজ মন্দিরের চেয়েও প্রাচীন। সব চেয়ে প্রাচীন বলে পরিচিত পরশুরামেশ্বরের মন্দির। শুধু এর শিল্প রীতি দেখে নয়, একখানা শিলালিপি থেকেই এই কথা প্রমাণ হয়েছে। মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি বলে নবগ্রহ শিলায় উল্লেখ আছে।

এক ভদ্রলোক বললেন: না, কেদারেশ্বর মন্দির নির্মিত হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এইটিই সব চেয়ে প্রাচীন।

পাশের সরোবর থেকে বাতাস আসছে অল্প অল্প। মনোরম আবহাওয়া। তবু রামানন্দবাবুর তর্কে প্রবৃত্তি হল। এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন: তার প্রমাণ আছে কিছু?

এ সবের আবার প্রমাণ কী! সে যুগের কেউ তো বেঁচে নেই যে জিজ্ঞেস করে সন তারিখ জানা যাবে!

রামানন্দবাবু বেশ বিস্মিত হলেন, বললেন: এ আবার কী কথা! বিনা প্রমাণে কি এ যুগে কোন কথা কেউ বিশ্বাস করে?

করবেন না।

সে তো একটা উত্তর হল না। পরশুরামেশ্বরের মন্দিরে যেমন অষ্টম শতাব্দীর শিলালিপি আছে। এ একটা প্রমাণ, মানতেই হবে। আপনি একটা কথা বলবেন, অথচ প্রমাণ দেবেন না আমরা মানি কী করে!

বলেছি তো, আপনি মানবেন না।

বললেই হল, এতগুলো মানুষকে ভুল বলবার আপনার কী অধিকার আছে?

দূর থেকে একটা মিষ্টি শব্দ পেলুম : নারদ নারদ!

এ যে ঋতার কণ্ঠস্বর, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে তার বৌদিরও গলার শব্দ পেলুম। ঋতাকে বকছেন।

খানিকটা এগিয়ে যেতেই ঋতার উত্তর শোনা গেল : পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র, তাই নিয়ে তর্ক হচ্ছে কিনা!

তাতে তোমার কী!

মন্দির দেখতে এসে কেউ ইতিহাস নিয়ে তর্ক করে!

ঋতার বৌদি থেমে না গেলে নূতন তর্ক শুরু হত।

কেদারেশ্বর মন্দিরে আমি দুর্গাকে দেখলুম। সিংহের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন অপরূপ মুখশ্রী আমি আর কোন মূর্তির দেখি নি। এক ব্রাহ্মণও সেই কথা বললেন : নারী মূর্তির এমন শ্রী ভুবনেশ্বরে আর নেই।

রামানন্দবাবুদের কলহ তখনও মেটে নি। বলছিলেন : ভুল বলেছেন আপনাকে স্বীকার করতে হবে।

আপনাকে তো বলি নি!

কাউকে ভুল বলার অধিকার আপনার নেই।

আমি কাউকেই বলি নি।

তবে নিজের মনে মনে কেন বললেন না?

আমার ইচ্ছে।

রামানন্দবাবু এবারে ফিরে দাঁড়ালেন। সেই ভদ্রলোকের মুখোমুখি হয়ে বললেন : ইচ্ছে বললেই হল!

ভয়ে ভয়ে ঋতা আমার কাছে এল। বলল : কী করছেন আপনি, সামলান আপনার বন্ধুকে।

হেসে বললুম : আপনার কথাই বেশি মানবেন।

না না, এগিয়ে যান।

বলে ঋতা আমাকে ঠেলে দিল। আমি একেবারে দু জনের মাঝে গিয়ে পড়লুম। রামানন্দবাবু এবারে আমাকে আক্রমণ

করলেন : দেখুন তো এই ভদ্রলোকের কাণ্ড, দোষ করেছি এ কথা স্বীকার করতে কত বায়নাক্কা।

বললুম : ভুল তো উনি বলেন নি। কোন পড়া কথা বলেছেন, কোথায় পড়েছেন তা এখন মনে করতে পারছেন না।

এ নিশ্চয়ই তাঁর মনগড়া কথা।

মনগড়া নয়, গভর্ণমেণ্টের গাইড বইএ এ কথা আছে। কেন আছে, তাও আপনাকে বলি।

সেই ভদ্রলোক পিছন থেকে বলে উঠলেন : বসুন বসুন, এই পাগলের পাল্লায় পড়ে মাথাটা আমার খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে।

রামানন্দবাবু ক্ষেপে উঠছিলেন। তাড়াতাড়ি আমি বললুম : পুরাণ পড়েছেন ?

না।

তবে আর জানবেন কী করে ? ব্রহ্ম পুরাণে এই কেদারেশ্বরের উল্লেখ আছে।

দেখলেন তো, বিদ্যার বড়াই অত ভাল নয়।

বলে সেই ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরালেন। আর রামানন্দবাবু বড় ম্রিয়মাণ মুখে উচ্চারণ করলেন : পুরাণে আছে! তা আগে বলতে হয়।

বিবাদ মিটে গেল। কিন্তু ঋতার কৌতুক বাড়ল তাতে। এক সময় আমাকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল : সত্যি সত্যিই কি এ সব কথা পুরাণে আছে, না আপনি তৈরি করে বললেন ?

কী মনে হয় আপনার ?

একেবারে তৈরি কথা।

ঝগড়া তো মিটেছে!

এইবারে ঋতা আরও আশ্চর্য হল : সত্যিই আপনি বানিয়ে বলেছেন ?

তাতে ক্ষতি হয়েছে কিছু ?

না। জিজ্ঞেস করছি এই জন্যে যে আপনার বিদ্যের তারিফ করব, না বুদ্ধির, তা বুঝতে পারছি না।

যদি দুটোরই করতে বলি তো অহংকারী ভাববেন না তো?

সহসা ঋতা এ কথার উত্তর খুঁজে পেল না।

বললুম: কেদারেশ্বর মন্দিরের দরজায় একটা শিলালিপি আছে দেখেছেন? ঐ ভাষা যারা পড়তে জানে তারা বলে, ঐ মন্দির চোড়গঙ্গের তৈরি, একাদশ শতাব্দীতে।

তবে তো রামানন্দবাবু ঠিকই বলেছেন।

তা সঠিক বলা যায় না। প্রাচীন মন্দিরের কিছু সংস্কার করে যে একখণ্ড পাথরে নিজের কীর্তির কথা লিখে রাখেন নি, তা কে বলতে পারে! তার চেয়ে আসুন, পরশুরামেশ্বরের মন্দিরটা ভাল করে দেখে যাই।

মুক্তেশ্বরের মন্দির থেকে শ চারেক হাত দূরে এই মন্দির। ভাল করে না দেখলে দুঃখ থাকবার কথা। মন্দিরের দেওয়ালে সমস্ত রামায়ণখানা চিত্রিত হয়ে আছে। মহাভারতেরও চিত্র আছে। কিরাত ও অর্জুন, শিব ও পার্বতী।

রাবণের কৈলাস উত্তোলনের দৃশ্য ঋতা অনেক ক্ষণ ধরে দেখল। পর্বতের নিচে রাবণ, উপরে হরপার্বতী। ইলোরার কৈলাস মন্দিরের কথা আমার সহসা মনে পড়ল। সেখানেও এই চিত্রটি দেখেছি। পুলকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। সেখানে ঋতা আমার পাশে ছিল না, ছিল স্বাতি। সে তার ক্যামেরা বার করে এই চিত্রের ছবি নিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি আমি সরে গেলুম। ঋতার পাশে দাঁড়াতে আমার ভয় হল। যে ভয়ে কলকাতা থেকে আমি পালিয়ে এলুম, সেই ভয় আমার উপরে ভর করছে। দূরে আমাদের বাস দেখা যাচ্ছিল। হনহন করে আমি সেই দিকে এগিয়ে গেলুম। ঋতা কী ভাবল, সে কথা ভাবতে আমার ইচ্ছা হল না।

একে একে সবাই এসে বাসে উঠলেন। নিজের নিজের জায়গায় বসলেন। ঋতা আমার সামনে দিয়ে যাবার সময় হেসে বলল ঃ অমন করে পালিয়ে এলেন কেন?

ততক্ষণে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছিলুম। বললুম ঃ রামানন্দবাবু রাগ করবেন ভয়ে।

উনি রাগ করবেন কেন?

রামানন্দবাবু বাসে উঠছিলেন। বললুম ঃ ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ঋতা কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করল না।

সবাই উঠেছি কিনা, পিছন ফিরে ড্রাইভার একবার দেখে নিল। তারপর রওনা হল উদয়গিরি খণ্ডগিরির দিকে।

রাজারাণী মন্দির আমরা ফেরার পথে দেখেছিলুম। সিদ্ধারণ্য থেকে এই মন্দির খুব দূরে নয়। ছ শো হাত পূর্বে। তবু কেন পরে দেখলুম, সে কথা ড্রাইভার জানে।

ভুবনেশ্বরে এই মন্দিরটিই নাকি সব চেয়ে সুন্দর। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ফার্গুসন সাহেব এই মন্দিরকে উড়িষ্যার শিল্পের একটি রত্ন বলেছেন। সত্যিই একটি রত্ন। ভিতরে আজ দেবতা নেই। প্রহরে প্রহরে পূজা হয় না এই মন্দিরে। তবু আসে অসংখ্য যাত্রী, সুন্দরের উপাসনায় আসে।

মন্দিরের নাম রাজারাণী কেন হল, তা জানতে পেলুম। যে হলদে বালিপাথরে এই মন্দির তৈরি, তারই নাম রাজরাণিয়া। এমন নাম সচরাচর দেখা যায় না। মন্দিরের নাম হয় দেবতার নামে। প্রতিষ্ঠাতার নামেও আজকাল মন্দিরের নাম হচ্ছে। পাথরের নামে মন্দিরের নাম এই প্রথম দেখলুম।

গভীর মনোযোগে রামানন্দবাবু কিছু খুঁজছিলেন। বললুম ঃ কী খুঁজছেন?

কোন শিলালিপি আছে কিনা দেখছি।

ভিতরে দেবতার মূর্তি নেই দেখেছেন?

তাই নাকি!

মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয় নি, না মুসলমানেরা ধ্বংস করেছে, জেনে নেবেন।

বলেন কী!

আমার অনুমানের কথা আপনাকে বলতে পারি। কোন দেবতার প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকলে, তাঁরই নামে মন্দিরের নাম হত। পাথরের নাম কেউ বলত না।

খাঁটি কথা। একটু দাঁড়ান, আমি টুকে নিই।

আপনি দাঁড়িয়ে টুকুন, আমি ঘুরে দেখি।

কয়েক পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালুম। এক ভদ্রলোক বলছিলেন: রাজা উদ্যতকেশরী তাঁর মায়ের জন্য ব্রহ্মেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। আর এই মন্দিরটি রাজা তাঁর রাণীর ইচ্ছাতে নির্মাণ করেন। সেই জন্যেই এই মন্দিরের নাম রাজারাণী।

ভাগ্য ভাল যে রামানন্দবাবুর কান এ দিকে ছিল না। থাকলে আমি বিপদে পড়তুম।

এত সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম বোধ হয় ভুবনেশ্বরে আর দেখি নি। লতা-পাতার যেমন সূক্ষ্ম কাজ, তেমনি মূর্তি। এক একটি অলসকন্যার দিকে অনেক ক্ষণ চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। নানা অলঙ্কারে সুসজ্জিতা কন্যা অলস ভাবে গাছে হেলান দিয়ে আছে। মাথার উপরে হাতের মুঠোয় এক থোকা পাতা। দেবদেবীর মূর্তি আছে। আছে অশ্লীল মূর্তিও। এক বার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিতে হয়। লজ্জা করে।

যত মন্দির আমরা দেখলুম, তার চেয়ে বেশি মন্দির আমাদের না দেখা রয়ে গেল। তীর্থেশ্বর কোটিতীর্থেশ্বর ব্রহ্মেশ্বর ভাস্করেশ্বর মেঘেশ্বর অলাবুকেশ্বর উত্তরেশ্বর সোমেশ্বর, আরও কত শত ঈশ্বর। দর্শন এখানে সংক্ষেপ করতেই হবে। ত্রিভুবনেশ্বর যে নিজেই এখানে সংক্ষেপে ভুবনেশ্বর হয়েছেন।

বাসে এক ভদ্রলোক লিঙ্গরাজের প্রাসাদের কথা বলছিলেন। শিবের প্রসাদ নির্মাল্য গ্রহণের নিয়ম নেই। শিবের ভোগে যা দেওয়া হবে, মানুষের ভোগে তা লাগবে না। এই নিয়মের ব্যতিক্রম শুধু জ্যোতির্লিঙ্গ। এখানেও ব্যতিক্রম আছে। লিঙ্গরাজকে বোধ হয় হরিহর বলে কল্পনা করা হয়। তাইতেই জগন্নাথের মতো প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা আছে। নিত্য অন্ন ভোগ হয়, চণ্ডালের স্পর্শেও এ ভোগ অপবিত্র হয় না।

রামানন্দবাবু তাঁর নোট বুকে কিছু টুকে নিচ্ছিলেন। প্রশ্ন করলুমঃ কী টুকছেন?

আমার উপর ভদ্রলোকের আর উষ্মা নেই। বললেনঃ এত কথা কি মনে রাখা যায়!

লিখলেও তো মনে থাকবে না।

লেখা তো থাকবে। দরকার হলে ব্যবহার করা যাবে।

আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ল। সে বলত, খাতার পাতায় লিখতে গেলে মনের পাতায় আর লেখা হয় না মন ভারি অভিমানী, খাতাকে সতীন ভাবে।

আমার নিজেরও তাই। মনের পাতায় লেখা কথা কোন দিন আমার ভুল হয় না।

নূতন রাজধানীর উপর দিয়ে আমরা উদয়গিরি খণ্ডগিরি যাচ্ছি।

১৬

রাজধানী এলাকাটি যেন নূতন একটি শহর। পুরনো শহর থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে এখন এই রকম হচ্ছে। শুধু রাজধানীর প্রয়োজনে নয়, বাসস্থানের প্রয়োজনেও। এ সমস্ত শহর মন্দ দেখায় না। এক ধারে পুরাতন ঘিঞ্জি বস্তি ধোঁয়ায় ও ধূলায় মলিন, অন্য ধারে প্রশস্ত রাজপথের দু পাশে একই রকমের সৌধশ্রেণী। বিশ্বকর্মা যেন এক রাত্রে একটি নগর নির্মাণ করেছেন।

আর এক রকমের শহর আছে, যেগুলি প্রয়োজন মতো বাড়ছে। যেখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গা সেইখানেই একটা বাড়ি উঠছে। একখানা অতি সেকেলে ভাঙা বাড়ির পাশে হাল আমলের শৌখিন সৌধ। যেন তাজমহলের বাগানের ভিতর আকাশছোঁয়া অট্টালিকা। সরকারের কানুন আছে, রুচির প্রশ্ন নেই। পয়সা দিয়ে রুচি কেনা যায় না। তাই এ যুগে সুরুচির এত অভাব।

রামানন্দবাবু উঁচু হয়ে বসে রাস্তার দু ধারটা ভাল করে দেখছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন: কী কাণ্ড করেছে দেখেছেন?

বললুম: না।

না কি মশাই, বসে বসে কী করছেন তা হলে!

উদয়গিরি যাচ্ছি।

সে তো বাস আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি কী করছেন?

আমি বাসে বসে আছি।

রামানন্দবাবু বিরক্ত ভাবে বললেন: সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

সামনে থেকে হাসি চাপার শব্দ আসছিল। এবারে সেই শব্দ স্পষ্ট হল। ঋতা হাসছে।

আমি বললুম: তবে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন?

রামানন্দবাবু বললেনঃ আপনার কাণ্ড দেখে সবাই হাসছে।

ঋতা নতুন করে আবার হেসে উঠল।

তার বৌদি বললেনঃ কী হচ্ছে!

ঋতা তখনই উত্তর দিলঃ এই বাড়িগুলো মন্ত্রীদের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে।

হাসির সঙ্গে মন্ত্রীর কোন যোগ নেই। তবু তার বৌদি বললেনঃ কেন?

দেখছ না, বাড়ির সামনে কেমন তিন রঙা পতাকা উড়ছে।

তাতে হাসবার কী হল?

দেশ স্বাধীন হয়ে কত সুখ হয়েছে বল। রাজার ছেলে না হয়ে রাজা হবার কথা আগে কেউ ভাবতে পারতো কি! আজকাল ঘুঁটে-কুড়োনির ছেলেও রাজা হতে পারে। আর মন্ত্রী তো—

খদ্দরধারী এক ভদ্রলোক মাথার গান্ধী টুপি খুলে হাওয়া খাচ্ছিলেন। তাঁর কঠিন দৃষ্টির দিকে চেয়ে ঋতা থেমে গেল। রামানন্দবাবু এতক্ষণ নিঃশব্দে ঋতার কথা শুনছিলেন। এইবারে সে থামতেই বললেনঃ আপনার চেহারাটি দেখছি মন্ত্রীর মতো।

প্রশ্ন করলুমঃ সেকালের, না একালের

সেকালের মন্ত্রী কি আর খদ্দর পরতেন! আমি একালের কথাই বলছি।

একালের মন্ত্রীর তো এক এক জনের এক এক রকম চেহারা। ঠিক কার মতো বলবেন কি?

রামানন্দবাবু আবার বিরক্ত হলেন, বললেনঃ আপনাকে নিয়ে তো ভারী বিপদ মশাই, বড় বেশি তর্ক করেন।

সামনে থেকে ঋতার হাসি আবার শোনা গেল।

রামানন্দবাবু বললেনঃ দেখছেন তো, আপনার কাণ্ড দেখে সবাই হাসছে কিনা!

আমার তো মনে হয়, আপনারই কাণ্ড দেখে সবাই হাঁসছেন।

আমার কাণ্ড!

রামানন্দবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

হেসে বললুম: আমারই তো হাসি পাচ্ছে।

ভদ্রলোক নিজের দিকে দেখে বললেন: আমাকে দেখে হাসি পাচ্ছে!

আপনাকে দেখে নয়, আপনার কাণ্ড দেখে। আপনার কথা শুনেও।

ভদ্রলোক যেন মর্মাহত হলেন। তাই দেখে আমারই দুঃখ হল। বললুম: আপনি নিতান্ত ভাল মানুষ।

কেন?

কেন বুঝতে পারছেন না?

না।

সকলের শ্রবণ বাঁচিয়ে বললুম: আমাদের দেখে কেউ হাসে নি। ঐ মেয়েটার নিজেরই মাথা খারাপ, তাই থেকে থেকে হাসছে।

ভদ্রলোক খুবই বিস্মিত হলেন, বললেন: সত্যি নাকি?

দেখছেন না, ওর বৌদি কী রকম সামলাচ্ছেন ওকে!

খানিকক্ষণ ভেবে ভদ্রলোক সমর্থন করলেন আমাকে, বললেন: আমারও তাই মনে হচ্ছিল।

হেসে বললুম: তবেই দেখুন।

উৎসাহিত হয়ে ভদ্রলোক বললেন: আপনাকে যখন দাঁড়কাক বলেছেন, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছে। দাঁড়কাকের সঙ্গে কি মানুষের তুলনা হয়, তাও আবার আপনার সঙ্গে!

নিজের দিকে আর এক বার তাকিয়ে বললেন: আমাকে বললে তবু একটা কথা ছিল।

আপনাকেই বা কেন বলবে?

তাও বলা উচিত নয়।

তা হলেই বুঝুন

চিন্তিত ভাবে রামানন্দবাবু বললেন: মেয়েদের চরিত্র বড় বিচিত্র, তাই না?

সত্যি!

ভদ্রলোক নিজের চারি ধারে এক বার দেখলেন, গলাটা আরও নামালেন, তারপর উত্তর দিলেন: হাড়ে হাড়ে তা বুঝতে পারছি মশাই, কী আর বলব আপনাকে।

আপনি বুঝি বিবাহিত?

তা হলে আর ল্যাটা ছিল কি!

তবে আমার মতো নির্বিকার থাকলেই পারেন।

ভদ্রলোক মুখ ভেংচে বললেন: বেশ উপদেশ দিয়েছেন। একেবারে শেয়ালের যুক্তি।

কী রকম?

সেই আঙুরের থোকার গল্প হল যে! খেতে পাচ্ছি নে বলে টক ভাবব!

আপনি তো চেখে দেখেছেন বললেন!

ভদ্রলোক রুখে উঠলেন: মুখ সামলে কথা বলবেন বলছি।

কী বিপদ!

নিজেই তো বিপদ ডাকছেন! মেয়েমানুষ চেখে দেখবার কথা আমি আপনাকে বলেছি!

না।

তবে?

আপনিই তো মন্তব্য করলেন, মেয়েদের চরিত্র বড় বিচিত্র। সে কি না দেখেই, না উপন্যাস পড়ে?

এ একটা সভ্য মন্তব্য। আর চেখে দেখার মধ্যে একটা অসভ্য ইঙ্গিত আছে।

কী বিপদ! আমি তো আপনাকে আঙুর চাখার কথা বলেছি!

ভদ্রলোক এক মুহূর্তে জল হয়ে গেলেন, বললেন: তাই বলুন।

সামনে থেকে ঋতার হাসি আবার শোনা গেল। বিব্রত ভাবে রামানন্দবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললুম: আপনিও হাসুন না।

ভদ্রলোক চুপি চুপি বললেন: আমাদের কথা বোধ হয় শুনতে পেয়েছে।

তা পাক না।

ছি ছি, কী লজ্জার কথা!

লজ্জা কিসের?

মেয়েদের চরিত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম।

আমি তো করি নি, করেছেন আপনি।

ভদ্রলোক ফোঁস করে উঠলেন: আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই!

আমি আবার কী করলাম?

অকারণে আমাকে এর মধ্যে জড়ালেন।

অকারণে নয়, আপনি নিজেই এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ছেন।

আমি!

আপনি ছাড়া আর কে দায়ী বলুন। বাস শুদ্ধ সবাই চলেছে নিঃশব্দে। কেউ ভেতরে বসে ঢুলছে, কেউ দেখছে বাইরেটা। আর আপনি আমার সঙ্গে মেয়েদের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে চাইছেন।

ভদ্রলোক আবার রুখে উঠলেন, বললেন: মুখ সামলে কথা বলবেন।

তা হলে কথাই বলবেন না।

বেশ বলেছেন, আপনি আমাকে যা-তা বলবেন, আর আমি মুখ বুজে সহ্য করব!

বেশ, আমি আর কিছুই বলব না।

আমার ওপর দোষ চাপিয়ে নিজে এখন চুপ করবেন বৈকি।

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না। কিন্তু রামানন্দবাবু নিষ্কৃতি দিলেন না। বললেন: কী, কথা কইছেন না যে?

আমি নিরুত্তর।

রামানন্দবাবু বললেন: চালাকি চলবে না।

সশব্দে ঋতা হেসে উঠল।

বিব্রত বোধ করলেন রামানন্দবাবু।

ঋতার বৌদি বললেন: কী ছেলেমানুষি হচ্ছে!

ঋতা বলল: ছাতারে পাখির ঝগড়া দেখলে না?

আঃ!

মনে নেই, আমাদের বাগানে সেই ঝগড়ার কথা? আমার বেশ লাগে।

রামানন্দবাবু করুণ ভাবে আমার চোখের দিকে তাকালেন। তার পরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

নূতন রাজধানী কখন আমরা ছেড়ে গেছি খেয়াল করি নি। শহর শেষ হয়ে গেছে। এখন আমরা অরণ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। দু পাশের গাছ ক্রমে গভীর হবে, পথ উঠবে উপরের দিকে। পর্বতের পাদদেশে এসে আমাদের বাস স্থির হবে। তার আর বিলম্ব নেই। মনে মনে আমরা পাহাড়ে উঠবার জন্য তৈরি হলুম।

রামানন্দবাবুকে বড় কঠিন দেখাচ্ছে।

১৭

ভুবনেশ্বরের নূতন রাজধানী থেকে উদয়গিরি খণ্ডগিরির দূরত্ব হবে তিন মাইল। এই তিন মাইল পথ কলহ করেই কেটেছে। এবারে একটু আরামের আশায় অন্য দিকে মুখ ফেরালুম।

আমাদের বাস এসে দুই পাহাড়ের মাঝে একটি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল। বামে খণ্ডগিরি, দক্ষিণে উদয়গিরি। বাস থেকে নেমে দেখলুম, উদয়গিরির উচ্চতা তত বেশি নয়। কে এক জন বলল, এক শো দশ ফুট মাত্র উঁচু। সামনে দাঁড়িয়ে তার চেয়েও কম মনে হচ্ছে। অপর প্রান্তে খণ্ডগিরি খাড়া উঠেছে। তার উপরে একটা জায়গা থেকে নাকি ভুবনেশ্বরের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। বাসের অনেক আরোহী সেই দিকে এগিয়ে গেল।

আমি রামানন্দবাবুকে দেখছিলুম। তিনি যে দিকে যাবেন, তার উল্টো দিকে আমাকে যেতে হবে। এক দিকে গেলেই আবার বিপদ বাধবে।

রামানন্দবাবু যে ঋতাকে লক্ষ্য করছিলেন, তা দেখে ফেললুম।

ঋতারা যেই খণ্ডগিরির দিকে পা বাড়াল, তিনিও অমনি তাদের সঙ্গে চললেন। নিশ্চিন্ত মনে আমি এগোলুম উদয়গিরির দিকে।

সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠে স্বর্গপুরী গুহা। উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পকর্ম নেই, কিছু তরুলতা ও একটি হাতিকে বড় জীবন্ত মনে হল।

খানিকটা এগিয়ে রাণীগুম্ফা। রাণী কা নৌর, মানে রাণীর প্রাসাদ। একটি দোতলা বাড়ি। জানা গেল যে দ্বিতীয় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জৈন রাজা খরবেলা তাঁর রাণীর জন্য এটি নির্মাণ করেছেন। দেওয়ালে কিছু কারুকার্য আছে। এক স্থানে একটি রাজারাণীর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখলুম। কিন্তু সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম কোথাও নেই।

পাহাড়ের উপর অনেকটা উঠে গণেশ গুম্ফা। দুটি ঘর ও একটি বারান্দাওয়ালা একতলা গুহা। স্তম্ভ গাত্রে অসংখ্য নারী-

মূর্তি, আর সিঁড়ির ধাপে নতজানু হাতি। দেওয়ালেও বিচিত্র কারুকার্য। এই উন্নতি দেখে গুহাটিকে রাণীগুম্ফার পরবর্তী কালের বলে মনে হবে। জয় বিজয় গুহার মাঝখানে একটি বোধিবৃক্ষ আছে, আর একটি গুহার নাম বৈকুণ্ঠ গুহা। এ সব সমসমায়িক।

হাতি গুহায় একটি অবিস্মরণীয় শিলালিপি আছে। রাজা খরবেলার জীবনচরিত। মাত্র পনের বৎসর বয়সে খরবেলা সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হয়েছিলেন—অর্থ, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে যুবরাজ ও তার কিছু পরেই রাজা হন। রাজত্ব লাভের পরেই তিনি রাজ্য জয়ে বাহির হন। উত্তর পশ্চিম ও সুদূর দক্ষিণে তিনি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। প্রজাদের মঙ্গলের চিন্তা তাঁর বেশি ছিল। তাই রাজ্য জয়ের চেয়ে প্রজার উপকার তিনি বেশি করেছিলেন। তিন শো বছর আগে যে সব খাল কাটা হয়েছিল, সেগুলোর তিনি উন্নতি সাধন করেন। প্রচুর জলাশয় খনন করেন। উদ্যানও প্রতিষ্ঠা করেন অনেক। রাজা খরবেলার তের বৎসরের রাজত্ব কাহিনী এই শিলালিপিতে বর্ণিত হয়েছে। তার পরের কোন ঘটনা জানা যায় না। জানবার উপায়ও নেই।

জন কয়েক সরকারী কর্মচারীকে এক জায়গায় দেখতে পেলুম। টেবিল চেয়ারে বসে তাঁরা কিছু কাজ করছিলেন। কাছে গিয়ে দেখলুম, তাঁরা এই সব গুহার নক্সা তৈরি করছেন। হয়তো কোন পুস্তিকা প্রকাশিত হবে, কিংবা এই সব রক্ষণাবেক্ষণের কোন সুবন্দোবস্ত হবে। প্রাচীন কীর্তির প্রতি সরকারের দৃষ্টি ক্রমবর্ধমান, তার পরিচয় আমরা নানা স্থানে পেয়েছি।

আমি এক জনকে জিজ্ঞাসা করলুম: এই রকম গুহা আরও কত দূর পর্যন্ত আছে?

তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন: এগিয়ে যান।

হাতে সময় থাকলে এগিয়েই যেতুম, আপনাকে কষ্ট দিতুম না।

তবে ফিরে যান।

অত্যন্ত সদুপদেশ তাতে সন্দেহ নেই। আপনি কি সরকারী কর্মচারী?

কেন?

সাধারণের কাছে এমন উত্তর পাওয়া যায় না। ধন্যবাদ।

আপনি কি আমাদের উপহাস করছেন?

না না, সে দুঃসাহস আমার নেই।

নক্সার উপর থেকে চোখ তুলে অন্য ভদ্রলোক বললেন: কী হয়েছে?

আমাদের সঙ্গী যাত্রীদের দু এক জন আমার মতোই অপেক্ষা করছিলেন। এখন পর্যন্ত মুগ্ধ হবার মতো চোখে কিছুই পড়ে নি। অথচ সেই আশাতেই আমরা এত দূর এসেছি। আমার মতো তাঁদেরও সেই একই কৌতূহল—আরও এগোলে শ্রম সার্থক হবে কিনা। যত দূর এসেছি, ফিরতেও সময় লাগবে। তার পরে আছে খণ্ডগিরির পাহাড়, সেও পরিশ্রম সাপেক্ষ। এই সব ভেবেই বোধ হয় এক জন উত্তর দিলেন: সামনে আরও কিছু দেখবার আছে কিনা জানতে চাইছি।

এ ভদ্রলোকের অন্য রকম মেজাজ। বললেন: আছে বৈকি। এই পথই বনের ভেতর দিয়ে খণ্ডগিরি পৌঁছেছে। পথের ধারে সবশুদ্ধ গোটা তিরিশেক গুহা দেখতে পাবেন। এগিয়ে যান না, একেবারে খণ্ডগিরি পাহাড় হয়ে নামবেন।

কত সময় লাগবে?

ঠিক বলতে পারি নে, তবে ঘণ্টা খানেক বোধ হয় লাগবে।

ঘণ্টা খানেক!

আর এক জন যাত্রী বললেন: বাস কি ততক্ষণ দাঁড়াবে?

একজন বললেন: দাঁড়াবে না।

আর একজন বললেন: কেন দাঁড়াবে না! ভাড়া দিইনি কি আমরা!

আমি এই বিতর্কে যোগ না দিয়ে ফেরাই শ্রেয় মনে করলুম।

খানিকক্ষণ চলবার পরে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, সবাই আমাকেই অনুসরণ করছেন।

এমনিই হয়। দলের যে মানুষ এগিয়ে চলে, বাকি সবাই তাকে অনুসরণ করে। কতকটা অন্ধ ভাবেই অনুসরণ করে। এগিয়ে চলতে সাহসের দরকার, দরকার শ্রম ও চিন্তার। সাধারণ মানুষের নেই চিন্তার সময়, নেই সাহসের সঞ্চয়। শ্রমে বিমুখ তারা। তাই একজনকে অনুসরণের প্রবৃত্তি প্রবল হয়। সামনের মানুষকে দেখে নিজের কর্তব্য স্থির করা খুবই সহজ হয়।

বাসের সেই ভদ্রলোককে আমি দেখতে পেলুম না, মহান্তির সঙ্গে যিনি তর্ক করেছিলেন তাঁকে। আমার উপরেও অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি আমাকে মহম্মদের গল্প শোনাতে চেয়েছিলেন। আমি ঋতার সঙ্গে বাজে গল্প জুড়ে তাঁকে নিরাশ করেছি। হয়তো তিনি অপমান বোধও করেছেন। কিন্তু আমি তাঁকে অপমান করতে চাই নি। মানুষকে অপমান করে আমি আনন্দ পাই না। আমি তাঁকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলুম। এই সময় তিনি কাছে থাকলে আমি তাঁকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতুম। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির পৌরাণিক কথা, প্রাগৈতিহাসিক কথা। খরবেলার কাল তো খ্রীষ্টের জন্মের দু শো বছর আগে। ভারতে তখন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসার হচ্ছে। এই যুগটাকে আমাদের চোখের সামনে কেউ ধরে দেন নি।

উঁচু নিচু পথের উপর দিয়ে আমরা ফিরে আসছিলুম। দৃষ্টি ছিল পথের উপর, কিন্তু মন গিয়েছিল অতীতের উদ্ধারে। বর্তমান পৃথিবীর ইতিহাস শুরু হয়েছে যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন থেকে। তার আগের কোন ইতিহাস পাশ্চাত্যে নেই। প্লুটো মেগাস্থিনিস প্রভৃতি জন কয়েক পণ্ডিত ও দেশে না জন্মালে তার আগের ইতিহাস সবাই অস্বীকার করত।

ভারতের নিজস্ব ইতিহাস কত সহস্র বৎসরের আজও তার

হিসাব হয় নি। নিজেদের লিখিত ইতিহাস নিজেরাই আমরা অস্বীকার করছি। পৃথিবীর লোকে তো করবেই। রাম অযোধ্যায় রাজত্ব করেন নি, কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হয় নি কুরুক্ষেত্রে, রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের মহাকাব্য, ইতিহাস নয়—এই তো এ যুগের সভ্য ভারতীয়ের মন্তব্য।

এ কথা অনেক বার ভেবেছি, বলেছিও অনেক বার। থাক এই পুরনো কথা।

হিউ এন চাঙের ভারত ভ্রমণের কথা মনে পড়ল। তিনিও এসেছিলেন, তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পুষ্পগিরি নামে সংঘারামের উল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন যে এই সংঘারামটি উদয়গিরির উপরে কিংবা নিকটেই কোনখানে ছিল। খরবেলা জৈন রাজা ছিলেন। কিন্তু এই গুহাগুলিতে নাকি বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুর বাস ছিল। দেশ দেশান্তর থেকে বৌদ্ধ শ্রমণেরা এখানে আসতেন। বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা হত এই সব সংঘারামে। তার পর যুগের পরিবর্তন হল। পরিত্যক্ত হল এই সব নির্জন গুহা। মানুষের বাসস্থান হল বন্য শ্বাপদের আবাস। এখন অরণ্যে অগ্রসর হতে গা ছমছম করে। আমরা পিছিয়ে এসেছি।

এক জন বলছিলেন : বৌদ্ধ নয়, এগুলি জৈন গুহা।

প্রমাণ কী ?

ভদ্রলোক বোধ হয় পরিচয়-ফলক থেকে কিছু টুকে নিয়েছিলেন। পকেট থেকে নোট বুক বার করে বললেন : এক নম্বর গুহা হল ছোট হাতি গুম্ফা। দ্বিতীয় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের। Cell for a Jain monk.

আমি যেন প্রথম গুহার নাম শুনেছিলুম স্বর্গপুরী গুহা।

দ্বিতীয় গুহার স্থানীয় নাম অলকাপুরী গুহা। এই দুটোকে বোধ হয় স্বর্গপুরী বলে।

এঁদের কাছে একটি নূতন নাম শোনা গেল। শালভঞ্জিকা।

সাঁচীর মতো নারী মূর্তি। দেহ বল্লরী জড়িয়ে পেলব লতা।

এঁরা এই গুহায় আরও একটি মূর্তি দেখালেন। এক জন নারী একটি টিয়ে পাখিকে আদর করছে। এ রকম মূর্তি নাকি অমরাবতীতেও আছে।

যাবার সময় এ সব আমি দেখতে পাই নি, দেখলুম ফেরার সময়। তাও অন্য লোক দেখিয়ে দিল। পৃথিবীতে অনেক জিনিসই আমাদের চোখে পড়ে না। হয়তো বেশির ভাগ জিনিসই আমরা দেখতে পাই নে। দেখবার চোখ সকলের এক রকম নয়। এক এক জন এক এক রকম দেখে। কেউ বেশি, কেউ কম। অন্ধ না হয়েও অনেকে কিছুই দেখতে পায় না, অন্যে দেখিয়ে দিলে তবে দেখে। আমরা যে কত জিনিস দেখতে পাই নে, তা আমরা নিজেরাই জানি না।

গুহা থেকে নেমে এসে আমি খণ্ডগিরির দিকে তাকালুম। সেখান থেকে সবাই নেমে আসছেন। সবাইকে চিনতে পারছি না। শুধু রামানন্দবাবুকে চিনলুম। তিনি প্রায় নিচে নেমে এসেছিলেন।

আশা করেছিলুম, ঋতাকে কাছে দেখতে পাব। কিন্তু তা পেলুম না। হয়তো পিছনে আছে, কিংবা আড়ালে। রামানন্দবাবু খুব তাড়াতাড়ি আসছেন।

পাশ দিয়ে যাবার সময় জিজ্ঞাসা করলুম : তারা কোথায়?

জানি নে।

ফোঁস করে রামানন্দবাবুর একটা নিঃশ্বাস পড়ল।

আরও খানিকটা উপরে উঠে ঋতার দাদা বৌদির সাক্ষাৎ পেলুম। তাঁরাও নামছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : ঋতাকে দেখেছেন?

না তো!

নীরদবাবু ব্যস্ত হলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন : ভয় নেই, অত বড় বোন তোমার হারিয়ে যাবে না।

রামানন্দবাবু কি তা হলে ঋতাকে খুঁজছেন?

ঋতা এখানে হারিয়ে যাবে না। গড়িয়ে পড়বারও কোন ভয় নেই। তেনজিঙের মতো আমরা হিমালয় জয়ে উঠছি না। বাঁধানো ধাপে ধাপে কয়েক তলা বাড়ির মাথায় উঠছি। একটু উঁচু ধাপ, তাড়াতাড়ি উঠতে দেহ সামান্য টলমল করে। ওই পর্যন্তই। আর কোন বিপদের কথা মনে আসে না।

আমার সঙ্গে উদয়গিরির দিকে ঋতা যায় নি। যত দূর মনে পড়ে, তাকে এই পাহাড়েই উঠতে দেখেছিলুম। হয়তো কোথাও বিশ্রাম নিচ্ছে, কিংবা—না না, আত্মগোপন করে কেন থাকবে। রামানন্দবাবুর ভয়ে! ভয় পাবার মতো লাজুক মেয়ে সে নয়। তবে কি—না না, আমার অপেক্ষায় লুকিয়ে আছে, এমন দুঃসাহসের কথা আমি ভাবব না। নিজের অজ্ঞাতসারে আমি তাড়াতাড়ি উপরে উঠছিলুম। হঠাৎ থেমে পড়লুম। বাঁ হাতে একটা গুহার সন্ধান পেয়েছি।

বাহিরে এক জন ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন: চরণামৃত।

চরণামৃত তাঁর হাতে ছিল। আমাকে হাত পেতে নিতে হবে। বললুম: এখানেও চরণামৃত!

ততক্ষণে ব্রাহ্মণ আমার হাতে চরণামৃত দিয়েছেন। হাত পেতেই আমি নিয়েছিলুম। তারপর সেই জলটুকু পান করে কয়েকটি পয়সা দিলুম ব্রাহ্মণের হাতে। সেই সঙ্গেই নির্ঝরের কলধ্বনি শুনলুম। উচ্ছল আনন্দে ঋতা হেসে উঠেছে।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: ব্যাপার কী?

ঋতা বলল: ভারি ভক্তি যে!

গুহার ভিতর থেকে সে এগিয়ে এল।

বললুম: কোথায় লুকিয়ে ছিলেন এত ক্ষণ?

কে বললে লুকিয়েছিলাম ?

রামানন্দবাবু হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে !

তিনি আপনাকে খুঁজছেন।

না। আমার আর মুখদর্শন করবেন না বলে রায় দিয়েছেন।

আর কিছু বলেন নি ?

আপনি কেন লুকিয়েছিলেন, তাই বলুন।

লুকোব কেন ! এই গুহার ভেতর গবেষণা করছিলাম।

কিসের গবেষণা ?

ঋতা বলল : তবে আসুন ভেতরে।

গুহার ভেতরে এসে বললুম : বলুন এবারে।

এরা এই গুহার নাম বলছে অনন্ত গুহা। অনন্ত শব্দটা জাতিতে হিন্দু। অনন্ত শয়ন, অনন্ত—

বুঝেছি।

এই গুহাগুলি নাকি রাজা খরবেলার তৈরি। তিনি জৈন ছিলেন। কাজেই—

এ কথাও বুঝেছি।

এইবারে দেওয়ালের গায়ে দেখুন। বুদ্ধের মূর্তি।

তার মানে গুহা জৈন নয়, বৌদ্ধ।

আর এই ব্রাহ্মণ তেল সিঁদুর ফুল চন্দন দিয়ে হিন্দু দেবদেবীর পুজো করছেন।

সে নিজের পেটের জন্যে, দেবতার জন্যে নয়। চলুন নিচে।

নিচে কেন ?

আপনার দাদা বৌদি ব্যস্ত হয়েছেন।

তাঁদের চেয়ে তো আপনি বেশি ব্যস্ত হয়েছেন দেখছি। ওপরটা দেখব না ? ওপর থেকে ভুবনেশ্বরের দৃশ্য ?

আমি জানি আমার আপত্তি টিকবে না। তাই একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেললুম।

উপরে উঠতে উঠতে ঋতা বলল: বড় বিপদে পড়েছেন মনে হচ্ছে।

তা একটু পড়েছি বৈকি।

বিপদ কিসের?

এখন দেখতে পাচ্ছি যে কথাটা মিথ্যে নয়। যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়।

আমি কি বাঘ?

বাঘ বললে ব্যাকরণের ভুল হবে।

ঋতার দৃষ্টিতে আমি ভৎ‍র্সনা নয়, কৌতুকও দেখলুম।

খণ্ডগিরি পাহাড়ে যাঁরা উঠেছিলেন, তাঁরা সবাই নেমে গেছেন। এবারে গিয়ে উদয়গিরিতে উঠলেন। আমরা যে কজন উদয়গিরিতে প্রথম উঠেছি, সেই কজনই এখন খণ্ডগিরিতে উঠছি। আমাদের সঙ্গে আর কেউ নেই। মনে হল, তাঁরা অনেক নিচে আছেন। ধীরে ধীরে উঠছেন। বললুম: অকারণে দেরি করে উদয়গিরি দেখবার আর সময় পাবেন না।

কে বললে আমি অকারণে দেরি করেছি?

দুঃখিত। আপনি যে গবেষণা করছিলেন, সে কথা আমার মনে ছিল না।

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঋতা বলল: সাবধান, এমন ভুল যেন আর না হয়।

হবে না।

ঋতা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

এই হাসিকে আমি বড় ভয় পাই। বুকের ভিতরটা আমার কেঁপে উঠল। আমার অতীত তো আমি ভুলে যাই নি। ভুলতে পারি নে। ভুলে যাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি বিশ্রী ভাবে। এই হাসি দেখে নিজেকে হারালে আমার চলবে না।

ঋতা বলল: হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গেলেন যে?

রামানন্দবাবুর কাছে আমি অপরাধ করছি।

কেন?

আপনার জন্যেই ও ভদ্রলোক এ দিকে এসেছিলেন। আর আপনি তাঁকে ফাঁকি দিলেন।

তাতে আপনার অপরাধ কি?

আপনি আমার জন্যেই তো তাঁকে ফাঁকি দিলেন!

আপনার জন্যে!

ঋতা সহসা ফিরে দাঁড়াল। তার দু চোখের দৃষ্টি যেন জ্বলছে।

বললুম: ক্ষমা করবেন, আপনাকে আমি অপমান করতে চাই নি।

ঋতার উজ্জ্বল দৃষ্টি নিমেষে নিবে গেল। কোন কথা কইল না।

এক সময় আমরা পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছে গেলুম। খানিকটা খোলা প্রশস্ত স্থান। মন্দির পার্শ্বনাথের। চারি দিক ঘিরে নিচু দেওয়াল। দর্শকরা স্বচ্ছন্দে এর উপর বসে নিচের দৃশ্য দেখতে পারে। ঋতা বলল: আসুন, এই দেওয়ালের ওপর কিছুক্ষণ বসি।

উত্তর না দিয়ে তার আদেশ পালন করলুম। ঋতাও বসল।

যেখানে আমরা বসেছিলুম ঠিক তার সামনেই উদয়গিরি। স্বর্গপুরী গুহা যেন দেখতে পাচ্ছি। অন্য গুহাগুলি পাহাড়ের অপর অংশে। এ ধার থেকে তা দেখা যায় না। তার পর পাহাড় শেষ হয়ে প্রান্তর। প্রান্তরের শেষে ভুবনেশ্বর শহর। নূতন রাজধানী আর অগণিত মন্দির। নিকটে কোন স্থানীয় লোক থাকলে সবই আমাদের চিনিয়ে দিতে পারত।

ঋতা বলল: উদয়গিরি আমার এখান থেকেই দেখা হল।

বললুম: আমি দেখেছিলুম কলকাতা থেকে।

কী করে?

খবরের কাগজে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলুম—দেখে এলাম

উদয়গিরি। কয়েকখানা ছবিও ছাপা হয়েছিল। বাকিটুকু মনসা দেখলুম।

মনসা মানে?

সংস্কৃত ব্যাকরণ বুঝি পড়েন নি?

মনে নেই।

মনসা হিমালয়ং গচ্ছতি, মনসা মথুরাং গচ্ছতি, এ সব কিসের উদাহরণ আমার মনে নেই। তবে এটি আমার বড় প্রিয় কথা। সুবিধা পেলেই ব্যবহার করি।

ঋতা বলল: বুঝেছি। মনে মনে ঘুরে বেড়াতে আপনি ভালবাসেন।

তাতে সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এই যে দেশ দেখার কাজে পয়সা বা কোন কিছু প্রতিবন্ধক হয় না। কল্পনাতেই সব দেখা হয়ে যায়। কল্প ভ্রমণ।

তা না হলে কি—

শুধু আমার নয়, ভারতের লক্ষ কোটি মানুষের দেশ দেখা হয় না পয়সার জন্যে।

ঋতা প্রতিবাদ করে বলল: আমার তা মনে হয় না। ভ্রমণ একটা শখের ব্যাপার। নেশা থাকলে ঘর ছেড়ে বেরোবেই।

পয়সার অভাবেই লোকে মনসা দেখে, আনন্দ পায় কল্প ভ্রমণে।

পয়সার অভাব একটা অজুহাত। আসলে পয়সার জন্যে কিছুই আটকায় না।

এটা পয়সাওয়ালা লোকের কথা। যাদের পয়সা নেই, তাদের সবই আটকায় পয়সার জন্যে। পথের ধারে গাছের তলার জীবনটাও আটকে যায়।

ঋতা বলল: এ সব বইএর কথা। আর—

রাজনৈতিক দলের কথা।

ঠিক বলেছেন।

ঠিক বলি নি। যারা চোখ মেলে চলে, তারা সবাই সত্যটা দেখে। স্বীকার করে না সবাই। রাজনীতি সত্যকে আংশিক ভাবে স্বীকার করে। পুরোপুরি স্বীকার করলে দেশে দেশে বিদ্বেষ ছড়াত না। সত্য যে সব দেশেই প্রায় একই রকম।

ঋতা এ আলোচনায় যোগ দিল না। শুধু গভীর ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি দেখলুম, এতক্ষণে আরও কয়েকজন একে একে উপরে উঠে এলেন। আমাদের পাশাপাশি দেখে তাঁরা কী ভাবলেন, তাঁরাই জানেন। এগিয়ে গেলেন মন্দিরের দিকে। ঋতা বলল: আমার একটা কথার উত্তর দেবেন?

এ ঠিক আপনার মতো কথা হল না।

প্রশ্নটাও ঠিক আমার মতো নয়।

সরাসরি জিজ্ঞাসা করুন, ভূমিকায় আমি ভয় পাই।

আপনার ক্ষতটা আপনি কেন ঢেকে বেড়াচ্ছেন?

আমি চমকে উঠলুম: কে বলল আমার ক্ষত আছে?

বুকের কাছটা যে রক্তে ভিজে গেছে!

আমি জানি, এ ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হয় না। তবু আমার দৃষ্টি চকিতে বুকের উপর পড়ল। রক্ত কেন, কোন রঙই নেই গায়ের জামায়।

মুখ তুলতেই ঋতা হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল: আমার কাছে আপনি কিছুই লুকোতে পারবেন না।

লুকোবার নেই যে কিছু।

এ নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করব না। নিজের ধারণার কথা আপনাকে জানিয়ে রাখলুম।

ধন্যবাদ।

যাঁরা মন্দির দেখছিলেন, তাঁরা পার্শ্বনাথের মূর্তি দেখে অন্য ধারে সরে গেলেন। এঁদের পিছনে নামলেও আমাদের চলবে। অন্য

দল এতক্ষণে উদয়গিরির গুহা দেখা শেষ করেন নি। তাড়াতাড়ি ফিরে এলেও বাসে তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে। সবাইকে না নিয়ে বাস ছাড়বে না। দ্রষ্টব্য স্থান আর আমাদের বেশি নেই। ধৌলির পাহাড় হয়ে ভুবনেশ্বরে ফিরব। রাজারাণীর মন্দির দেখব পথে। তার পর সোজা রাস্তায় পুরী। সন্ধ্যার আগেই যে আমরা পৌঁছে যাব, তাতে সন্দেহ নেই।

বলার কথা আমি খুঁজে পাচ্ছিলুম না। ঋতাও চুপ করে আছে। সময় যেন আর কাটছে না। শেষ পর্যন্ত আমিই বললুম: এবারে তা হলে ওঠা যাক।

উত্তরে ঋতা হাসল, কিন্তু ওঠবার কোন চেষ্টা করল না।

বললুম: হাসলেন যে?

আপনার কাণ্ড দেখে।

সে আবার কী?

হাসতে হাসতেই ঋতা বলল: পুরুষের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা এই যে মেয়েদের সামনে তারা পুরুষ সাজে।

মানে?

মানে খুবই সোজা। এই মুহূর্তে আপনি যদি নিজেকে পুরুষ না ভেবে মানুষ ভাবেন, আর আমাকে ভাবেন আর এক জন মানুষ, তা হলে দু জনের সম্বন্ধ এখনি পালটে যায়। আমরা অন্তরঙ্গ হতে পারি বন্ধুর মতো।

আমার মনে হল, ঋতা খুব সত্য কথা বলছে। তাই কোন কথা না বলে তাকেই বলবার অবকাশ দিলুম।

ঋতা বলল: পুরুষ ও নারীর মধ্যে শুধু মা বোন কন্যা ও প্রিয়ার সম্পর্ক নয়, সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হল বন্ধুর সম্পর্ক। অথচ এই সত্যটি আমরা সব সময় অস্বীকার করি। এ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে অনেক কথা আছে, অনেক বড় বড় মূল্যবান কথা। কিন্তু সব চেয়ে সাধারণ কথাটি নেই। পুরুষে পুরুষে যদি বন্ধু হতে পারে,

পারে মেয়েতে মেয়েতে, তবে পুরুষে মেয়েতে কেন পারবে না? সমান অধিকারের জন্যে আমরা আন্দোলন করছি, বন্ধু ভাবে মেশবার জন্যে তো কোন দাবি জানাচ্ছি না!

এই ধরনের কথা আমি উপন্যাসে পড়েছি। কিন্তু নিজে কোন দিন উপলব্ধি করি নি। বললুম: শুনতে মন্দ লাগছে না।

ঋতা বলল: এ কথা মেনে নিলে আরও ভাল লাগবে। অন্তত আরাম যে পাবেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

মিত্রার কথা আমার মনে পড়ল। দিল্লীতে সে এই কথা বলত। অন্তত এই যুক্তি দেখিয়ে চাওলাকে সে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। বললুম: এই কথা আমি রাজধানীতে এক বার শুনেছিলুম। ব্যানার্জী সাহেবের শৌখিন মেয়ে মিত্রা এই কথা বলত। যাকে বলত, সে যুক্তি মানতে রাজী ছিল না। তার উত্তরটা খুব সভ্য হত না।

অশ্লীল না হলে বলতে পারেন।

বলত, পুরুষের প্রেম ঠিক বাঘের লোভের মতো।

প্রেমের কথা কেন উঠছে, আমি তো ওইটেই বাদ দিতে বলছি।

সাধু। এ হল তপস্বীর কথা। কিন্তু তাঁদেরও তপোভঙ্গ হয়েছে। বিশ্বামিত্রের মতো জবরদস্ত ঋষিও দুবার এ কথা ভুলেছিলেন। একবার ভুলিয়েছিল মেনকা, আর একবার রম্ভা। মেনকার গল্প সকলের জানা, রম্ভার কথা গোপন আছে। কেন না শকুন্তলার মতো কোন কন্যার জন্ম হয় নি।

আপনি তামাশা করছেন।

তামাশা নয়। মিত্রা চাওলাকে বিয়ে করেছে কিনা এখনও খবর পাই নি। সে খবর পেলে তামাশা করব।

ঋতা বলল: আমার যুক্তিতে কোন অসঙ্গতি আছে?

সঙ্গতি একটু বেশি আছে বলেই ভয়ের কথা।

একটু বুঝিয়ে বলবেন?

বোঝাবার চেষ্টা করব। কিন্তু অপরাধ নেবেন না।

না।

আমার কাছে আপনি নহ মাতা, নহ কন্যা। কিন্তু সুন্দরী রূপসী। আপনার থিওরি অনুসারে আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুর সম্পর্ক হতে পারে। মেনে নিলুম। ধীরে ধীরে আমাদের বন্ধুর সম্পর্ক বড় অন্তরঙ্গ হল। মনে রাখবেন, আমরা দুজনেই অবিবাহিত। আপনার বৌদি আমাদের মেলামেশা ভাল চোখে দেখছেন না। তার প্রধান কারণ আমি কেরানী। যদি কয়লার কারবারী হতুম, তা হলে হয়তো বিয়ের প্রস্তাব করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি অন্যের সঙ্গে আপনার বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লাগবেন এবং আপনার জীবনটা বিপন্ন করে তুলবেন।

বুঝেছি।

আমি জানতুম, আপনি বুঝবেন। রবীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন। তাই তাঁর শেষের কবিতার শেষটা কান্নার মতো শুনিয়েছিল।

ঋতা হেসে ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার হাসিতে আর সে প্রসন্নতা নেই।

যাত্রীদের সেই ছোট দলটি নেমে যাচ্ছিল। এক জন জিজ্ঞাসা করল: ও ধারের হনুমানটা দেখেছেন তো?

আমি চমকে উঠলুম। ঋতাও। উঠেও দাঁড়ালুম দু জনে। ঋতা নামতে যাচ্ছিল। বললুম: ও ধারটা ঘুরে চলুন।

ঋতা হাসল। কিন্তু আমি হাসতে পারলুম না। আমি হাসলুম সেই হনুমানের বিরাট কালো মূর্তিটি দেখবার পর। ওই মূর্তিটি না দেখলে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হত।

১৮

খণ্ডগিরি পাহাড়েই আবার রামানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে উঠছিলেন। ঋতার সঙ্গে আমাকে নামতে দেখে একটুও খুশী হলেন না। একেবারে মারমুখো হয়ে উঠলেন। বললেন : আপনার কি কোন আক্কেল নেই মশাই ?

আমি ঋতার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, কৌতুকে তার দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমাদের দুজনের বাদানুবাদ সে উপভোগ করবার জন্য কৌতূহলী হয়েছে। বললুম : আপনি কাকে বলছেন ?

আপনাকে, আপনাকে। কোন মহিলাকে মশাই বলে সম্বোধন করা হয় না।

আমাকে ! আমি কী করেছি ?

ভদ্রলোক আঙুল তুলে বললেন : প্রশ্ন নয়, আমি উত্তর চাইছি। আমি যা জিজ্ঞেস করেছি, আপনি তার উত্তর দিন।

কিসের উত্তর দেব ?

আপনার আক্কেল আছে, কি নেই ?

না।

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন : না !

বললুম : আমার সব কটা আক্কেল দাঁত এখনও ওঠে নি। মাঝে মাঝে যখন উঠব উঠব করে, তখন যন্ত্রণার শেষ থাকে না।

ঋতা উদ্দাম ভাবে হেসে উঠল। এর পরে রামানন্দবাবু কী বলবেন, ভেবে পেলেন না। সিঁড়ির একটা ধাপের উপর রামানন্দবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা ওই পর্যন্ত নেমে আসতেই তিনিও নামতে শুরু করলেন। বললুম : এইবারে কী বলবেন বলুন।

রামানন্দবাবু এবারে ঋতাকে বললেন : আপনি বুঝি সমস্ত পাহাড়টা ঘুরলেন ?

সমস্ত পাহাড় ঘোরার মানে ঋতা বুঝল কিনা জানি না, উত্তরে শুধু হাসল।

উৎসাহ পেয়ে ভদ্রলোক বললেন : আমি ঠিক সন্দেহ করেছিলুম। আপনার দাদা বৌদিকে বললুম, কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, আমি খুঁজে আনছি।

তার পরেই আমার দিকে চেয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে বললেন : আপনি এ দিকে কেন এসেছিলেন ?

বুঝতে পারলুম যে আমি সঙ্গে থাকলে তাঁর কৃতিত্বের দাবিতে এক জন অংশীদার হতে পারি। তাই বললুম : আপত্তি থাকে, আমি এখানে বসে থাকি। আপনারা এগিয়ে যান।

না না, তা কী করে হয় !

কেন হবে না ! বলব, আমিও হারিয়ে গিয়েছিলুম। আপনি আমাকেও এসে খুঁজে নিয়ে গেছেন।

ঋতা এত ক্ষণে আমার রসিকতা বুঝতে পারল। তারই প্রমাণ পেলুম তার হাসিতে।

পাহাড়ের নিচে একটা গাছের ছায়ায় আমাদের বাস দেখতে পেলুম। দু এক জন যাত্রী তার ভিতরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে চারি দিক দগ্ধ হচ্ছে। গাছের ছায়াতেই যেন একটু আরামের আশ্বাস। সেইখানেই ঋতার দাদা বৌদিকে দেখতে পেলুম। দ্বিতীয় বার এই পাহাড়ে ওঠবার কথা তাঁরা ভাবতে পারছেন না। সুখী মানুষ, পরিশ্রমী নন। অনেকে শুনেছি এক বারও উঠতে চান না। আমাদের দলেরই এক জন মোটা মহিলাকে ধাপের উপর বসে দম নিতে দেখেছি। শেষ পর্যন্ত উঠতে পেরেছেন কিনা জানি না। এই রকম সিঁড়ি ভেঙে ভারতের অনেক মন্দিরে উঠতে হয়। ত্রিচিনপল্লীর রক টেম্প্‌ল, শ্রবণবেল-গোলার গোমতেশ্বর, জুনাগড়ের জৈন মন্দির বা পুনার পার্বতী মন্দিরেও ধাপে ধাপে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। কোথাও উঠেছি,

কোথাও উঠি নি, দেখি নিও অনেক জায়গা। কিন্তু একটি জিনিস সর্বত্র দেখেছি। সে যাত্রীর কষ্ট। সকলের শক্তি সমান নয়। কেউ তরতর করে উঠে যাচ্ছে, কেউ উঠছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে, কেউ বা খানিক দূর উঠেই বসে পড়ছে। নিজেদের অক্ষমতার কথা যাদের জানা আছে, তারা নিজেরাও উঠছে না, অপরকেও নিরুৎসাহ করছে দেবতার মাহাত্ম্য নেই বলে। রামানন্দবাবু না থাকলে ঋতার দাদাকে আবার উঠতেই হত। এই ভদ্রলোকের উদ্বেগ ও উৎসাহ দেখে তাঁরা বেঁচে গেছেন। নিজের অক্ষমতার জন্য ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর খোঁটা খাচ্ছেন কিনা জানি না।

রামানন্দবাবু কোন উত্তর দিলেন না। বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে, কিছু করা এখন নিরর্থক। খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করে আমি বললুম: ইনি যে পাহাড় পরিক্রমা করেছেন, তা আপনি কী করে জানলেন?

হেঁ হেঁ!

রামানন্দবাবু যে খানিকটা গর্ব বোধ করলেন তা তাঁর এই সংক্ষিপ্ত উত্তরেই বোঝা গেল। কিন্তু আমি বললুম: হিসেবে আপনার ভুল হয়েছে।

অ্যাঁ?

আমি বললুম: হ্যাঁ।

আমার ভুল হয়েছে?

আপনার ভুল হয়েছে কিনা আপনি এঁকেই জিজ্ঞেস করুন।

রামানন্দবাবু ঋতার দিকে তাকালেন।

ঋতা বলল: গুহার ভেতরে আমি গবেষণা করছিলাম।

গবেষণা!

আমি বললুম: হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কাজে আপনি এখানে এসেছেন, সেই কাজ। গবেষণা।

সত্যি!

রামানন্দবাবু অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে ঋতার দিকে তাকালেন।

তখন আমরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেছি। ঋতার বৌদি এগিয়ে এসে বলে উঠলেন: কী আক্কেল তোমার!

সেই আক্কেলের কথা। ঋতা হেসে বলল: আক্কেল দাঁত যে এখনও গজায় নি বৌদি, তাই মাঝে মাঝে বেআক্কেলে কাজ করে ফেলি।

গম্ভীর ভাবে ঋতার দাদা বললেন: কথা শোন!

রামানন্দবাবু কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: এ সব কথা আপনার কাছেই শিখছেন।

ঋতা খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমি বললুম: দেখছেন ঐ ভদ্রলোককে?

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রামানন্দবাবু চমকে উঠলেন। রাস্তার ধারে কালো একখানা বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সেই ভদ্রলোক কিছু টুকে নিচ্ছিলেন। পাহাড়ে ওঠবার সময় আমি দেখেছিলুম, ওতে খণ্ডগিরির সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক কথা লেখা আছে। রামানন্দবাবু নিজেও সে দিকে লাফিয়ে গেলেন এবং পকেট থেকে তাঁর খাতা পেনসিল বার করে টুকতে আরম্ভ করলেন। ঋতা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

যাঁরা উদয়গিরির দিকে গিয়েছিলেন, এবারে তাঁরাও একে একে ফিরে আসতে লাগলেন। এখান থেকে ফেরার সময় হয়েছে। পথে আমাদের আরও দুটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে, ধৌলি ও রাজারাণীর মন্দির। তারপর সোজা পুরী। ভুবনেশ্বরে আমাদের চা খেতে হবে।

ঋতার দাদা ও বৌদি ক্লান্ত বোধ করছিলেন। তাঁরা বাসে উঠে পড়লেন। সকলের সঙ্গে আমরাও উঠলুম।

রামানন্দবাবু সবটা টুকতে পারেন নি। যাত্রীদের কলরব শুনেই বাসে উঠে পড়েছিলেন। তারপর ধরলেন সেই ভদ্রলোককে: ও মশাই, শুনছেন?

বলুন।

আপনার নোট বইখানা এক বার দেবেন ?

ভদ্রলোক গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কথা না বলে নোট বইখানা পকেট থেকে বার করে দিলেন।

সেই গলাবন্ধ কোট পরিহিত ভদ্রলোক বাধা দিলেন। তাঁর নাম মনে পড়ছে না। নামটি আমরা জেনেছিলুম কিনা তাও ভুলে গেছি। তিনি বললেন: সরকারের নোটিস পড়ে আর কতটুকু জানতে পারবেন ?

রামানন্দবাবু বললেন: তবে কী পড়ব ?

কেন, মাদলা পঞ্জী পড়ুন।

সে আবার কী ?

উৎকল রাজাদের কুলজি গ্রন্থের নাম মাদলা পঞ্জী। তাতে সমস্ত বিবরণ পাবেন।

পুরীর বাজারে পাওয়া যাবে ?

পাগল হয়েছেন !

ভুবনেশ্বরে ?

ভদ্রলোক বিরক্ত ভাবে বললেন: আরে মশাই, এ কি কোন উপন্যাস না ডিটেকটিভ বই যে হাটে বাজারে বিক্রি হবে। যদি পড়তে চান তো কোন লাইব্রেরিতে যান, আর যদি শুনতে চান তো আমাকে বলুন।

আমি শুনতে পেলুম, ঋতা তার বৌদির কানে কানে বলল: বেশ হয়েছে।

তার বৌদি কোন উত্তর দিলেন না।

রামানন্দবাবু বললেন: বেশ তো, বলুন না আপনি।

ভদ্রলোক একটু গুছিয়ে বসে বললেন: উৎকল যে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যের মধ্যে ছিল, মাদলা পঞ্জীতে তার উল্লেখ আছে।

রামানন্দবাবু চমকে উঠে বললেন: মহাভারতের যুধিষ্ঠির !

যুধিষ্ঠির আবার কজন আছে!

তার পর?

ভদ্রলোক শান্ত হয়ে বললেন: তার পর পরীক্ষিৎ ও জন্মেজয়—এঁরাও উৎকলে রাজত্ব করেছেন। জন্মেজয়ের পর একে একে আঠারো জন রাজা রাজত্ব করেন। তারপর উৎকল যবনদের হাতে পড়ে।

যবন মানে তো মুসলমান!

এ প্রশ্ন আমাকে করবেন না। আমার খেই হারিয়ে যায়। কোনখানে গ্রীকদের যবন বলা হয়েছে—ব্যাকৃট্রিয়ান গ্রীক। তারাও নাকি উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিল। কোনখানে বৌদ্ধদের যবন বলা হয়েছে। উৎকলে এক সময় বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল। অনেকে মনে করেন, আইওনিয়ানরাই যবন নামে পরিচিত।

রামানন্দবাবু বললেন: আমরা তো যবন বলতে মুসলমান বুঝি।

সাধারণ ভাবে সবাই তাই বোঝেন। এখন যা বলছিলাম তাই বলি। ৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে—সনটা মনে রাখবেন—যযাতি কেশরী নামে এক রাজা—

দাঁড়ান দাঁড়ান, টুকে নিই সনটা।

বলে রামানন্দবাবু তাঁর পকেট থেকে খাতা পেনসিল বার করলেন। কিন্তু চলতি বাসে লিখতে কিছুই পারলেন না।

থাক, আর লিখতে হবে না।

হতাশ ভাবে রামানন্দবাবু তাঁর খাতা বন্ধ করে পকেটে রাখলেন।

ভদ্রলোক্ বললেন: যবনদের হাত থেকে রাজা যযাতি কেশরী উৎকল উদ্ধার করলেন। ভুবনেশ্বরে তাঁর রাজধানী স্থাপিত হল। ভুবনেশ্বরে যে শিবের মন্দির দেখলেন, তা এই যযাতি কেশরীর প্রতিষ্ঠা। এঁর বংশধরেরা প্রায় সাত শো বছর উৎকলে রাজত্ব

করেছেন। এঁরা সকলেই শৈব ছিলেন এবং মন্দিরে মন্দিরে তাঁদের রাজধানী ভুবনেশ্বরকে ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরে পরিণত করেছিলেন। জাজপুরেও এঁদের একটি রাজধানী ছিল। কটক শহর পত্তন করেন রাজা নৃপ কেশরী। এই বংশের চুয়াল্লিশ জন রাজা। শেষ রাজা সুবর্ণ কেশরীর মৃত্যু হয় ১১৩২ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পরেই দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন : গঙ্গা বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম চোড়গঙ্গা। চোড়গঙ্গা বাঙালী ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।

বলেন কি !

আমি বলি না। এ একটা মতের কথা। এখন আপনারা যে জায়গাকে তমলুক বলেন, তার প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্তি। অনেকের অনুমান যে চোড়গঙ্গার আদি বাস তাম্রলিপ্তিতে। উৎকলের অরাজকতা দেখে তিনি এসে এ দেশ দখল করেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন, এবং তাঁরই সঙ্গে উড়িষ্যায় এল বিষ্ণুর উপাসনা।

আশ্চর্য !

আশ্চর্য আবার কী ! এত দিন বৌদ্ধ ছিল, শৈব ছিল, এবারে এল বৈষ্ণব। চোড়গঙ্গা তো কালাপাহাড় নয় যে বৌদ্ধ ও শৈবদের মেরে মঠ আর শিব মন্দির সব ভেঙে ফেলবেন ! ইনি শিবের বদলে বিষ্ণুর পূজা শুরু করলেন। এই বংশের পঞ্চম রাজা অনঙ্গ ভীম দেব। তাঁরই রাজত্বকালে পুরীতে নির্মিত হয় জগন্নাথদেবের মন্দির। এই বংশের তেইশ জন রাজা চার শো বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। চোড়গঙ্গার পুত্র গঙ্গেশ্বর গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত নিজের শাসনে আনেন। পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চী রাজ্য অধিকার করেন। আর কপিল রাজার আমলে সেতুবন্ধ পর্যন্ত উৎকল রাজ্য বিস্তৃত হয়।

এই ভদ্রলোক যে ইতিহাসের পণ্ডিত, তাতে আমার সন্দেহ

রইল না। শুধু এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে এই সব পণ্ডিতের সাক্ষাৎ আমরা কী করে পাই। এ একটা আকস্মিক ঘটনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়, কিন্তু শুনলে অনেকেরই অসম্ভব বলে মনে হবে। জীবনে অনেক অসম্ভব ঘটনাই তো ঘটে, কিন্তু গল্পে ঘটলেই তা অবাস্তব মনে হয়। এ নিয়ে তর্ক চলে না।

ভদ্রলোক বললেন: গোবিন্দ বিদ্যাধর নামে এক ব্যক্তি এই বংশের শেষ রাজা কহ্লারুগ দেবকে হত্যা করে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি নিজে রাজত্ব করেন সাত বৎসর। তাঁর পরে আঠারো বছরে চার জন রাজা রাজত্ব করে যান। শেষ রাজার নাম মুকুন্দ দেব। তিনি কুখ্যাত কালাপাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হন। কালাপাহাড় শুধু রাজ্যই অধিকার করেন নি, জগন্নাথের মন্দির লুঠ করে দেবমূর্তি ধ্বংস করেন। উৎকলের ইতিহাসে মুকুন্দ দেব একাধিক। মাদলা পঞ্জী মতে এই মুকুন্দ দেবই প্রথম। জাজপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে এঁর মৃত্যু হয় ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। পঞ্চাশ বৎসর ধরে মুসলমানরা উৎকল আক্রমণ করছিল। কিন্তু এ দেশ তারা অধিকার করতে পারে নি। কালাপাহাড় উৎকল অধিকার করলেন। গৌড়ীয় গোবিন্দ বছর দুই রাজত্ব করেছিলেন। তার পর প্রায় উনিশ বছর অরাজকতা। আবার তেরো জন হিন্দু রাজা রাজত্ব করেন। উৎকল এক সময় রাজপুতের অধিকারেও ছিল। আকবরের আমলে ছিল পাঠানের দখলে। মোগলের হাতে এল শাহজাহানের সময়। শেষে মারাঠার কবলে। নবাব আলিবর্দী উৎকল রক্ষা করতে পারেন নি, কিন্তু ইংরেজ তাঁর নাতি সিরাজকে পরাজিত করে উৎকল অধিকার করেছিল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। সেদিন তারিখ ছিল ১৪ই অক্টোবর।

ভদ্রলোক একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বললেন: মুসলমান অত্যাচারে ও উৎপীড়নের পর যেটুকু বাকি ছিল, তাও শুষে নিয়ে গেল মারাঠী বর্গীর দল।

রামানন্দবাবু খুব মনোযোগ দিয়ে এই গল্প শুনছিলেন। ভদ্রলোক থামতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: উৎকল নাম কী করে উড়িষ্যা হল, তাই বলুন।

এ যেন একেবারে হুকুম। কিন্তু ভদ্রলোক রাগ করলেন না, বিরক্তও হলেন না। বললেন: উৎকল নাম কোথা থেকে এসেছিল জানেন?

না।

শাস্ত্রে আপনার বিশ্বাস আছে?

রামানন্দবাবু একটু বিব্রত বোধ করলেন। হ্যাঁ বলবেন, কি না বলবেন, স্থির করতে না পেরে বললেন: যা বলতে চান, বলুন না।

ভদ্রলোক বললেন: ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু, তাঁর এক পুত্র ইক্ষ্বাকু, অপর পুত্র সুদ্যুম্ন। উৎকল সুদ্যুম্নের পুত্র।

রামানন্দবাবু চমকে উঠে বললেন: বলেন কি!

ঠিকই বলছি।

তার পর?

তার পর ওড্র। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে চন্দ্রবংশে বলির পুত্র ওড্র। তাঁরই নামে দেশের নাম হয়েছে ওড্র দেশ। উৎকল বা ওড্র কলিঙ্গের নামান্তর নয়, এ স্বতন্ত্র রাজ্য। কোন সময় হয়তো কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল।

রামানন্দবাবু বললেন: দাঁড়ান মশাই, খাতায় লিখে নিই।

বলে পকেট থেকে খাতা পেনসিল বার করলেন।

ভদ্রলোক বললেন: বাসের ভেতর দাঁড়াব কি মশাই, বেশ তো বসে আছি।

কী বিপদ, আমি কি আপনাকে সত্যি সত্যিই দাঁড়াতে বলছি!

তাইতো বললেন।

তাই বললুম?

তবে কি আমি মিথ্যে বলছি?

আমি ঋতার হাসি চাপার শব্দ শুনতে পেলুম। সেই সঙ্গে তার বৌদির ভৎ´সনা। কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন হলুম এই দুই ভদ্রলোকের জন্য। বাসের মধ্যেই তাঁরা যাতে হাতাহাতি শুরু না করেন সেই উদ্দেশ্যে বললুম: হিউএন চাঙ এ দেশে আসেন্ নি?

রামানন্দবাবু তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলেন: আমাকে বলছেন?

ভদ্রলোকটি বললেন: আমাকে?

আমি কারও দিকে না তাকিয়ে বললুম: আপনাকে।

আমতা আমতা করে রামানন্দবাবু বললেন: তবেই বিপদে ফেললেন।

আর ভদ্রলোক বললেন: বিপদ কিসের! হিউএন চাঙ যদি নাই এসে থাকেন তো উ-চর কথা উড্রর কথা কী করে লিখলেন!

লিখেছেন বুঝি!

ভদ্রলোক বললেন: আলবৎ লিখেছেন। লিখেছেন, দেশের লোকেরা অসভ্য হলেও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। খাদ্যের অভাব ছিল না দেশে। ভারতের অন্যত্র তখন বৌদ্ধ ধর্মের ভাটা পড়েছিল, কিন্তু উড়িষ্যায় তখনও জোয়ার চলেছে। এক শো সংঘারামে ভিক্ষু ছিলেন হাজার দশেক।

রামানন্দবাবুর হাতে তখন খাতা পেনসিল ছিল। বললেন: দাঁড়ান দাঁড়ান, লিখে নিই।

ভদ্রলোক এবারে আর রাগ করলেন না, বললেন: দাঁড়ান বলবেন না, বলুন অপেক্ষা করুন।

ঋতা তখনও হাসি চাপবার চেষ্টা করছে।

২০

দূর থেকে আমাদের ধৌলি দেখতে হল। বাস তার কাছে যাবে না। যেতে পারে না নয়, এখন তার সোজা ফেরবার কথা।

সকলের আগে চটলেন রামানন্দবাবু। বললেন: কার হুকুম? কার হুকুমে এই বাস চলবে? ড্রাইভারের, না আমাদের হুকুমে?

ড্রাইভার এই হুমকিতে একেবারেই বিচলিত হল না, বোধ হয় ভ্রূক্ষেপও করল না। কিন্তু যাত্রীদের এক জন বললেন: আপনি কাকে বলছেন? ওদের যা ইচ্ছে, তাই ওরা করবে।

করলেই হল! আমরা পয়সা দিই নি?

পয়সা সবাই দিয়েছি, বাস তবু ওদের ইচ্ছাতেই চলবে।

না, চলবে না। ড্রাইভার!

ড্রাইভার নিরুত্তর।

এই ড্রাইভার!

আমি ঋতার দিকে চেয়ে দেখলুম, সে তার অভ্যাস মতো হাসছে।

রামানন্দবাবু বললেন: একটা লোক দেখেছিলুম ড্রাইভারের সঙ্গে, সেই বা গেল কোথায়!

বিরক্ত ভাবে একজন যাত্রী বললেন: চুলোয় যাক।

অ্যাঁ, আপনিও সায় দিচ্ছেন!

তার কাজে সায় দিচ্ছি না, আপনাকে থামতে বলছি।

আমাকে?

হ্যাঁ মশাই, আপনাকে।

কিন্তু রামানন্দবাবু থামবার পাত্র নন, বললেন: বেশ লোক তো আপনি! বাস কি আপনার, যে আপনার গায়ে লাগছে!

গায়ে লাগছে না, ধৈর্যে লাগছে। অনুগ্রহ করে আপনি চুপ করলে একটু আরাম পাই।

রামানন্দবাবু এ কথারও উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে তর্কে নিবৃত্ত করবার জন্যে বললুম: ধৌলি কী জিনিস মশাই?

রামানন্দবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন: ধৌলি জানেন না?

না।

নাম শোনেন নি কোন দিন?

না।

আশ্চর্য!

বললুম: সব কথা কি সব মানুষ জানে! বলুন না আপনি।

রামানন্দবাবু বললেন: আপনার কথা শুনে আমার ভারি আশ্চর্য লাগছে। এমন একটা দ্রষ্টব্য জিনিসের কথা আপনি আগে কখনও শোনেন নি!

এই বারে আমার মনে হল যে রামানন্দবাবু হয়তো নিজেই কিছু জানেন না, আর জানেন না বলেই এমন ভণিতা করছেন। বললুম: যদি না জানেন, বলবেন না।

রামানন্দবাবু প্রায় মারতে উঠলেন। বললেন: আমি জানি না, এ কথা আপনাকে কে বললে?

বললুম: বলবে আর কে! আপনার কথাতেই সন্দেহ হচ্ছে।

তা তো হবেই। আপনাদের মতো বকবক করতে আমি ভালবাসি না কিনা!

তার পরেই সেই গলাবন্ধ কোট পরা ভদ্রলোককে বললেন: কী মশাই, এত ক্ষণ তো অনেক বড় বড় কথা বলছিলেন, ধৌলির কথায় কেন চুপ মেরে গেলেন?

ঋতা এতক্ষণ চেপে চেপে হাসছিল, এইবারে উদ্দাম ভাবে হেসে উঠল।

আমি রামানন্দবাবুর মুখের দিকে তাকালুম। তিনি কিছু অপ্রতিভ হয়েছিলেন। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললেন: তা আপনি শুরু করছেন না কেন! আপনার কাণ্ড দেখে যে সবাই হাসছেন।

সেই ভদ্রলোক বললেন: কার কাণ্ড দেখে, তা জিজ্ঞেস করে জেনে নিন।

রামানন্দবাবু আবার কিছু বলবেন ভেবে আমি তাড়াতাড়ি বললুম: আপনি আর দেরি করবেন না।

ভদ্রলোক বোধ হয় আমার ভয়ের কারণ বুঝলেন, তাই তখনই বললেন: ধৌলিতে অশোকের একটা শিলালিপি আছে।

রামানন্দবাবু ধমক দিয়ে বললেন: ধৌলিটা কী, তা তো বলবেন।

ধৌলি একটা নিচু পাহাড়ের নাম। ভুবনেশ্বর থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে। অশোকের সময় এই পাহাড়ের গা বেয়ে বোধ হয় কোন ভাল রাস্তা ছিল। প্রতি দিন অনেক মানুষ নিশ্চয়ই যাতায়াত করত। তাই অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়লাভের পর এই পাহাড়ের একটা বড়ো পাথরের গায়ে শিলালিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে একখানা পাথর সামনে বেরিয়ে এসেছে। তার উপরে একটা বিরাট হাতির মূর্তি, আর গায়ে শিলালিপি। এই রকম শিলালিপি অশোক ভারতের নানা স্থানে উৎকীর্ণ করিয়েছেন। গির্নার প্রভৃতি স্থানে যে অনুশাসন আছে, তার সঙ্গে এখানে একটু প্রভেদ দেখা যায়। বারো ও তেরো নম্বরের অনুশাসন দুটি অন্য রকম। নূতন বিজিত রাজ্য কলিঙ্গের প্রজাদের উদ্দেশ্যে এ দুটি রচিত। একটিতে মহামাত্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, উপযুক্ত অনুসন্ধান বা বিচার না করে কোন প্রজাকে যেন শাস্তি দেওয়া না হয়। কোন মহামাত্য এই আদেশ অমান্য করলে তিনি সম্রাটের অনুগ্রহ হারাবেন। অপর অনুশাসনে বলা হয়েছে, বনবাসীরা যেন সম্রাটকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করে।

ভদ্রলোক বললেন: এই শেষ অনুশাসন ছুটি পরিবর্তনের প্রয়োজন অবশ্যই হয়েছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধের মতো ভয়াবহ মৃত্যু আর কোন যুদ্ধে সংঘটিত হয় নি। এক লক্ষ লোক মরেছে, ছু লক্ষ বন্দী হয়েছে। রোগে অনাহারে ও ধ্বংসলীলায় যে কত লোক মরেছে, তার গণনা নেই। এ যুগের আণবিক অস্ত্র তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। গোলাগুলি দিয়েও তখন যুদ্ধ হত না। এ তো আজকের কথা নয়, এ যুদ্ধ হয়েছিল যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ছু শো একষট্টি বছর আগে। লোকে তখন ঢাল তরোয়াল নিয়ে পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করত, রথে চড়ে তীর ছুঁড়ত, আর বর্শা চালাত ঘোড়া ও হাতির পিঠ থেকে। হাতাহাতি চুলোচুলিও হত। তবু মরেছিল কয়েক লক্ষ লোক। এই যুদ্ধ না হলে পৃথিবীতে বৌদ্ধ ধর্মের এমন প্রসার হত না।

কী রকম?

সম্রাট অশোক এই ধ্বংসের পরিমাণ দেখলেন ছু চোখ মেলে। কলিঙ্গ বিজয় হল, তাঁর সাম্রাজ্য হল বিস্তৃত, ইতিহাসে আর একটি কীর্তি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু—

ভদ্রলোক থামলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর কিছু আর্দ্র দেখলুম। খানিকটা আবেগ এসেছে।

রামানন্দবাবু বললেন: তারপর?

সম্রাট অশোক দেখলেন, কলিঙ্গ নয়, একটা শ্মশান তিনি অধিকার করেছেন। শিশুরা ক্ষুধায় চিৎকার করছে, আর নিঃসম্বল নারীরা কাঁদছে নিজেদের অসহায় অবস্থা দেখে। কী জন্য এই রাজ্য জয়! নিজের অহংকার চরিতার্থের জন্য, না কোন কল্যাণের জন্য! অশোক অনেক ভাবলেন, নীরবে কাঁদলেন, তার পর অস্ত্র ত্যাগ করলেন চির দিনের মতো।

রামানন্দবাবু প্রশ্ন করলেন: তাতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হল কী করে?

ভদ্রলোক বললেন : ছেলেবেলায় ইতিহাস বুঝি পড়েন নি?

পড়েছি বৈকি।

তবে?

সারা জীবন মনে রাখবার সঙ্কল্প নিয়ে তো পড়ি নি।

বেশ করেছেন। এবারে একটু বুদ্ধি খরচ করুন। দেখবেন, যুদ্ধের ফলাফল দেখে যিনি কাঁদেন, তিনি শুধু অস্ত্র ত্যাগই করেন না। বলেন, অহিংসা পরমো ধর্মঃ। বলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তারপর সেই বুদ্ধের বাণী বিতরণের ব্যবস্থা করেন দেশে দেশে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি। ভারতের সর্বত্র অশোকের অনুশাসন উৎকীর্ণ হল শিলালিপিতে, মঠে বিহারে চৈত্যে সংঘের প্রতিষ্ঠা হল, শ্রমণ সন্ন্যাসীর সাহায্যে দেশে দেশান্তরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হল। বৌদ্ধ অশোক অহিংসায় বিশ্বাসী হয়ে ভারতের রাষ্ট্রশক্তিকে খর্ব করলেন।

বললুম : অনেক ঐতিহাসিক তো এই ঘটনাকেই ভারতের দুর্ভাগ্য বলে মনে করেন।

রামানন্দবাবু বললেন : কেন?

উত্তর আমাকে দিতে হল না, দিলেন সেই ভদ্রলোক, বললেন : হিংসা ভুলে হিন্দুরা দুর্বল হল। হিন্দুর সাম্রাজ্য বেশি দিন টিকল না, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তার পরে পদানত হল বিদেশী শক্তির কাছে। এ সব কথা আপনার ছেলের ইতিহাসের বইএ পড়বেন।

কী বললেন?

রাগে রামানন্দবাবু প্রায় উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন। আমি তাঁর হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বললুম : এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?

হব না! যা মুখে আসে, উনি তাই আমাকে বলবেন!

ভদ্রলোকও প্রতিবাদ করে উঠলেন : কী বলেছি মশাই আপনাকে?

কিছু বলেন নি ?

ভদ্রলোক দৃঢ় স্বরে বললেন : না।

মিথ্যে কথা। আমি বিয়ে করি নি, আর আমার ছেলের কথা বললে সেটা গাল দেওয়া হয় না ?

বাসের অনেকেই এবারে এক সঙ্গে হেসে উঠলেন। যাঁরা চোখ বুজে ছিলেন, বা অন্যমনস্ক ছিলেন, তাঁরাও হলেন কৌতূহলী। রামানন্দবাবু কিন্তু আরও চটে উঠলেন, বললেন : অসভ্যতা।

রামানন্দবাবুর উষ্মার কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু হাসি সংবরণ করেছি। সকলের সঙ্গে হেসে উঠতেও সাহস পাই নি। কেন না পুরী পৌঁছে আমাদের এক ঘরে একত্র থাকতে হবে। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন না, পরিত্রাণও পাব না তাঁর হাত থেকে। কাজেই জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ চলে না। তাঁকে ভোলাবার জন্য আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলুম : ধৌলিতে আর কিছু দেখবার আছে ?

আছে। নিকটেই একটি অতি প্রাচীন পুষ্করিণীর সন্ধান পাওয়া গেছে। অশোকের পরে কোন রাজা এটি খনন করেছিলেন। এক বর্গ মাইল পরিধির এই পুষ্করিণীটি সংস্কার করে এতে এখন আধুনিক পদ্ধতিতে মাছের চাষের গবেষণা হচ্ছে।

তার পর ?

তার পর শিশুপাল গড়। ভুবনেশ্বরের নিকটেই শিশুপাল গড়ের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। অনেকের ধারণা যে এই দুর্গটি অশোকের কলিঙ্গ আক্রমণের পূর্বে নির্মিত। আবার অনেকে বলেন যে অশোকের পরে জৈন রাজা খরবেলা এই দুর্গে অবস্থান করেন।

জৈন রাজা খরবেলা যে একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যাচ্ছে না। বললুম : খরবেলার সম্বন্ধে কতটুকু জানা যায় ?

মোটামুটি সবই জানা যায়। অশোকের অনুশাসন কলিঙ্গে এক শো বছরের মধ্যেই সম্মান হারায়। ১৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আমরা খরবেলাকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দেখি। বর্তমান উদয়গিরির নাম দেখেছি কুমারী পর্বত। তার হাতি গোম্ফা আপনারা দেখে এলেন। হাতি গোম্ফার শিলালিপিও বোধ হয় দেখেছেন!

ভদ্রলোক আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন: এই শিলালিপিতে আমরা খরবেলার রাজত্ব কালের প্রথম চোদ্দ বছরের ইতিবৃত্ত পাই। জীবনের প্রথম পনের বছর তিনি রাজোচিত খেলা খেলেছেন। তার পরের ন বছর যুবরাজ রূপে তিনি লেখাপড়া ও রাজ্য পরিচালনা প্রভৃতি শিখেছেন। পঁচিশ বছর বয়স থেকে তিনি যুদ্ধবিগ্রহে যোগদান শুরু করেন। রাজা হয়ে তিনি অনেক সৎ কাজ করেছিলেন। প্রথম বৎসরে তিনি রাজধানী সংস্কার করেন, দ্বিতীয় বৎসরে সাতকর্নির রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তৃতীয় বৎসরে তিনি নিজের রাজধানীতে নৃত্য গীত ও নানা উৎসবের আয়োজন করেন।

ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। এই রকম করে তিনি হয়তো চোদ্দ বছরের ইতিহাস বলবেন। মানুষ কত বিচিত্র হয়, প্রতি দিন তার পরিচয় পাচ্ছি। ঘরে বসে এ সব জানা যায় না, জানা যায় না ইতিহাস বা উপন্যাস পড়ে। বই-এর মানুষের সঙ্গে বাস্তবের মানুষের অনেক তফাত। মানুষের প্রকৃতির যদি ছাঁচ তৈরি করতে হয় তো প্রত্যেক মানুষের আলাদা ছাঁচ হবে। এক জনের ছাঁচে আর এক জনকে কিছুতেই ফেলা যাবে না। এই গলাবন্ধ কোট পরিহিত ভদ্রলোকটিকেও আমি এই মুহূর্তে একেবারে নূতন ধরনের মানুষ বলে মনে করলুম।

ভদ্রলোক বললেন: একে একে চোদ্দ বছরের কাহিনী শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। সব কথা সঠিক মনেও নেই। তবে মথুরা আক্রমণের কথার পর অঙ্গ ও মগধ জয়ের কথা আছে।

আর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বৎসরে এই কুমারী পর্বতে এক শো সতেরটি গুহা নির্মাণের কথাতেই এই শিলালিপি শেষ হয়েছে। খরবেলার রাজত্ব কাল কিন্তু চোদ্দ বৎসরে শেষ হয় নি। তাঁর আদর্শ ছিল দিগ্বিজয়। তিনি একটির পর একটি রাজ্য জয় করেছেন। প্রথমে মুকি ও অন্ধ্ররাজা সাতকর্নির রাজ্য জয় করেন। তারপর মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক ও বেরারের ভোজকদের পরাজিত করেন। দূরত্বের জন্যে এই দুই রাজত্ব তিনি আপন রাজ্যভুক্ত করেন নি। মগধে তখন শক্তিমান রাজা পুষ্যমিত্র। খরবেলা তাঁকেও পরাজিত করে অঙ্গ ও মগধ অধিকার করেন। উত্তর ভারত থেকে বিদেশীদের তাড়িয়ে পুষ্যমিত্র তখন শক্তিমান বলে ভারত বিখ্যাত ছিলেন। প্রতিবেশী সকল রাজাকে পরাজিত করে খরবেলা অশ্বমেধ যজ্ঞও করেন।

ভদ্রলোক বোধ হয় আরও কিছু বলতে পারতেন। কিন্তু আমাদের তা শোনা হল না। সদর রাস্তা ছেড়ে আমরা অন্য পথ ধরেছিলুম। একটা অনাদৃত পথ। খানিকটা এগিয়েই বাস একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। শুনলুম, নামতে হবে।

নেমে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। সম্মুখে রাজা রাণীর মন্দির। এই মন্দিরের কথা আগেই বলেছি। এর চেয়ে সুন্দর মন্দির আমরা ভুবনেশ্বরে দেখি নি।

এই মন্দির দেখে যখন আমরা বাসে চাপলুম, তখন আমাদের চায়ের তৃষ্ণা জেগেছে। শুধু আমার নয়, অনেকেরই। বাসের ড্রাইভারকে তাঁরা একটা হোটেলে থামবার নির্দেশ দিলেন।

আমি রামানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তিনি গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। আর বোধ হয় কারও সঙ্গে কথা কইবেন না। আমাদের সঙ্গে চা-ও খেলেন না। বললেন, পুরীতে ফিরে খাবেন। সেখানে তো পয়সা দিতেই হবে।

শ্বেতা হাসল তাঁর চা না খাবার যুক্তি শুনে।

২১

মেঘের ডাকের সঙ্গে সমুদ্রের ডাকের অনেক প্রভেদ আছে। বর্ষার আকাশে মেঘ ঘনায়, বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ ডাকে। কখনও জোরে, কখনও আস্তে। যত জোরে বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘও তত জোরে ডাকে। তার কত বিচিত্র শব্দ, কত অস্থির, কত দুরন্ত। সমুদ্রের অন্য রূপ। সমুদ্র সারা দিন ডাকে, সারা ক্ষণ ডাকে, সমুদ্রের ডাকের কোন শেষ নেই। তার সুর এক, শব্দ এক, তার ডাক স্থির ও গম্ভীর। সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা এই ডাক শুনি, সমুদ্রের কাছ থেকে দূরে গিয়েও শুনি মনের কান দিয়ে। মেঘের ডাক বলতে কোন একটা বিশেষ সুর আমাদের কানে বাজে না, কিন্তু সমুদ্রের ডাকের নামের হৃদয়ে দোলা লাগে, মন ভরে। সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্রের ধারে বসে আমার এই সব কথা মনে আসছিল।

আজ আমাদের সারা দিন কেটেছে ভবঘুরের মতো। পুরী থেকে সাক্ষীগোপাল, সেখান থেকে ভুবনেশ্বর। তারপর উদয়গিরি খণ্ডগিরি হয়ে বাড়ি ফেরা। পথে রামানন্দবাবুর সঙ্গে সেই গলাবন্ধ কোট পরিহিত ভদ্রলোকের বিবাদ হয়েছে। ইতিহাসের অনেক গল্প শুনেছি। আর ঋতাকে দেখেছি আরও কাছে থেকে। আরও নিবিড় ভাবে তাকে চেনবার সুযোগ সে দিয়েছে। সে আমার অন্তরঙ্গ হতে চায়, বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গ, প্রিয়ার মতো নয়। প্রিয় বন্ধু ও প্রিয় বান্ধবী নয়। হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হবে দুই মানুষে, পুরুষ ও নারীতে নয়। তার কথাগুলিও আমার মনে পড়ল। সে বলেছিল, পুরুষের সব চেয়ে দুর্বলতা এই যে মেয়েদের সামনে তারা পুরুষ সাজে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে শুধু মা বোন কন্যা ও প্রিয়ার সম্পর্ক নয়, সবচেয়ে বড় সম্পর্ক হল বন্ধুর সম্পর্ক। অথচ এই সত্যটা আমরা সব সময় অস্বীকার করি। পুরুষে পুরুষে

যদি বন্ধু হতে পারে, পারে মেয়েতে মেয়েতে, পুরুষে মেয়েতে কেন পারবে না!

দিল্লীর মিত্রার কথা আমার মনে পড়েছিল। চাওলাকে সে নাকি এই কথাই বলত। ওখলায় আমাকে বলেছিল, চাওলাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করবে না। সে কথা আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি।

ভারি স্পষ্ট কথা, ভারি আশ্চর্যের কথা। অন্য মেয়ে হলে নিজের মনকে এমন অকপটে মেলে ধরত না। লজ্জা পেত, হয়তো ভয়ও পেত। লোকে নির্লজ্জ ভাববে, সেই ভয়। কিন্তু মিত্রা ভয়কে জয় করেছে, সংসারকে করছে উপেক্ষা। আমি তাকে শ্রদ্ধা করতে শিখলুম। বললুম, ভালোই যখন বাসেন, তখন বিয়ে করতে আপত্তি কী?

মিত্রা বলেছিল, তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। সে ভাবে, ঘুঁটে-কুড়োনীর দুঃখই দুঃখ, রাজকন্যার দুঃখ দুঃখ নয়। তার মন সমাজ-সচেতন। কিন্তু একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে সে বেঁকে গেছে। লোকটা এখন আর সুস্থ নয়।

চাওলার পরিচয় আমি আগেই পেয়েছিলুম। মিত্রা হয়তো সত্যি কথাই বলছে। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যান আমাকে বিস্মিত করেছে। মনের মিলটাই বড় কথা, মতের মিল নয়। মতের মিল হয়েও মনের মিল হয় না, কিন্তু মনের মিল হলে মতেরও এক দিন মিল হতে পারে। মতের মিল নেই অথচ সারা জীবন সুখে সংসার করলেন, এমন দম্পতি সমস্ত দেশে আছেন। তবু আমি প্রতিবাদ করি নি। ঋতাকে যা বলেছি, সেও প্রতিবাদ নয়।

অন্ধকারে সমুদ্র আর আকাশ মিশে গেছে। স্থির গম্ভীর সমুদ্র, তার ডাকও উদাত্ত গম্ভীর। চোখ বন্ধ করে আমি এই ডাক শুনি। এই ডাকে আমি আমার জীবনের ধ্বনি শুনতে পাই।

সে ধ্বনি মেঘের মতো অস্থির নয়, বিচিত্র নয়। বেলাভূমির উপর শুধু একটু উচ্ছলতা আছে, একটু হাসি। তার পরেই শান্ত সমুদ্র অকূল অনন্ত। তার অবিশ্রান্ত ধ্বনিতে আমি জীবনের গান শুনি।

স্বাতির কথা মনে পড়ে। মিত্রার মনোভাব স্বাতি সমর্থন করে না, ঋতারও করবে না। সে বলে, হৃদয় কি তিলে তিলে দেবার জিনিস, না এক বার দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেওয়া যায়। বন্ধুতা বাহিরের সম্পর্ক, হৃদয়ের সম্পর্ক যায় না অস্বীকার করা। কয়েকটি আনন্দের দিনকে আমি পথের সঞ্চয় রূপে গ্রহণ করতে চেয়েছিলুম। বলেছিলুম, এই দিনগুলি আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল।

বিস্মৃত প্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নাম-হারা স্বপ্নের মুরতি।

স্বাতি আমাকে কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিয়েছে, ভুল! এ দুর্বলের মনোভাব। আঙুর খেতে না পেয়ে তাকে টক ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা। আনন্দের মুহূর্তকে ধরে রাখবার চেষ্টাতেই তো পৌরুষ।

তার পর?

তার পর তার প্রিয় কবি ব্রাউনিঙের মতো আমি তার গলায় চুল জড়িয়ে তাকে হত্যা করতে পারি নি। কিন্তু সে বলেছিল, Who knows but the world may end tonight? আজ রাতেই যে পৃথিবীর শেষ হবে না কে জানে!

কিন্তু তার ইচ্ছায় পৃথিবী শেষ হল না, অথচ আমার অনিচ্ছায় আমাদের সম্পর্কের শেষ হয়ে গেল। সে বিয়ে করে বম্বে যাবে জো রায়ের ঘর আলো করতে, আর আমার উত্তরপাড়ার ঘর চিরজীবনের মতো অন্ধকারে পড়ে থাকবে। এ কথা কি স্বাতির এক বারও মনে হয় নি?

কেন হয় নি? জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা আজ মিথ্যা হয়ে গেছে। জীবনটারই যেন কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না।

স্বাতির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল দুর্ঘটনায়। বিপদে পড়ে তারা আমার সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। আমি এগিয়ে গিয়েছিলুম। তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, আমি জানিয়েছি ধন্যবাদ। কিন্তু মনে মনে আমি যে বাঁধা পড়েছিলুম, তা বুঝতে পারি নি। বরং উল্টো বুঝেছি। ভেবেছি, স্বাতি নিজেই বাঁধা পড়েছে। ভাল লেগেছে ভাবতে, নিজের গৌরবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি। কিন্তু পায়ের নিচে যে চোরাবালি ছিল তা বুঝতে পারি নি। ধীরে ধীরে সেই বালি সরে গেছে। জীবনটা আজ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের ডাক যে মিথ্যা, আমার তা জানা ছিল না। জীবনযাত্রায় পৃথিবীটাই বুঝি মিথ্যা হয়ে গেল।

ছি ছি, এ সব কথা আবার কেন আমার মনে আসছে! এই ভাবনা কলকাতায় আমাকে পীড়া দিয়েছে। এই ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই তো আমি এখানে পালিয়ে এসেছি! কোথাও কি আমি মুক্তি পাব না!

না, আর ভাবব না স্বাতির কথা।

কিন্তু ও কে আসছে! ঋতা নাকি! বিচিত্র নয়। এই মেয়েটার সঙ্গে কোথায় যেন আমি স্বাতির মিল দেখতে পাচ্ছি। স্বাতির মতো ছেলেমানুষ, কৌতুকপ্রিয়, হাস্যোচ্ছলা। জীবনে কোন বেদনা আছে কিনা জানি নে, কিন্তু অন্ধকার দিকটা সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছে। নিজের কথা কারও কাছে বলে না, শোনেও না নিজের কথা। অপরকে নিয়েই সারা ক্ষণ মেতে আছে।

ভেবেছিলুম, আমি পিছন ফিরে থাকব, তাকাব না কোন দিকে। ঋতা যদি আমার কাছে এসে থাকে, একেবারে এগিয়ে আসুক। স্বীকার করুক যে সে আমার জন্যই এখানে এসেছে। তবে আমি

তার দিকে মুখ ফেরাব। তা না হলে সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখব দু চোখ ভরে।

অনেক ক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু কাছে কেউ এল না। মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, যে আসছিল সে আমার পিছন দিয়ে চলে গেছে। সে ঋতা নয়, সে অন্য কোন মেয়ে।

সন্ধ্যার সমুদ্রবেলা নির্জন নয়। অনেকেই এমন করে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমি কেন মেয়েটিকে ঋতা ভাবলুম, কেন মনে করলুম যে সে আমার কাছে আসছে! এও কি আমার কোন দুর্বলতা নয়!

স্বাতির সম্বন্ধেও আমি এই রকম ভাবি। সেই বিলেত ফেরত ভদ্রলোককে আমি দেখি নি। মামীর কাছেই শুনেছিলুম যে স্বাতির বিবাহ স্থির হয়েছে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। অঘ্রাণেই বিয়ে। মামার কোন উৎসাহ দেখি নি। আর কালীঘাটের কালীকেষ্ট হালদার যে মন্তব্য করেছেন, তা নিতান্তই অশ্লীল। স্বাতি নিশ্চয়ই তা শোনে নি। তবু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রত্যাখ্যান যে করবে, আমি জানতুম। আমার কাছে সেই ভদ্রলোকের সম্বন্ধে সে যে মন্তব্য করেছে, তা শ্রদ্ধার নয়। কোন অশ্রদ্ধার পাত্রকে বিয়ে করে সুখে সংসার করা সম্ভব নয়। এই বিয়ে ভেঙে গেছে শুনেও আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলুম আমার মনে হয়েছিল, এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে স্বাতি হয়তো আমার কথাও ভেবেছিল।

দিল্লীতে মামী যখন রানার সঙ্গে স্বাতির বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন, তখনও আমার এই কথা মনে হয়েছিল। আমি ভাবতুম, এ বিবাহে স্বাতির সম্মতি নেই। স্বাতির আগ্রহের অভাবকে আমি নারীসুলভ লজ্জা বলে মনে করি নি, ভেবেছি এ তার মৌন আপত্তি। আমি উপস্থিত থাকতে আর কাউকে সে যেন পচ্ছন্দ করতে পারে না।

তারপর জো রায়। মামী তাঁকে পছন্দ করেছিলেন, কিন্তু স্বাতি করল না। এই কথা সে দৃঢ় ভাবে প্রচার করে দিয়েছিল। সৌরাষ্ট্রের মিঠাপুর থেকে জো রায়ের যাবার কথা ছিল কচ্ছে। কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হবার পর যেতে পারলেন না। মিঠাপুরে না নেমে গেলেন ওখা বেটদ্বারকা, সেখান থেকে সোমনাথেই হয়তো যেতেন। কিন্তু স্বাতি তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল। খানিকটা অসৌজন্য নিশ্চয়ই প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তাতে সে দ্বিধা করে নি। মামীর বকুনিকেও ভয় পায় নি। তাঁর ভৎ'সনা সে মেনে নিয়েছে মাথা পেতে। সেবারেও আমি ভেবেছিলুম যে আমার জন্যেই স্বাতি এ কাজ করেছে।

জো রায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এইখানে শেষ হয়ে যায় নি। বম্বের মালাবার হিলে আবার তাঁর দেখা পাওয়া গিয়েছিল। একটা মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন। আমি দেখেছিলুম, কিন্তু স্বাতির দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করি নি। সে নীচতা আমার নেই বলে গর্ব বোধ করি। স্বাতি দেখতে পেয়েছে কিনা জানতে পারি নি। দেখে থাকলেও সে আমার কাছে না দেখার ভান করেছে।

জো রায়ের মনে যে অপরাধ বোধ ছিল, তার প্রমাণ আমি পেয়েছিলুম। সেই মেয়েটিকে লুকিয়ে রেখে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ঠিকানা জেনে নিয়ে পরদিন আমাদের হোটেলে দেখা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

সকালবেলায় স্বাতি সবাইকে পুনায় টেনে নিয়ে গেল। জো রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে কিছুতেই রাজী হল না। তার পরদিনও ভোরবেলায় আমায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বুঝতে আমার বাকি থাকে নি যে জো রায়কে সে এড়িয়ে যাচ্ছে। আমার পাশে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে দাঁড়াতে দেবে না।

এমন কথা বার বার কেন মনে হয়েছিল জানি না। এ বোধ

হয় সকল পুরুষেরই দুর্বলতা। নিজেকে নায়ক ভাবতে পুরুষেরা বুঝি ভালবাসে।

এখন মনে হচ্ছে, জো রায়ও এই কথা ভেবেছিলেন। স্বাতি যখন সহসা আমাকে কলকাতার গাড়িতে তুলে দিয়ে জো রায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, নিশ্চয়ই দাঁড়িয়েছিল, তখন জো রায় শুধু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হন নি, ভেবেছিলেন এই তাঁর প্রাপ্য ছিল, স্বাতি একটু দেরিতে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে।

কিন্তু আমি আমার ভুল বুঝতে পারলুম আরও অনেক দেরিতে। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি সমুদ্রের ডাক শুনেছি। এত দিন যে ডাক শুনছি জীবনের গভীরে, আজ তাকে মিথ্যা মনে হচ্ছে। জীবনটাই কি মিথ্যা হয়ে যাবে!

সহসা আমার গম্ভীরার কথা মনে হল। সে দিন এই স্থানটি বড় ভাল লেগেছিল। চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতি জড়িত এই স্থানে বড় শান্তির সন্ধান পেয়েছিলুম। কিন্তু তা উপভোগের সময় পাই নি। ইচ্ছা হল, সেই স্থানে খানিকটা সময় কাটিয়ে আসি। জীবনের কোন সত্য কি সেখানে নেই!

আমি উঠে পড়লুম।

২২

গম্ভীরার অঙ্গনে প্রবেশের পূর্বেই কীর্তনের সুর কানে এল। গৌরাঙ্গের নাম গান হচ্ছে :

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে।

গানের সঙ্গে খোল করতাল আছে, হাতে তালিও দিচ্ছেন অনেকে।

আমার মনে হল, এ গান আমি আগে কোথাও শুনেছি। আর মনে মনে আমিও গেয়েছি সুর করে। সহসা আমার সে কথা মনে পড়ল না। তবু আমি শ্রোতার দলে গিয়ে বসলুম।

মনে পড়েছে। সে আমাদের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের গল্প। কাঞ্চীপুর থেকে আমরা চিঙ্গলপুট ফিরছিলুম। আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতেই খোল-করতাল নিয়ে চার জন বৈষ্ণব উঠেছিলেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণব, কণ্ঠে তুলসীর মালা, কপালে নাকে রসকলি।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই খোলে চাঁটি পড়ল আর করতালে মচমচানি। তৃতীয় ব্যক্তি গলাটা সাফ করে নিয়েই নামকীর্তন শুরু করলেন :

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

যাত্রীরা তামিল ভাষাভাষী, অর্থবোধ না হলেও কৌতূহলের বশে কিংবা সুরের মাহাত্ম্যে বেশ আকৃষ্ট হয়েছিল। চতুর্থ ভদ্রলোক হেলে দুলে হাতে তালি বাজাচ্ছিলেন। লক্ষ্য করে দেখলুম, যাত্রীদের ভিতরেও এক জন তাঁকে অনুকরণ করবার চেষ্টা করছিল।

যে ভদ্রলোক গাইছিলেন তাঁর গলাটি বড় মিষ্টি। বাকি তিন জনে ধুয়ো ধরেছিলেন। এখানে অনেক জন। সেদিনের

মতো আজও আমার শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কথা মনে পড়ল। তিনি এই গান গাইতেন, আর গৌরাঙ্গের অগণিত ভক্তকে এই নামই ভজনা করতে শিখিয়েছিলেন। বলতেন, প্রভু, তুমি শ্রীকৃষ্ণের নাম গান কর, কিন্তু আমি অন্য নাম গান করি।

সে কি আজকের কথা! পাঁচ শো বছর পুরো হতে আর বেশি বাকি নেই। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দুর্দশাক্লিষ্ট বাঙলায় গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে দোল-পূর্ণিমায় নদের নিমাই-এর উদয় হয়। চঞ্চল শৈশব উত্তীর্ণ হয়ে এল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে ভরা উদ্ধত যৌবন। কিন্তু গতানুগতিক জীবনে প্রথম পরিবর্তন এল গয়ায় পিতার পিণ্ডদান করে নবদ্বীপ ফেরার পথে। সেখানে দীক্ষা নিয়েছিলেন ঈশ্বরপুরীর নিকটে, আর সম্মোহিত হয়েছিলেন বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখে। আর দশ জন মহাপুরুষের জীবনেও যেমন জীবের দুঃখে প্লাবন আসে হৃদয়ের দু কূল ভরে, নিমাইয়ের জীবনেও এল সেই মুহূর্ত, উচ্ছল তরঙ্গ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সংসারের সংকীর্ণ গণ্ডির ভিতর থেকে। মা শচীমাতা কাঁদলেন, কাঁদলেন বিষ্ণুপ্রিয়া, আর কাঁদলেন নিত্যানন্দ ও অগণিত ভক্তবৃন্দ। নিমাই গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, নাম হল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

মহাপ্রভু জীবের মুক্তির জন্য গাইলেন :

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্॥

কিন্তু দেশের মানুষ নিত্যানন্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইল :

যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।

আজও এই বৈষ্ণবরা সেই নামই গাইছেন। কী মায়া কী মোহ এই নাম গানে!

আমার আরও অনেক কথা মনে পড়ল। সেই সুকণ্ঠ ভদ্রলোকের নাম শ্রীবাস। গানের মতো তাঁর মনটিও মিষ্টি।

ভাব হতে সময় লাগল না। আমরা ভ্রমণে বেরিয়েছি শুনে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন, তাঁরাও ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁরা গৌরাঙ্গদেবের পদচিহ্ন অনুসরণ করে আসছেন এবং ফিরবেনও তাঁরই পথে।

শ্রীবাসবাবু তাঁর পকেট থেকে নোট বুক বার করে একখানি মানচিত্র দেখালেন। ভারতের মানচিত্র, তাতে একটি পথ আঁকা। বললেন: মহাপ্রভুর ভারত প্রব্রজ্যার মানচিত্র। উত্তরে গৌড়, পূর্বে শ্রীহট্ট ও উত্তর-পশ্চিমে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি প্রথমে এলেন পুরী, পুরী থেকে রামেশ্বর, কন্যাকুমারী। তারপর মহারাষ্ট্র ও সৌরাষ্ট্র ভ্রমণ শেষ করে নর্মদা ও মহানদীর তীরে তীরে রসালকুণ্ড হয়ে পুরীতে ফিরে এসেছিলেন।

শুনেছিলুম, গোবিন্দদাস বা গোবিন্দ কর্মকার নামে এক ভক্ত মহাপ্রভুর ভৃত্য হয়ে তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরেছেন। তিনি নিতান্তই সাধারণ লোক ছিলেন এবং লেখাপড়াও জানতেন না বলে শুনেছি। কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দেখা জিনিস সাদা কথায় তাঁর কড়চায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মহাপ্রভুর ভারত ভ্রমণের উপর গোবিন্দদাসের কড়চা একখানি আদি ও অকৃত্রিম গ্রন্থ। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে শ্রীবাসবাবু আমার ধারণাকে মেনে নিলেন না, বললেন, গোবিন্দদাসের কড়চার রচনা ভঙ্গি সুন্দর, নিতান্ত আধুনিকও বটে। পুরোপুরি জাল না হলেও এতে যে অনেক ভেজাল আছে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে এই ছোট বইটিতে মহাপ্রভুর ভ্রমণ বিষয়ে অনেক নতুন কথা আছে।

একটু থেমে বললেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছিলেন পরম পণ্ডিত লোক। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তিনি যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখেছেন, তা লোকের মুখে শুনে। তাঁর কাব্যরস রসবেত্তার কাছে গভীর, কিন্তু ভ্রমণের ধারা সেখানে ব্যাহত হয়েছে। তাঁর বৃত্তান্তে পারম্পর্য রক্ষা হয় নি। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে লেখা এই

বইখানি আজও বাঙলা সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ রত্ন হয়ে আছে। এ শুধু জীবনী নয়, এমন উচ্চাঙ্গের দার্শনিক আলোচনা কোন বাঙলা বইএ দেখি নি। একে ইতিহাস বলব, না দর্শন বলব, না কাব্য বলব, তা কোন দিনই ভেবে পাই নি।

কীর্তনের আসরের পিছনের দিকে আমি একটু জায়গা পেয়েছিলুম। আমার মন ঐ নামের খেয়া বেয়ে সুদূর অতীতে গিয়ে পৌঁছল। নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত শচীমায়ের পায়ে ধরে কেঁদে আদায় করেছিলেন সন্ন্যাস নেবার অনুমতি। বলেছিলেন, তোমার কান্না আমি চোখ দিয়ে দেখি মা, কিন্তু মন দিয়ে শুনি পৃথিবীর মানুষের কান্না। সকলের চোখের জল আমি মোছাতে চাই। কাঁদতে কাঁদতেই শচীমা সম্মতি দিয়েছিলেন, তোমাকে চোখের আড়াল করে হয়তো বাঁচব, কিন্তু নিয়মিত সংবাদ না পেলে বাঁচব না। বেশি দূরে তুমি যেও না, আর সঙ্গে রেখো তোমার সঙ্গীদের—নিত্যানন্দ মুকুন্দদের। বৃন্দাবন? না না, বৃন্দাবনে নয়, নীলাচল পুরীতে। নবদ্বীপের লোক সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাই নীলাচল পুরীতে তাঁর জীবন কাটিয়েছিলেন।

সে আজকের কথা নয়। পাঁচ শো বছরেরও বেশী হবে সেই দিনের কথা। উড়িষ্যার পথ তখন দুর্গম ছিল। বাঙলার সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে। উভয় দেশের সৈন্য সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে। রাজা রামচন্দ্র খাঁর সৈন্যরা বাধা দিল তরুণ সন্ন্যাসীকে। কিন্তু নির্ভীক মহাপ্রভু ভয় পাবেন কেন! তিনি যাবেনই। রাজা তাঁকে নৌকোয় করে উড়িষ্যায় পাঠালেন।

ভাবে বিভোর হয়ে মহাপ্রভু পুরী এলেন। জগন্নাথের মন্দিরে যখন পৌঁছলেন, দ্বার রুদ্ধ করে তখন ভোগের আয়োজন হচ্ছে। নাটমন্দিরের দেওয়ালে হাত রেখে তিনি ভিতরটা দেখেছিলেন। আজও সেখানে তাঁর আঙুলের ছাপ আছে। অধীর মহাপ্রভু

অপেক্ষা করতে পারেন নি। নিষেধ অমান্য করে দেবতার পায়ে নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। ব্রাহ্মণেরা আর্তনাদ করে উঠলেন, এ কী হল, ভোগ অপবিত্র হল, দেবতা অশুচি হলেন। অচেতন চৈতন্যকে তাঁরা আক্রমণে উদ্যত হলেন। কিন্তু মহাপ্রভুকে রক্ষা করলেন রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু বাসুদেব সার্বভৌম।

গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ এই মহাপণ্ডিত দিগ্বিজয়ী বৈদান্তিক। তিনি মহাপ্রভুকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন, তাঁর সঙ্গীরাও আশ্রয় পেলেন। নিত্যানন্দের কাছে পরিচয় পেয়ে সার্বভৌম জানলেন যে চৈতন্য তাঁর বন্ধুর পুত্র, তাঁর পুত্রতুল্য। ভাবলেন যে শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবেই এই তরুণ সন্ন্যাসী ভাবে এমন অধীর হয় ও উন্মাদের মতো নৃত্য গীত করে। তাঁর বিশ্বাস হল যে বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করলেই চৈতন্যের এই মত্ততা দূর হবে।

নিত্যানন্দকে তিনি এই কথা বললেন, বললেন মহাপ্রভুকেও। বেশ। নিতান্ত ভাল ছাত্রের মতো মহাপ্রভুও বসলেন অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে। এক দিন দু দিন করে সাত দিন কাটল। কিন্তু মহাপ্রভু নিঃশব্দে শোনেন, বললেন না কিছু, মুখ দেখেও বোঝা যায় না তিনি কিছু বুঝছেন কিনা। শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন প্রশ্ন করলে না যে!

প্রশ্ন নেই।

কেন?

আপনি বেদান্তের ভুল ব্যাখ্যা করছেন।

ভুল ব্যাখ্যা! সার্বভৌমের সামনে যেন বজ্রপাত হল। ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক বেদান্তের ভুল ব্যাখ্যা করছেন, আর তা ধরিয়ে দিচ্ছে একজন উন্মাদ অর্বাচীন! ক্রোধে সার্বভৌম অন্ধ হলেন। বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হল সার্বভৌমের শিষ্যমণ্ডলী।

মহাপ্রভু শান্ত কণ্ঠে বললেন, শুনুন। আপনার বিদ্যার অহংকার পরিত্যাগ করলেই নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।

মহাপ্রভু একে একে প্রত্যেকটি শ্লোক আবৃত্তি করে তার ব্যাখ্যা শোনালেন। সবাই স্তম্ভিত হল, রাগে লজ্জায় ও ঘৃণায় ব্যথিত হলেন সার্বভৌম।

তারপর? বন্ধ ঘরে সারা রাত্রি যাপন করে সার্বভৌম নিজের ভুল বুঝলেন। পুঁথির পাতায় বুদ্ধির বিচারে নেই ভগবান। ভগবান নেই বিদ্যার দম্ভে কিংবা আচারের প্রাচীরে বদ্ধ। ভগবান ভক্তের, ভগবান প্রেমের, ভগবান আছেন আত্মনিবেদনের আনন্দে।

সার্বভৌম তাঁর ঘরের দুয়ার খুলে দিলেন। তাঁর প্রশস্ত অঙ্গন নন্দিত হল অনাদৃত অস্পৃশ্য জাতির অবাধ বন্দনায়। নিত্যানন্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সার্বভৌম নিজেও গাইলেন:

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে॥

কিন্তু এই গম্ভীরার সঙ্গে আর এক জনের নাম যুক্ত আছে। রাজা প্রতাপরুদ্রের কুলগুরু কাশী মিশ্রের নাম। মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করে ফিরলেন, তখন এই কাশী মিশ্র তাঁকে অতিথি রূপে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। বার-বাড়ির একটি ছোট কুঠুরি তিনি পছন্দ করলেন। এ দেশের ভাষায় এই রকম ঘরকেই গম্ভীরা বলে। এই গম্ভীরায় প্রবেশের অধিকার পেয়েছিলেন তাঁর দু জন ভক্ত। এক জনের নাম স্বরূপ দামোদর, আর এক জন রায় রামানন্দ। রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর পরিচয় হয়েছিল গোদাবরীতে। তিনি সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন।

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বেরবার ইচ্ছার পিছনে একটি ছোট কাহিনী আছে। তিনি যখন সার্বভৌমের বাড়িতে অতিথি, তখন তাঁর প্রীতির জন্য সার্বভৌম দুটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করে তাঁকে শোনান। সেই শ্লোকে তিনি মহাপ্রভুকে নারায়ণ বলেন।

মহাপ্রভু ক্ষেপে উঠেছিলেন, মিথ্যা স্তুতি প্রশংসা নয়, সে নিন্দারই নামান্তর। তারপরেই বলেছিলেন, অনেক দিন এক জায়গায় আছি। তীর্থ সন্ন্যাসীর পথ, আমি তীর্থে যাব।

এই তীর্থের পথে রায় রামানন্দ তাঁর কৃপা লাভ করেছিলেন। স্বরূপ আর রামানন্দ। গম্ভীরায় একান্তে নিভৃতে বসে এই দুটি মানুষ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গ লাভ করেছিলেন। কত কথা, কত চিন্তা, কত অনুভব। পাঁচ শো বছর আগের সেই মহৎ ইতিহাসের সাক্ষী এই পবিত্র গম্ভীরা।

উড়িষ্যার পরাক্রান্ত রাজা প্রতাপরুদ্র যখন রাজধানী থেকে দূরে শত্রুদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর মন্ত্রী মনে মনে রাজা হবার ফন্দি আঁটছিলেন। তাঁর একটা দলের দরকার, যারা তাঁকে সমর্থন করবে। মহাপ্রভুর জনপ্রিয়তা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। ভাবলেন, এই দলের উপর অত্যাচার শুরু করলে হয়তো মহাপ্রভুকে হাত করা যাবে। তাই তিনি অনেকের উপর অত্যাচার করেন। কিন্তু বেশি দিন পারেন নি। রাজা ফিরে এসে নিজেই ক্ষমতা গ্রহণ করলেন।

রাজা বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান। দেশের জনগণের মধ্যে যে এক নূতন চেতনা এসেছে, তা বুঝতে তাঁর মোটেই সময় লাগল না। মহাপ্রভুর কথা তিনি সব শুনলেন। শুনে বিস্মিত হলেন। গুরু সার্বভৌমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর পরিবর্তনটাও প্রত্যক্ষ করলেন। তারপর দেখলেন রায় রামানন্দকে। রামানন্দ পণ্ডিত, রামানন্দ কবি। রাজার বন্ধু তিনি। মহাপ্রভুর সংস্পর্শে এসে তাঁরও জীবনে পরিবর্তন এসেছে অসাধারণ। গৌড়ের জাদুকর সন্ন্যাসীকে দেখবার জন্য রাজা অধীর হলেন।

মহাপ্রভু দেশে ফিরতেই সার্বভৌমকে রাজা বললেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু মহাপ্রভু রাজী নন। রাজদর্শন স্ত্রীলোকের মুখ দর্শনের মতো। ও দেখতে নেই। রাজা

রামানন্দকে ধরলেন। রামানন্দ ধরলেন মহাপ্রভুকে। দেখা দিতেই হবে।—

রামানন্দ কহে, তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র।

ভয় নয় রামানন্দ, এ সন্ন্যাসীর ধর্ম।—

সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥

রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুকে দেখলেন রথযাত্রার দিন। জগন্নাথের রথ চলেছে, সঙ্গে চলেছেন সচল জগন্নাথ। রাজবেশে রাজা এসেছিলেন কাছে, মহাপ্রভু তাঁকে দূরে ঠেলে দিলেন। তারপর রাজা এলেন সাধারণ মানুষের মতো নিরাভরণ নগ্ন পায়ে। মহাপ্রভু তাঁকে কোলে টেনে নিলেন। এই তো আমার রাজা।—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা।

তৃণের চেয়ে সুনীচ ও তরুর চেয়েও সহিষ্ণু।

নবদ্বীপ থেকে যবন হরিদাসও এসেছিলেন। বসেছিলেন পুরীর বাহিরে পথের ধারে। মহাপ্রভু তাঁকে বুকে করে টেনে আনলেন, জায়গা দিলেন নিজের কাছে একটা কুঁড়ে ঘরে। সিদ্ধ বকুলের গল্প।

নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু নবদ্বীপে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। বড় কঠিন আদেশ। কাঁদতে কাঁদতে নিত্যানন্দ ফিরে যান।

মহাপ্রভু নিজেও এক বার নবদ্বীপে গেলেন। মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন, স্ত্রীকে দিলেন পায়ের পাদুকা। তারপর পুরীতে ফিরে এলেন।

সবাই দেখলেন, মহাপ্রভু অন্য মানুষ হয়ে এসেছেন। চলা-ফেরায় নাচে ও কীর্তনে সে মত্ততা আর নেই। মহাপ্রভু স্থির গম্ভীর হয়েছেন, কখনও কখনও ভাবে বিভোর হয়ে যান। ঘর থেকে বেরিয়ে যান, কোথায় যান সে খেয়াল থাকে না। ভক্তেরা

তাঁকে চোখে চোখে রাখবার প্রয়োজন বোধ করলেন, গোবিন্দকে প্রহরী নিযুক্ত করে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করলেন।

তবু তিনি হারিয়ে গেলেন এক রাত্রে। গোবিন্দ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জেগে উঠে গম্ভীরার শয্যা শূন্য দেখলেন। কোথায় মহাপ্রভু! খোঁজ খোঁজ। শেষ পর্যন্ত তাঁকে জেলেদের কাছে পাওয়া গেল। শেষ রাতে মাছ ধরতে বেরিয়ে মহাপ্রভুকে তারা জালে পেয়েছে। মহাপ্রভু হাসছেন।

আর এক দিনও এমনি ঘটনা ঘটল। গোবিন্দ দেখলেন যে মহাপ্রভু নেই। কোথায় তিনি! গম্ভীরায় নেই, মন্দিরে নেই, শহরেও নেই। ভক্তেরা সমুদ্রবেলায় খুঁজলেন, খুঁজলেন জেলেদের ঘরে ঘরে। সমুদ্রে জাল ফেললেন নানা জায়গায়। কিন্তু মহাপ্রভু নেই। তিনি হারিয়ে গিয়েছেন।

না না, তাঁর দেহটা শুধু হারিয়ে গেছে। মহাপ্রভু হারান নি। শুধু উড়িষ্যায় নয়, ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন বাঙলার গৌরব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অগণিত ভক্ত আজও গাইছেন :

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে॥

কীর্তন শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওঠবার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম। পিছনে ডাক শুনে চমকে উঠলুম। ঋতা বলছিল : উঠবেন না নাকি!

তাইতো!

আমার চমকানি দেখে ঋতা আজ হাসল না। কিন্তু এখানে সে কেন এসেছে, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। সে কথা বুঝি জানতে চাওয়া চলে না।

রাত নিশ্চয়ই গভীর হয়েছে।

২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতি কোনার্ক-দর্শনে আসছেন। সমস্ত পথ ঝকঝকে তকতকে করা হচ্ছে। নানা বাধা বিঘ্ন। অতএব কাল নয়, পরশু সকালে আমাদের কোনারক যাত্রা। রাতেই বাসওয়ালা এসে এই সংবাদ দিয়ে গেছে। ঋতা আরও একটি অবিশ্বাস্য সংবাদ প্রচার করেছে—রামানন্দবাবু যাবেন না, তিনি তাঁর নাম কাটিয়ে নিয়েছেন।

সকালবেলা তাঁর পরিবর্তন দেখে আমি আশ্চর্য হলুম। ভদ্রলোক আমার আগেই উঠেছেন, মুখ হাত ধুয়ে ঘরের মধ্যেই বসেছেন পুঁথিপত্র নিয়ে। গভীর মনোযোগে কিছু পড়ছেন। কাল রাতে তাঁর সঙ্গে কোন কথা হয় নি। খেয়েদের তিনি শুয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বিরাগের কারণ জানবার ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছা নিয়ে বললুম: নমস্কার।

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না, বরং বিরক্ত হলেন বলে মনে হল।

বললুম: আমার নামটাও কেটে দিয়েছেন তো?

ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন, বললেন: আপনাদের অসুবিধে করতে চাই নে।

সে কি, আমাদের আবার অসুবিধা কী!

সে আপনারাই জানেন।

বলে আবার বইএর পাতায় মনোনিবেশ করলেন।

ভদ্রলোক আঘাত পেয়েছেন বুঝতে পারি, কিন্তু কিসে পেয়েছেন টের পাই নি। বললুম: এ আপনার রাগের কথা।

রামানন্দবাবু রুক্ষ ভাবে বলে উঠলেন: এখানে আমি খেলা করতে আসি নি। আমার সময়ের মূল্য আছে।

এর উপর আর কথা চলে না। হয়তো বেয়াড়া কিছু করে বসবেন। সেই ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

বাহিরের চেয়ারে বসে নিগমবাবু সমুদ্রের রূপ দেখছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন : প্রফেসর সাহেবের কী হয়েছে ?

কেন বলুন তো ?

কাল থেকেই মেজাজটা কিছু চড়া দেখতে পাচ্ছি।

বললুম : লেখাপড়া করছেন।

লেখাপড়া তো আগেও করতেন !

আমরা নাকি অতিরিক্ত জ্বালাতন করছি। তাই আর আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবেন না।

ও।

বলে বুড়ো ভদ্রলোক চুপ করলেন।

আমি তাঁকে পেরিয়ে চায়ের জন্য ভিতরের বারান্দায় গেলুম। সেখানে আজ এক নূতন ভদ্রলোক চা খাচ্ছেন। আমাকে দেখে নমস্কার করে বললেন : বসুন।

বসবার আগে আমি তাঁকে নমস্কার করলুম।

ভদ্রলোক বললেন : আমার নাম জেনা।

জেনার উচ্চারণ একটু অদ্ভুত। ঠিক জেনা নয়, জানাও নয়, মাঝামাঝি একটা কিছু।

উত্তরে আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেই নিজের নাম বললুম।

জেনা বললেন : আপনিও কি বেড়াতে এসেছেন ?

অবান্তর প্রশ্ন। তবু বললুম : হ্যাঁ।

কেমন লাগছে ?

ভাল।

তা তো লাগবেই। সব চেয়ে আপনার কী ভাল লাগল ?

বললুম : নির্জনতা।

জেনা বুঝি আঁতকে উঠলেন, বললেন : সে কী কথা ?

বললুম : কলকাতার ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, তাই কোন নির্জন জায়গায় পৌঁছলে ভাল লাগে।

ভদ্রলোক বিহ্বল ভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন: এ রকম অদ্ভুত ভাল লাগার কথা আমি আগে কখনও শুনি নি।

বেয়ারা আমার চা এনে টেবিলে রেখেছিল। আমি কোন উত্তর না দিয়ে চায়ে চুমুক দিলুম।

জেনা বললেন: পুরীতে সবাই ভিড় দেখতে আসে, আর আপনি—

লোকে ভিড় দেখতে আসে!

পুরীতে সবচেয়ে বেশি লোক আসে রথযাত্রায়, আর নব-কলেবর যাত্রায়। তখন কি আর ঠাকুর দেখা হয়, তখন সবাই ভিড়ই দেখে।

নবকলেবর যাত্রার কথা আমি শুনি নি। কিন্তু তা শোনবার কোন আগ্রহ আমার হল না। ভদ্রলোক নিজেই হয়তো বলতেন, কিন্তু আমার বিরাগ দেখে নীরব হলেন।

এ আমার বিরাগ নয়, এ এক রকমের যন্ত্রণা। অস্থির মনটাকে আমি কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না। এর কারণ আমার কাছে অজ্ঞাত নয়, কিন্তু সেই কারণকে প্রশ্রয় দিতে না পেরেই এই যন্ত্রণা অনুভব করছি। চায়ের পেয়ালা তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করেই আমি উঠে পড়লুম।

জেনা বললেন: উঠলেন নাকি?

আমি সংক্ষেপে জানালুম: হ্যাঁ।

তারপরে আর আমি অপেক্ষা না করে হনহন করে বেরিয়ে এলুম।

সামনে সমুদ্রের বিশাল বিস্তার। বেলাভূমি জনশূন্য নয়, জনাকীর্ণও নয়। যাঁরা সূর্যোদয় দেখতে বেরিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরে আসছেন। আর যাঁরা প্রাতভ্রমণে বেরিয়েছেন, তাঁরা মন্থর গতিতে চলেছেন এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। আমি যে

একটুখানি নির্জন স্থান বেছে নিতে পারব, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তাই সিঁড়ি দিয়ে পথের উপর নেমে পড়লুম।

নিগমবাবু আমাকে লক্ষ্য করছিলেন, বললেনঃ আবার বেরোলেন ?

আবারই বটে। ঘরের ভেতর কিছুতেই যেন বসতে পারছি না। কাল সন্ধ্যাবেলায় সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সবাই যখন বিশ্রাম চাইছিলেন, তখনও আমি বেরিয়ে পড়েছিলুম। তখনও নিগমবাবু আমাকে বলেছিলেন, আবার বেরোচ্ছেন ?

কাল তাঁকে বলেছিলুম, সমুদ্রের হাওয়াটা ভাল লাগে। আজ সংক্ষেপে বললুম ঃ হ্যাঁ।

সম্মুখের পথটি পেরোলেই বিস্তীর্ণ বেলাভূমি। সমুদ্রের ধারে যেখানে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে, সেখানকার বালির সঙ্গে হয়তো মাটি আছে। তাই কিছু কঠিন। কিন্তু ঐ কঠিন মাটিতে বসবার উপায় নেই। সারাক্ষণ ভিজে। কলকল করে জল এসে বারে বারে ভিজিয়ে দিয়ে যায়। এত বড় সৈকতের কোনখানে একটি গাছ নেই। একটু ছায়া নেই। মাথার উপরে সকালের রৌদ্র ক্রমে প্রখর হবে, মধ্যাহ্নের সূর্য ছড়াবে আগুন। তার পর সায়াহ্নের রূপসজ্জা। উত্তাপের উপশম হয়ে স্নিগ্ধ হবে পরিবেশ, পশ্চিমের আকাশ হবে নানা রঙে রঞ্জিত। মনও রাঙা হবে।

আমারও কী হবে !

পায়ের চটি বালির ভিতর আটকে গেল। কোন রকমে সামলে নিয়ে আবার চলতে শুরু করলুম। জীবনেও এমনি করে হোঁচট লাগে, কোন রকমে সামলাতে হয়। আমি কেন কিছুই সামলাতে পারছি নে ?

একটি নির্জন জায়গায় এসে আমি বসে পড়লুম। সামনে অকূল সমুদ্র।. দাম্ভিক উদ্ধত। সারা ক্ষণ আপনার অস্তিত্ব প্রমাণে সচেষ্ট। ঢেউএর আঘাতে পৃথিবীকে নিপীড়িত করছে, আর গম্ভীর

গর্জনে ঘোষণা করছে আপনার জয়ধ্বনি। মনে হল, আজ এই গর্বিত সমুদ্রও আমাকে বিদ্রূপ করছে।

দিগন্তে এখন আকাশ ও জলের সীমানা দেখতে পাচ্ছি। সূর্যোদয়ের পূর্বে এই সীমানা দেখা যায় না। হয়তো সে কুয়াশার জন্য, কিংবা আলোর অস্পষ্টতায়। সে দিন প্রত্যূষে সূর্যোদয় দেখেছি। পূর্বের আকাশ থেকে প্রথমে অন্ধকার দূর হচ্ছিল। আলো ফুটছে। তার পরে রঙের খেলা শুরু হয়েছে আকাশে। নানা রঙের রঙীন খেলা। এই খেলা যখন শেষ হল, তখন মনে হয়েছিল আজ আর সূর্যোদয় হবে না। কিন্তু সূর্য উঠেছিল। হতাশ না হয়ে অপেক্ষা করে থাকার ফল পেয়েছিলুম। সে কথা আগেই বলেছি।

সমুদ্রের উপর সূর্যাস্তও দেখেছি। তার আগে সমুদ্রের নীল জল যেন সাদা হয়ে গিয়েছিল। এনামেল পেইন্টের মতো চকচকে সাদা। মাঝে মাঝে নীল রেখা। সূর্যাস্তের পরেও সেই সাদা জল ঠিক নীল হল না। ধূসর হল, কালচে হল।

আমার চোখের সামনে তরঙ্গ এসে ফুলে উঠছিল অজগরের ফণার মতো। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সেই ফণা। খানিকটা এগিয়ে এসেই ফেটে পড়ছিল। যেন সাদা ধবধবে জলের জলপ্রপাত। সেই জল গড়িয়ে পড়ছিল নিচের নীল জলের উপর। পারের দিকে ধেয়ে আসছে, আর ফেনায় সাদা করে দিচ্ছে ভিজে মাটি। সেখানকার বালিও জল বলে ভ্রম হচ্ছে।

এত বড় সমুদ্রে এই খেলা যেন খেলা নয়। এ চঞ্চলতা যেন চঞ্চলতা নয়। সমুদ্রের গর্জনকেও গর্জন বলে মনে হচ্ছে না। এত উদার এত বিরাট এই সমুদ্র যে তাকে আকাশের মতো অসীম শান্ত স্তব্ধ মনে হচ্ছে। নিজের কথা আমি ভুলে গেলুম, নিজের

বেদনা ও ভাবনার কথাও। বৃহতের সামনে এসে মানুষ বোধ হয় ক্ষুদ্রতাকে ভুলতে পারে।

সমুদ্রের জলে যে আমার পায়ের চটি ভিজে যাচ্ছিল, সে দিকে আমার খেয়াল ছিল না। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথায় আমি চমকে উঠলুম। পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেনঃ আপনার কাপড় যে ভিজে যাচ্ছে!

তাইতো!

আমি লজ্জা পেয়েছিলুম। তবু তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললুমঃ সমুদ্র এত বড় হলে কী হবে, আমার মতো ছোটর সঙ্গেও খেলা করতে ভালবাসে।

ভদ্রলোক সরে গেলেন না, আমার পাশে এসে বসে বললেনঃ বেশ বলেছেন কথাটা।

বললুমঃ মানুষ হলে বোধ হয় এমন করত না। নিজের সম্মানের জন্যেই একটু দূরত্ব বজায় রাখত।

ভদ্রলোক বিহ্বল চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আপনি খুব অদ্ভুত কথা বলতে পারেন।

আমি একটু সরে বসেছিলুম। বললুমঃ এ যুগে সত্য কথাটা একটু অদ্ভুত শোনায়।

এ কথার উত্তর ভদ্রলোক দিলেন না, বললেনঃ আপনাকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

তাই কি!

বললুম না যে আমার তা মনে হচ্ছে না।

তিনি বললেনঃ বোধ হয় কলকাতায় দেখেছি, কিংবা লোকাল ট্রেনে।

বলতে পারতুম যে কলকাতায় চাকরি করি, আর যাতায়াত করি লোকাল ট্রেনে। কিন্তু তা না বলে সংক্ষেপে বললুমঃ তা হবে।

ভদ্রলোক এবারে সরাসরি প্রশ্ন করলেন: আপনি কি উতোরপাড়ায় থাকেন?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?

ভদ্রলোকের মুখে চোখে প্রচুর গর্বের আভাস দেখতে পেলুম। নিজের চারি ধারটা তিনি ভাল করে দেখলেন, তারপর বললেন: আপনার নাম তো গোপালবাবু!

ঠিক কথা। কিন্তু—

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন: আরে শুনছ, তোমরা চলে যাচ্ছ কেন?

তিনি যে মহিলাকে ডাকলেন, তাঁকে আমি দেখতে পেলুম। খানিকটা তফাতে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। সঙ্গে বোধ হয় তাঁর পুত্র কন্যা। কন্যাটি বড়। ভদ্রলোকের ডাক শুনে তাঁরা আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

ভদ্রলোক বললেন: এখানে একা বসে কী করবেন, আমাদের হোটেলে চলুন। ভাল চা খাওয়াব।

বিস্ময়ের ঘোর আমার কাটে নি। আমি চিনি না অথচ আমাকে চেনেন, এমন লোকের কথা আমার স্মরণ হচ্ছে না। কিন্তু এই যোগাযোগের মধ্যে যে তৃতীয় ব্যক্তি আছেন, তাতে সন্দেহ রইল না।

মহিলা কাছে আসতেই ভদ্রলোক বললেন: দেখলে তো!

প্রসন্ন চিত্তে মহিলা বললেন: আমিও সন্দেহ করেছিলাম।

মেয়েটি মুখ নিচু করে ছিল, কিন্তু ছেলে বলে উঠল: না মা, তুমি তা বল নি।

এই বিচক্ষণতার প্রশংসা ভদ্রলোক একা আত্মসাৎ করে বললেন: আসুন আসুন।

না উঠে উপায় ছিল না। কিন্তু আমার মন তখন এই পরিবারকে আবিষ্কারের চেষ্টায় মগ্ন ছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে

পড়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে বললুম: আপনাদের বাড়ি কি চন্দননগর?

হ্যাঁ।

মিস্টার মুখার্জি আপনার নাম?

তারাপদ মুখুজ্জে। মুখুজ্জে বাড়ির নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?

হেসে বললুম: শুনেছি বৈকি।

মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তিনি আরও প্রসন্ন হয়েছেন। আমি মনে মনে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলুম।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কোথায় উঠেছেন?

হাত দিয়ে আমার হোটেলটা দেখিয়ে বললুম: সামনের ঐ হোটেলে।

ঐ হোটেলে! খরচ নিশ্চয়ই খুব বেশি?

এমন কিছু বেশি নয়, দিন টাকা পাঁচেক লাগবে।

ভদ্রলোক বললেন: এক জনের পাঁচ টাকা!

মহিলা বললেন: আপনি একা মানুষ, আমাদের মতো ঝঞ্ঝাট আপনার পোষাত না।

ঝঞ্ঝাট কিসের?

ঝঞ্ঝাট নয়! উনি তো তিন টাকায় একখানা ঘর পেয়ে ভারি খুশী। বেড়াতে এসেও আমি হাঁড়ি ঠেলছি।

ভদ্রলোক লজ্জিত ভাবে বললেন: ওকে হাঁড়ি ঠেলা বলে না। ইকমিক কুকারের রান্না আমার ভারি ভাল লাগে।

তা বলবে বৈকি। যার ঠাকুর রাখবার মুরোদ নেই, সেই বলে যে স্ত্রীর হাতের রান্না ছাড়া খেতে পারি নে। অমন প্রশংসার মুখে ছাই।

মেয়েটি বরাবরই চুপ করে আছে। ছেলেটি তার চেয়ে অনেক ছোট। এবারে বলে উঠল: আমাদের হোটেল থেকে সমুদ্র দেখা যায় না।

মহিলা বললেন: দেখবে কোথা থেকে, ফার্স্ট রোতে থাকলে তো দেখবে!

এও যে রাগের কথা, তা বুঝতে পারি। এ আমাদের সকলের কথা। মহিলা জানেন যে তাঁদের হোটেলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বসবাসের ব্যবস্থা দেখেই আমি তাঁদের অর্থ সঙ্গতির একটা মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারব। কাজেই তাঁরা যে সে ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নন, সেটুকু জানানোর ভিতরেও খানিকটা তৃপ্তি আছে।

মহিলা বললেন: আমি গোড়াতেই বলেছিলাম যে নিজে দেখে শুনে একটা ব্যবস্থা কর। তা না, কোন্ বন্ধুতে বলেছে, তারই কথায়—

ভদ্রলোক বললেন: কটা দিনই বা থাকব, তার জন্যে রাজ-প্রাসাদের কী দরকার!

পথ বেশি নয়, আমরা তাঁদের হোটেলের সামনেই পৌঁছে গিয়েছিলুম। মেয়েটি তরতর করে এগিয়ে গেল।

দরজার তালার চাবি ছিল ভদ্রমহিলার আঁচলে। তিনি ঘর খুলে দিলে আমরা ভিতরে গিয়ে বসলুম।

একখানা ঘরের ভিতরেই ছোট ছোট চারখানি তক্তাপোশ। ভিতরে চলাফেরার আর জায়গা নেই। আমরা সবাই খাটের উপরেই বসলুম।

ভদ্রলোক বললেন: মনোরঞ্জনবাবুর গণনা খুবই ভাল।

তাতে আর সন্দেহ নেই।

আমাকে বললেন, লক্ষ লোকের মধ্যেও আপনাকে চিনে বার করা শক্ত হবে না।

কী করে?

সমুদ্রের দিকে চেয়ে আপনি বালির ওপর বসে থাকবেন। ঢেউএর জলে জামা কাপড় ভিজে গেলেও আপনার মন সেদিকে যাবে না। এখন তার গণনা একেবারে নির্ভুল দেখছি।

মিসেস মুখার্জি স্টোভ ধরাচ্ছিলেন। সেই শব্দ পেয়ে মিস্টার মুখার্জি বলে উঠলেন : বেশ ভাল করে একটু চা খাওয়া তো মা সাবি।

আমার দিকে চেয়ে বললেন : সাবিত্রী আমার মেয়ে। খুব ভাল মেয়ে।

নামটিও খুব ভাল। আমাদের দেশে এর চেয়ে ভাল নাম আর নেই।

সাবিত্রী তার মায়ের আড়ালে যেন মিলিয়ে গেল। কিন্তু ছেলেটি বলে উঠল : দিদির এ নাম একটুও পছন্দ নয়।

পছন্দ নয় কিরে!

ওঠবার আগে আমি বলে এলুম : মনোরঞ্জনের গণনার প্রশংসা আমি আর করি না।

কেন?

বলেছিল, এই চাকরিতেই আমার উন্নতি হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতেই তো পারলুম না।

বিস্ফারিত চোখে ভদ্রলোক বললেন : চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন নাকি?

ওরাই ছাড়িয়ে দিচ্ছে।

ভদ্রলোক হাসবার চেষ্টা করে বললেন : বুঝতে পেরেছি। অন্যত্র কোন ভাল চাকরি পেয়েছেন।

তা নয়।

তবে নিশ্চয়ই ব্যবসায় নামবার ইচ্ছা।

মূলধন নেই।

তবে কি পুরোপুরি সাহিত্য করতে চান?

তাতে এক-জনের পেটই ভরে না।

চিন্তিত ভাবে মিসেস মুখার্জি বললেন : তবে?

সমুদ্রের ধারে বসে সেই কথাই তো ভাবি।

না না, আপনি বোধ হয় অকারণে এ সব কথা ভাবছেন। মনোরঞ্জনবাবু বলেছেন, আপনার উন্নতির দিন আসছে। তখন আপনি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে থাকবেন না।

হাসতে হাসতেই আমি বলে এলুম ঃ মনোরঞ্জন আজকাল বাজে কথাই বেশি বলে।

মুখার্জি দম্পতি হাসতে পারলেন না। হাসি তাঁদের অন্তর্হিত হয়েছে। নিজের সাফল্যে আমি আরও এক বার হাসলুম।

২৪

পথে নেমে প্রথমেই মনে হল, পুরীতে আর নয়, এবারে অন্যত্র পালাই। আমার দুর্ভাগ্য আমাকে অনুসরণ করে এসেছে। জীবনে যা চাই, তা পাই না। যা কোন দিন চাই না, তাই আমাকে গ্রাস করতে চাইছে। আমি মুক্তি চেয়েছিলুম, পেলুম বন্ধন। পৃথিবী আমাকে নানা প্রলোভনে বাঁধতে চাইছে। আমি তো ধরা দিতে চাই না।

কিন্তু কোথায় যাব? কলকাতায়? সেখানে যে এখন বড়দিন! বড়দিনের কলকাতাকে আমার ভয় করে। সেই ভয়েই তো এখানে পালিয়ে এসেছি।

আমাদের হোটেলের সামনে এসে আমি আশ্চর্য হলুম। সামনের বারান্দায় এখন নিগমবাবু নেই। তাঁর জায়গায় রামানন্দবাবু বসেছেন মিস্টার জেনার সঙ্গে। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন: আসুন গোপালবাবু, আপনার সঙ্গে মিস্টার জেনার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি যে কাজে এখানে এসেছেন, সে খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ, গোপনীয়ও বটে। আমি আপনাকে আড়ালে সে কথা বলব।

আড়ালে কেন?

সকলের সামনে সে কথা বলা ঠিক হবে না।

তা হলে তো না বলাই সব চেয়ে ভাল।

না না, আপনাকে বলার কোন বাধা নেই। আপনাকে তো আমরা ভাল করেই চিনি।

মিস্টার জেনা বললেন: গোপালবাবুর সঙ্গে আমার সকালবেলাতেই পরিচয় হয়েছে।

রামানন্দবাবু বললেন: তাই নাকি! কই, আমাকে তো বলেন নি!

বলবার সময় পাই নি।

যাই হোক, মিস্টার জেনার সঙ্গে আপনার বাইরের পরিচয়ই হয়েছে, তাঁর গুণের পরিচয় নিশ্চয়ই পান নি।

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না।

রামানন্দবাবু বললেন: মিস্টার জেনা খাঁটি উড়ে।

বলেই জিভ কেটে বললেন: এক্সকিউজ মি, উড়িষ্যাবাসী।

তারপরেই বাঙালী জাতকে গালাগালি শুরু করলেন: এমন বদ জাত এই বাঙালী যে নিজেরা কী পয়গম্বর তার ঠিক নেই, উড়িষ্যার লোককে উড়ে বলবেই। আর শুনে শুনে আমাদেরও মুখ আল্‌গা হয়ে গেছে।

মিস্টার জেনা বললেন: তাতে আর কী হয়েছে!

কী হয়েছে মানে! আপনি এমন ভাল লোক, আর আমি কিনা মুখ ফস্‌কে একটা—

বলে থেমে গেলেন।

রামানন্দবাবুকে আমি মনে করিয়ে দিলুম যে তিনি মিস্টার জেনার গুণের কথা বলেছিলেন।

রামানন্দবাবু বললেন: মনে আছে। আমি মিস্টার জেনার বাঙলা ভাষায় জ্ঞানের কথা বলছিলুম। কথাবার্তা শুনেছেন তো, না বলে দিলে বোঝবার উপায় নেই যে মিস্টার জেনা—

রামানন্দবাবু একটু থেমে কথাটা সম্পূর্ণ করলেন: একজন উড়িষ্যাবাসী।

মিস্টার জেনা বললেন: আপনারা তো আমার কথা শুনে আশ্চর্য হচ্ছেন, আমরা আশ্চর্য হয়েছি আপনাদের লেখা পড়ে।

রামানন্দবাবু যেন চমকে উঠলেন: আমাদের লেখা!

কথাটা আমিও ঠিক বুঝতে পারি নি। মিস্টার জেনা এবারে পরিষ্কার করে বললেন: আমি বাঙালীর ওড়িয়া ভাষায় বই লেখার কথা বলছি।

আমাদের অন্নদাশঙ্কর রায় শুনেছি এক কালে ওড়িয়া ভাষায় কবিতা লিখেছেন, আর অনুবাদ করেছেন। আরও দু এক জন নাকি ওড়িয়া ভাষায় বই লিখেছেন। কিন্তু মিস্টার জেনা যে নাম করলেন, তা আমার কাছে নূতন। রাধানাথ রায়ের নাম আমি কোন দিন শুনি নি। অথচ মিস্টার জেনা বললেন ঃ রাধানাথকে আমরা কবিসম্রাট বলি। অথচ তিনি একজন বাঙালী, প্রবাসী। আপনারা তাঁর বাঙলা কবিতা পড়েন নি?

রামানন্দবাবু অবিলম্বে স্বীকার করলেন ঃ না তো!

মিস্টার জেনা আমার দিকে তাকালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম ঃ তাঁর একখানা বইএর নাম করতে পারেন?

ভদ্রলোক ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে লাগলেন ঃ অনেক দিনের ব্যাপার, পরীক্ষার জন্যে মুখস্থ করা জিনিস কি আর মনে থাকে।

রামানন্দবাবু মেনে নিয়ে বললেন ঃ একেবারে খাঁটি কথা। বাঙলা সাহিত্যের বিষয় আমাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কিছুই বলতে পারব না।

কিন্তু মিস্টার জেনা বললেন ঃ তাঁর বইএর নাম বোধ হয় লেখাবলী, অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাইকেলি ঢঙে লেখা। শুনেছি, শুধু নবীনচন্দ্র নয়, আরও অনেক কবি এই কাব্যের প্রচুর প্রশংসা করেছেন।

রামানন্দবাবু বললেন ঃ তবে তিনি বাঙলা ছেড়ে ওড়িয়া ধরলেন কেন?

সে অন্যের ইচ্ছায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় নাকি তাঁকে ওড়িয়া ভাষায় কবিতা লিখতে উৎসাহিত করেন।

মিস্টার জেনা পরিষ্কার বাঙলায় কথা বলছিলেন। এবারে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওড়িয়া বোঝেন?

না।

এমন কিছু শক্ত ভাষা নয়, মনোযোগ দিয়ে শুনলেই বুঝতে

পারবেন। শুনুন।—

পঙ্কজ বাসিনি দেবি, উৎকল ভারতি,
সারলে, কি কলে, কহ কুরু চূড়ামণি,
শুনিলে যে কালে বীর বার্তাহর মুখে
প্রভাসে যাদবক্ষর—

বাধা দিয়ে রামানন্দবাবু বললেন: এ যে মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের মতো শুনছি!

মিস্টার জেনা বললেন: এ তাঁর মহাযাত্রা মহাকাব্য। এই কাব্য রাধানাথ শেষ করে যেতে পারেন নি। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন ওড়িয়া কাব্যে। মহাযাত্রা কোন নূতন কাহিনী নয়, মহাভারতের মহাপ্রস্থানের কাহিনী। শুধু কী ছিল তা নয়, কী চলে গেল। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে ভারতের গৌরব হল অন্তর্হিত। আধ্যাত্মিক অবনতিতে কলির আবির্ভাব হল।—

মানবে কেবল
নামকু মানব রহি পশুঠারু হীন
হোই যিবে যুগধর্মে ভারত মণ্ডলে।

রামানন্দবাবু বললেন: সাহিত্য আপনার খুব প্রিয় বোধ হচ্ছে!

একদা প্রিয় ছিল। এখন এক মাত্র প্রিয় বস্তু চাকরি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: রাধানাথ রায় কি ওড়িয়া ভাষার প্রথম কবি?

মিস্টার জেনা বললেন: ইনি আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের প্রথম কবি। প্রাচীন সাহিত্যে কয়েকখানি অপূর্ব গ্রন্থ আছে। রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত। রামায়ণ লিখেছেন বলরাম দাস, মহাভারত সারলা দাস ও ভাগবতের লেখক জগন্নাথ দাস। এঁরা তিন জনেই কৃষ্ণ চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে লিখেছেন। এঁরা

ছাড়াও আরও কয়েক জন লেখক আছেন—দীনকৃষ্ণ দাস ভক্তচরণ দাস কবিসূর্য ব্রহ্ম গোপালকৃষ্ণ অভিমন্যু সামন্ত সিংহার। সব চেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন উপেন্দ্র ভঞ্জ। কেন না তিনিই কাব্যকে পুরাণের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। এই ভঞ্জকবি ছিলেন আপনাদের ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক।

বাঙলা দেশের মতো উড়িষ্যাতেও ইংরেজ মিশনারিরা এসে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে, ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন করে, এমন কি সাহিত্য-সভাও প্রতিষ্ঠা করে। ওড়িয়া গদ্যের জন্ম কিন্তু এর আগের ঘটনা। ব্রজনাথ বড় জেনা ভাল গল্প-লেখক ছিলেন।

ব্রজসুন্দর দাস ও বিশ্বনাথ দাস ক্ষমতাশালী সম্পাদক ছিলেন। তাঁদের সাহিত্য সমালোচনার এমন গুরুত্ব ছিল যে তাঁদের রায় না মেনে লেখকদের উপায় ছিল না।

আমার মনে হল যে সকল দেশের নিষ্ঠাবান সমালোচকই এই রকম মর্যাদা পেয়েছেন। ইংরেজী সাহিত্যের ডক্টর জনসন তার প্রমাণ। বাঙলাতেও নজির আছে।

মিস্টার জেনা কিছু ভাবছিলেন।

রামানন্দবাবু বললেন: থামলেন কেন?

কার কথা বলছিলাম যেন!

দুই দাসের কথা।

না না, তার আগে।

আমি বললুম: রাধানাথ রায় থেকে আধুনিক সাহিত্যের শুরু।

খুশী হয়ে মিস্টার জেনা বললেন: মনে পড়েছে।

রামানন্দবাবু কিন্তু খুশী হলেন না, বললেন: তাঁর কথা তো শেষ হয়ে গেছে!

হয় নি। রাধানাথের কবিতার বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি। ইংরেজ কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের মতো তিনি শুধু প্রকৃতির কবি নন, তিনি ব্যক্তি ও সমাজ-সচেতন। সামাজিক কুসংস্কারের

তিনি নিন্দা করেছেন, পরাধীনতার জন্ত তাঁর বেদনা বোধ ছিল গভীর। তিনি গল্পও লিখেছেন। তাঁরই লেখা একটি গল্প আমাদের কথাসাহিত্যের প্রথম নিদর্শন।

দ্বিতীয় কবি মধুসূদন রাও গীতি-কবিতার প্রথম কবি। ভক্তিমূলক গান লিখে তিনি ভক্তকবি নামে পরিচিত হয়েছেন। প্রথম জীবনে তিনি প্রবন্ধ ও গল্প নিয়ে সাহিত্যের আসরে নামেন।

এ যুগের তৃতীয় লেখক ফকিরমোহন সেনাপতি। তিনি প্রথম গল্প লেখেন নি, প্রথম উপন্যাসও না। তবু তাঁকে ওড়িয়া কথাসাহিত্যের জনক বলা হয়। প্রথম সার্থক উপন্যাস তাঁরই হাতের রচনা। নানা দিকে তাঁর কলম চলেছে। উপন্যাস গল্প ভ্রমণকাহিনী আত্মজীবনী অনুবাদ। এমন কি কবিতাও লিখেছেন।

রামানন্দবাবু বলে উঠলেন: এ দেখছি রবি ঠাকুরের মতো!

মিস্টার জেনা বললেন: রাধানাথ কবিসম্রাট, কিন্তু ফকিরমোহন শরৎচন্দ্রের মতো কথাসাহিত্যিক। সাধারণ মানুষের জীবন যুদ্ধের কথা লিখেছেন সহজ ভাষায়। সাহিত্যে কথ্য ভাষারও প্রচলন করেছেন। ছ মান আঠ গুণ্ঠ তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এতে দরিদ্র চাষাকে জমিদার কি ভাবে শোষণ করে, তারই কাহিনী বলা হয়েছে।

কথাসাহিত্যে ফকিরমোহনের পরে নাম করতে হয় কালিন্দী-চরণ পাণিগ্রাহীর। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে উড়িষ্যায় যে সাহিত্য আন্দোলন হয়েছিল, তাকে সবুজ আন্দোলন বলা চলে। কয়েক জন শক্তিশালী লেখক হৃদয়ের ওপরে বুদ্ধিকে স্থান দিতে চেয়েছিলেন, আবেগের পরিবর্তে যুক্তিকে। ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে এঁরা আধুনিক হবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা যে সংস্থার প্রতিষ্ঠা করলেন, তার নাম সবুজ সাহিত্য সমিতি। সবুজ কবিতা নামে একটি কবিতার সংকলন প্রকাশ করলেন, ন জনে মিলে উপন্যাস

লিখলেন বাসন্তী। এই দল যাঁরা গড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে তিন জন পরবর্তী যুগে খ্যাতি লাভ করেছেন—কালিন্দীচরণ, বৈকুণ্ঠ পট্টনায়ক অন্নদাশঙ্কর রায়। অন্নদাশঙ্কর অবশ্য ওড়িয়া ভাষা ছেড়ে বাঙলায় সাহিত্য সাধনা শুরু করেন।

কালিন্দীচরণকে আমি কলকাতায় বক্তৃতা দিতে শুনেছি। একটা সাহিত্য-সভায় সর্বভারতীয় লেখকদের একত্র সমাবেশ হয়। আমি তাঁকে সেইখানে দেখেছিলুম। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ তুলে মিস্টার জেনাকে আমি বাধা দিলুম না।

মিস্টার জেনা বললেন: মাটির মনীষ উপন্যাসের নাম শুনেছেন?

রামানন্দবাবু বললেন: না।

আপনি?

মিস্টার জেনা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমিও বললুম: জানি নে।

মাটির মনীষ কালিন্দীচরণের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। শুধু কালিন্দীচরণের নয়, সমগ্র ওড়িয়া ভাষায় এমন সার্থক উপন্যাস আর নেই।

সত্যি!

রামানন্দবাবুর কৌতূহল মিস্টার জেনা সমর্থন করে বললেন: একেবারে সত্যি। অতি সাধারণ জীবনযাত্রার বিষয় অতি অসাধারণ ভাবে পরিবেশন করেছেন।

রামানন্দবাবু মন্তব্য করলেন: নিঃসন্দেহে এ খুব কঠিন কাজ।

তার চেয়েও কঠিন কাজ সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রে সমান ভাবে বিচরণ। শুধু উপন্যাস ও গল্প নয়, কালিন্দীচরণ কবিতা নাটক ও প্রবন্ধ লিখেও খ্যাতি অর্জন করেছেন।

মিস্টার জেনা বললেন: সবুজের কথায় আমি কয়েক জন বিশিষ্ট লেখকের কথা বাদ দিয়ে ফেলেছি। কথাসাহিত্যিক গোপালচন্দ্র প্রহরাজ তাঁদের মধ্যে প্রধান। সরল হাসির লেখা লিখে ইনি পাঠকচিত্ত জয় করেছেন। শুধু কাহিনী বয়নে নয়, চরিত্র চিত্রণেও

তাঁর অদ্ভুত দক্ষতা। অসংখ্য শব্দের একখানি ভাষাকোষ সম্পাদনা করে ইনি সবাইকে বিস্মিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার রাজশেখর বসুর কথা মনে এল। বাঙলায় ইনি পরশুরাম ছদ্মনামে হাসির লেখায় পাঠককে মুগ্ধ করেছেন, আবার স্বনামে চলন্তিকা অভিধান প্রণয়ন করে বর্তমান বাঙলা ভাষার এক বিস্ময় সৃষ্টি করেন। গোপালচন্দ্রকে আমার উড়িষ্যার পরশুরাম বলে মনে হল। বাঙলার পরশুরাম অবশ্য গোপালচন্দ্রের মতো উপন্যাস রচনা করেন নি, রামায়ণ মহাভারতের সারানুবাদ করে এক স্থায়ী কীর্তি স্থাপন করেছেন।

কবিদের মধ্যে চিন্তামণি মহান্তি গঙ্গাধর মেহের গোপবন্ধু নীলকণ্ঠ দাস গোদাবরীশ মিশ্র পদ্মচরণ পট্টনায়ক লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। মহিলা লেখিকা কুন্তলা কুমারী সাবৎ অকালে মারা না গেলে আরও উঁচুতে স্থান পেতেন। আহ্বান নামে তাঁর এক কাব্যগ্রন্থ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। কয়েকখানি কবিতার বই ছাড়াও তিনি একখানি ভাল উপন্যাস রচনা করে যান।

রামানন্দবাবু যেন আর্তনাদ করে উঠলেন: সব গুলিয়ে গেল।

আমি তাঁর দিকে তাকাতেই বলে উঠলেন: খাতা পেনসিল নিয়ে বসলে টুকে নিতে পারতাম।

মিস্টার জেনা বললেন: এ সব কথা তো বইএ পাবেন।

সে তো আপনাদের ভাষায়।

আমি বললুম: অনেকগুলি নাম আপনি এক সঙ্গে বলে গেলেন কিনা, তাই মনে রাখা অসম্ভব হবে।

মিস্টার জেনা বললেন: তবু দেখুন, নন্দকিশোর বলের নাম করি নি। অথচ ইনিই প্রথম পাড়াগাঁয়ের জীবন নিয়ে কবিতা লেখেন। দেশাত্মবোধ দেখা দেয় গোপবন্ধু ও তাঁর দুই সহকর্মী নীলকণ্ঠ দাস ও গোদাবরীশ মিশ্রের লেখায়। উড়িষ্যায় যে দৈনিক কাগজ আজ সর্বাধিক প্রচারিত, সেই সমাজএর প্রতিষ্ঠাতা গোপবন্ধু

নিজেই তার সাম্পদক ছিলেন। শুধু দেশনেতা বা সাংবাদিক নন, তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি। কবিতার সঙ্গে সঙ্গে নীলকণ্ঠ দাস ভারতের সংস্কৃতির ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন, আর সে যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্র নবভারতের সম্পাদনা করেছেন।

মিস্টার জেনা বোধ হয় এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রামানন্দবাবু বললেন: আরও কয়েকটি নাম বলেছিলেন।

বলেছিলাম। কবি গোদাবরীশ মিশ্র কয়েকখানি ভাল নাটক লিখে খ্যাতি লাভ করেন। পট্টনায়কের গাথা ও মহাপাত্রের গান ও ব্যঙ্গ কবিতাও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

রামানন্দবাবু বলে উঠলেন: এত নাম আমি মনে রাখতে পারব না। আপনি আর এক বার বলবেন, আমি টুকে নেব।

উত্তরে মিস্টার জেনা বললেন: এ পর্যন্ত তো কিছু নাম বলতে পেরেছি। কালের বিচারেই বেশি নাম বাদ পড়ে গিয়েছে। আধুনিক যুগে এলে সাহিত্যের সমালোচকও ঘাবড়ে যাবেন।

কেন?

ভিড়। মানুষের নয়, লেখকের। মনে হবে দেশের সমস্ত লোকই যেন লিখছে। শেষ পর্যন্ত কে টিকবে, সে কথা কেউই জানে না। যিনি লিখছেন, তিনিও জানেন না।

এ কথা সব ভাষাতেই সত্য। সব দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা এমন ঘটনা দেখেছি। দেশে ও বিদেশে সাহিত্যের এক একটা আন্দোলন হয়েছে। তাতে কত লেখকই না যোগ দিয়েছেন। বেঁচে আছেন এক আধ জন মানুষ। আমেরিকার সাহিত্যে নোংরামি আনবার জন্য যে বিরাট আন্দোলন হয়েছিল, সেই লস্ট জেনারেশনের মাত্র এক জন লেখক যশস্বী হয়েছেন। তাঁর নাম আর্নেস্ট্ হেমিংওয়ে। ইনি আন্দোলন চালিয়ে বিখ্যাত হন নি, ছেড়ে হয়েছেন। অশ্লীলতার বদলে জীবনের গভীর সত্যকে অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করে বিশ্বকে উপহার দিয়েছেন। সেই আন্দোলনের

যুগে সব কটা নাম বোধ হয় সমান ভাবে উচ্চারিত হত। আজ একটি নামের জন্যেই বোধ হয় সেই আন্দোলনের কথা বেঁচে আছে।

মিস্টার জেনা বললেন : এ কালের লেখকদের কথা আমাকে বলতে বলবেন না।

রামানন্দবাবু বললেন : না না, আপনি না বললে আর কে বলবে বলুন।

কিন্তু—

আর কিন্তু না। মোটামুটি একটা ধারণা হলেই আমরা খুশী। কী বলেন গোপালবাবু ?

বলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি তাঁকে সমর্থন করলুম নীরবে।

মিস্টার জেনা একটু ভেবে বললেন : ইংরেজীতে বোধ হয় দি বোটম্যান বয় আপনারা পড়েছেন।

রামানন্দবাবু তাড়াতাড়ি বললেন : না।

এটি শচী রাউত রায় নামে এক জন কবির লেখা একটি দেশপ্রেমের কাহিনীর ইংরেজী অনুবাদ। এই লেখা এক সময় যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। কিন্তু তাঁর পরবর্তী গল্প উপন্যাস কবিতায় আর সে রকম ধার নেই। কবিতা আমি পড়ি না। তবে শুনতে পাই, কবিতা অনেকেই লেখেন। আপনাদেরই কলকাতা থেকে কবিতা নামে একখানি ওড়িয়া পত্রিকা বার হয়। তাতে লিখে সবাই হাত পাকাচ্ছেন।

রামানন্দবাবু বললেন : আপনি একেবারেই সংক্ষেপে সারলেন।

সত্যি কথা কি, আমি মাত্র দু তিনটে নাম জানি। তাঁরা ভাল লেখেন, না মন্দ, তা জানি নে। সেই জন্যেই নাম বলতে চাই নে।

এ তো পরীক্ষা নয়, আর আপনি বক্তৃতাও দিচ্ছেন না। ভয় কী ?

তা বটে। ডক্টর মায়াধর মানসিংহের কয়েকটি প্রেমের কবিতা

পড়েছি। রাধামোহন গড়নায়ক নামে এক জন কবি নাকি নানা ঢঙে কবিতা লেখেন। আর গোদাবরীশ মহাপাত্র নামে এক জন কবি স্বাধীনতা লাভের পর সময়োচিত একটি কবিতা লেখেন। সেটি আমার ভাল লেগেছিল। এর পরে অতি আধুনিকের দল। তাঁদের কাউকেই জানি না। লিখছেন কলকাতার কাগজে।

মিস্টার জেনা একটু ভাবলেন, তারপর বললেন : এই গোদাবরীশ মহাপাত্র ভাল ছোট গল্প লেখেন। দুঃখী-দরিদ্র সমাজের ছবি এঁর কলমে ভাল ফোটে। তবে বান্নুচরণ মহান্তি এঁর চেয়ে জনপ্রিয়। লেখেনও বেশি। পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর লেখা তাঁর হা অন্ন উপন্যাস আমার ভাল লেগেছে। তাঁর ভাই গোপীনাথ মহান্তির লেখা পরজা উপন্যাসটিও আমি পড়েছি। আদিবাসীদের জীবন-চিত্র। আমার ভাল লেগেছে।

তারপর ?

তারপর রাজকিশোর রায় অনন্তপ্রসাদ পাণ্ডা নিত্যানন্দ— এঁরাও উপন্যাস লেখেন। তবে কাহিনীর চেয়ে মনস্তত্ত্বে এঁদের ঝোঁক বেশি।

আমি প্রশ্ন করলুম : নাটক কী রকম জনপ্রিয় ?

ভাল। কটকে দুটি রঙ্গমঞ্চ আছে, আর একটি দল ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে বেড়ায়। প্রধানত এদের প্রয়োজনেই নাটক লেখা হচ্ছে। রামশঙ্কর রায় প্রথম দিকের নাট্যকার। তাঁর কাঞ্চী-কাবেরী গত শতাব্দীতে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর গোদাবরীশ মিশ্র ও ভিখারীচরণ পট্টনায়ক। রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় হয়েছে অশ্বিনীকুমার ঘোষের ঐতিহাসিক নাটকগুলি। তাঁকে আপনারা উড়িষ্যার ডি. এল. রায় বলতে পারেন।

ভাত নামে একটি নাটক আছে। এটি সমাজের সমস্যা নিয়ে লেখা। লেখক কালিচরণ পট্টনায়ক। তাঁর লেখা অনেক নাটক আছে। সব নাম আমি জানি নে, সব লেখকের নামও না।

রামানন্দবাবু অনুনয় করে বললেন: একটি নামও বলবেন না?

ঐ যে বললাম, যাঁদের নাম জানি তাঁরা কেমন লেখেন তা জানি নে।

শুধু নামই বলুন।

মিস্টার জেনা একটু ভেবে বললেন: অদ্বৈতচরণ মহান্তি ভঞ্জকিশোর পট্টনায়ক মনোরঞ্জন দাস—

মিস্টার জেনা আরও নাম মনে করবার চেষ্টা করছিলেন। আমি তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে বললুম: নামের আর দরকার নেই। আপনি বরং গদ্যসাহিত্যের কথা সাধারণ ভাবে বলুন।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন: সেই ভাল।

তার পরেই বললেন: এ আরও বিপদের কথা।

কেন?

গদ্য লিখে নাম করা সবচেয়ে কঠিন। শুধু গদ্য লিখে নাম করা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

রামানন্দবাবু বললেন: গল্প উপন্যাসও তো গদ্য।

তাঁদের কথা তো ফুরিয়ে গেছে। এবারে আমরা প্রবন্ধ সমালোচনা ইতিহাস বা অনুবাদের কথা ভাবছি। হ্যাঁ, এক জনের নাম মনে পড়েছে। হরেকৃষ্ণ মহতাব। এ নাম আমার অনেক আগেই মনে পড়া উচিত ছিল। দেশের এক জন যোগ্য নেতা হিসেবে তিনি সমস্ত ভারতবাসীর কাছে সুপরিচিত। কিন্তু তিনি যে এক জন ওড়িয়া ভাষার বিশিষ্ট লেখক, এ কথা সকলের জানা নেই। শুধু কয়েকখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখেই ক্ষান্ত হন নি, অনেক কবিতা ও কয়েকখানি উপন্যাসও লিখেছেন। উড়িষ্যার সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন হয়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গে আমার রাজনৈতিক নেতাদের কথা মনে এল। তাঁদের অনেকেই বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট লেখক। মহাত্মা গান্ধী, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত নেহরু,

কানাইয়ালাল মুনশী এবং আরও অনেকের জন্যে সাহিত্যের আসরে বিশেষ আসন নির্ধারিত হয়েছে। হরেকৃষ্ণ মহতাবকেও এঁদেরই মতো এক জন বলে মনে হল।

মিস্টার জেনা বললেন: দেশবিদেশের সাহিত্য থেকে অনুবাদ খুবই কম। প্রভাসচন্দ্র সৎপথী কয়েকখানি বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। আরও কয়েকজন অনুবাদ করছেন। কয়েকখানি সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয়েছে, আর কিছু প্রবন্ধ ও সমালোচনার—

ভদ্রলোক তাঁর কথা সম্পূর্ণ করতে পারলেন না। বড় একখানা তোয়ালে কাঁধে ফেলে ঋতা বার হচ্ছিল। কটাক্ষে আমাদের এক বার দেখে নিয়েই জিজ্ঞাসা করল: আসবেন না?

প্রশ্নটা কাকে করল বোঝা গেল না। কিন্তু উত্তর দিলেন রামানন্দবাবু: আমাকে ডাকছেন?

ঋতা কোন উত্তর না দিয়ে হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

রামানন্দবাবু চেঁচিয়ে বললেন: দাঁড়ান একটু, আসছি আমি।

বলেই ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন।

মিস্টার জেনা বললেন: আপনাদের পরিচিত বুঝি?

আমি সংক্ষেপে বললুম: হ্যাঁ।

রামানন্দবাবু স্নানের জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলেন। কাপড় পরেছেন মালকোঁচা দিয়ে। গায়ে গেঞ্জি আছে। আর কোমরে একখানা গামছা বেঁধেছেন শক্ত করে। যাবার সময় আমাকে বললেন: আপনিও আসুন না।

বললুম: আমাকে ডাকে নি।

তাতে কী হয়েছে!

বলতে বলতেই রামানন্দবাবু ছুটলেন। ঋতা যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে!

২৫

মিস্টার জেনা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি যাবেন না?

বললুম : না।

সমুদ্রে স্নান বুঝি আপনার ভাল লাগে না?

ঠিক তা নয়। আজ তেমন উৎসাহ পাচ্ছি না।

এই সময় ঋতার দাদা ও বৌদি বার হচ্ছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন: আপনি একা বসে আছেন যে! আপনার সঙ্গী কোথায়?

বললুম : সমুদ্রে গেছেন।

আপনি যাবেন না?

একই প্রশ্ন। বললুম : আজ থাক।

যাবার জন্য আমাকে তাঁরা জোর করলেন না। কিন্তু নিগমবাবু নাছোড়বান্দা। নিজে ঘরের ভিতর স্নান খাওয়া সেরে বাইনকুলার হাতে বেরোলেন। তারপরেই বললেন: আরে, আপনি এখনও বসে আছেন! স্নান করতে যান নি!

আজ ঘরে স্নান করব।

সে কি মশাই, এই বয়সে ঘরে স্নান! আমাদের মতো বুড়ো হলে তো করতেই হবে, এখন কেন করবেন! উঠুন উঠুন।

সমুদ্রে এখন স্নানার্থীর ভিড় হয়েছে। আরও অনেক নরনারী বালি পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে চলেছে। লম্বা ঠোঙার মতো সাদা টুপি পরা নুনিয়াদের ব্যস্ত দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ঋতা বা রামানন্দবাবুকে এখন চিনতে পারছি না। ভিড়ের মধ্যে তাঁরা মিলিয়ে গেছেন। কিন্তু নিগমবাবু সবাইকে দেখবেন, চিনবেনও সবাইকে। চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে তিনি বসবেন। সমুদ্রের

সৌন্দর্য দেখায় হয়তো ক্লান্তি আছে, কিন্তু স্নানার্থীর বিচিত্র বিলাসে অশেষ কৌতূহল আছে।

আমি যেখানটায় বসেছিলুম, নিগমবাবু সেই স্থানটিই দাবী করলেন। আমি না উঠলে তিনি বসবেন না। আমি সমুদ্রে না গেলেও আমাকে উঠতে হবে। কাজেই উঠে পড়লুম।

বসবার আগে নিগমবাবু বললেন: হাত তুলে কেউ চেঁচাচ্ছেন না?

সমুদ্রের ধার থেকে কোন শব্দ আসছে না, শুধু ভঙ্গিটি দেখতে পাচ্ছি। নিগমবাবু বাইনকুলার তুলে চোখে লাগালেন। ফোকাস করাই আছে। বললেন: আপনার সঙ্গী আপনাকে ডাকছেন।

তাই নাকি!

বলে আমি তাঁর বাইনকুলার চোখে লাগালুম। সত্যিই রামানন্দবাবু। ভিজে কাপড় জামায় উপরে উঠে ডাকছেন। ঋতা পাশে নেই। একটু ঘোরাতেই তাকে জলের ভিতর দেখতে পেলুম। ঢেউএর দিকে তার একাগ্র দৃষ্টি। এই ডুবল। তার মাথার উপর দিয়ে গেল বড় ঢেউটা। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাকে আবার দেখতে পেলুম। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখের জল মুছছে। রামানন্দবাবু আমাদের দেখতে পেয়েছেন কিনা জানি না, আবার গিয়ে জলে নামলেন।

নিগমবাবু আমার হাত থেকে বাইনকুলারটা নিয়ে বললেন: যান।

প্রথম দিনের কথা আমার মনে পড়ল। সমুদ্রের কাছে যাবার জন্য সে দিন আমায় কেউ ডাকে নি। শুধু সমুদ্রই ডেকেছিল। আর বারান্দায় চেয়ারে বসে রামানন্দবাবু আমাকে বার বার বারণ করেছিলেন, ভয় দেখিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ছেলেমানুষ বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছিলেন। ঘটনা আজ অন্য রকম হল। আজ ঋতা আমাদের ডেকে গেল। যে ভদ্রলোক সমুদ্রের ধারে যেতে ভয় পান, তিনি সেই ডাকে ছুটে গেলেন। আমি বসে রইলুম।

আজ আমাকে মিস্টার জেনা যেতে বলছেন, নিগমবাবু বলছেন। কিন্তু যেতে আমার মন চাইছে না।

ঘরের ভিতরে গিয়ে স্নানের জন্য আমি তৈরি হয়ে নিলুম। খালি গা, খালি পা। গায়ে গামছা জড়িয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলুম।

সমুদ্রের নামে কেন আমি সাড়া দিলুম না, সেই কথা আমার মনে এল। ঋতাকে আমি ভয় পাই, না রামানন্দবাবুকে! ভয়, না অন্য কিছু! না, এ আমারই দুর্বলতা। একটা সমস্যার সামনে দাঁড়াবার সাহস ছিল না, তাই এখানে পালিয়ে এসেছি। আর নিজেই নিজের সমস্যার সৃষ্টি করছি। এই মুহূর্তে রামানন্দবাবুকে আমার সাহসী বলে মনে হল। জীবনের প্রয়োজনে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, প্রয়োজন হলে আবার ফিরে আসবেন। এই ফিরে আসার ভয়ে তিনি আড়ষ্ট হয়ে নেই। সতর্ক হবার নামে আমি ভীরু হয়েছি, কাপুরুষ হয়েছি। জীবনের সমতল অঙ্গনে পা ফেলছি খোঁড়ার মতো ভয়ে ভয়ে।

খানিকটা দূরে আমি সকালের সেই ভদ্রলোককে দেখলুম সপরিবারে। তাঁরাও স্নান করতে এসেছেন। আমাকে দেখতে পেয়েছিলেন কিনা জানি না, দেখতে পেলেও হয়তো কথা কইবেন না। রক্ষণশীল পরিবার। আমার কথায় যে ভয় পেয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। দেশে ফিরে ভাল করে খোঁজ খবর না নিয়ে সহসা আর এগোবেন না।

জলের কাছে পৌঁছে রামানন্দবাবুর কাণ্ড দেখে আমার হাসি পেল। কোন রকমে হাঁটু জলটা পার হয়েছেন, নুনিয়ার হাত ধরেও কোমর জল পর্যন্ত যেতে পারছেন না। ঋতা তার বৌদিকে ধরে টানছে, আর হাসছে। তিনিও সে দিনের মতো হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন।

ঋতা বলছে : ছি ছি, এত ভয় তোমার বৌদি! সমুদ্র কি তোমাকে খেয়ে ফেলবে!

বৌদি বলছেন : কী হচ্ছে ঋতা, কথা দিয়ে তুমি কথা রাখছ না!

আমি দেখলুম, ঋতা তাঁকে জোরে আকর্ষণ করছে না, হাত ধরে টানবার ভান করছে যেন। আর বলছে : কী কথা দিয়েছি?

কথা দাও নি, আমার যেখানে ইচ্ছে সেইখানেই স্নান করতে দেবে!

কথা দিয়েছি বলেই তো তোমাকে হাঁটু জলে দাঁড়াতে দিচ্ছি।

আমি দেখলুম ঋতা রামানন্দবাবুকে শুনিয়ে বলছে : ছি ছি, কী লজ্জা, কী লজ্জা! সমুদ্রে স্নান করতে এসে কি কেউ হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে থাকে!

আমি আজ শুকনো বালির উপরে বসলুম না। সোজা গিয়ে জলে নামলুম।

রামানন্দবাবু তাঁর নুনিয়াকে ধমক দিচ্ছিলেন : টানছ কেন? দেখছ না, পায়ের তলায় বালি কেমন সরে যাচ্ছে!

সেই জন্যেই তো এগোতে বলছি।

এগোলেই হল আর কি! তার পরে কে সামলাবে! ঢেউ তো তোমার একার মাথার ওপর দিয়া যাবে না!

আমি জলে নেমে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। আস্তে আস্তে বললুম : মেয়েটা কী বলছে, শুনতে পেয়েছেন?

রামানন্দবাবু চমকে ফিরে তাকালেন। তারপর নিশ্চিন্ত হলেন আমাকে দেখে। জিজ্ঞাসা করলেন : কী বললেন?

মেয়েটা কী বলছে শুনতে পেয়েছেন কি?

কোন্ মেয়ে?

আরও আস্তে বললুম : ঋতা।

আমাকে কিছু বলছে নাকি?

বলে বিব্রত হয়ে উঠলেন।

বললুম : আপনার সাহস দেখে হাসছে, আর বলছে, কী লজ্জা, কী লজ্জা !

রামানন্দবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন : তাই বলছে !

বলেই এক ঝটকা দিয়ে নুনিয়ায় হাত ছাড়িয়ে নিলেন। তার পরেই নির্ভীক ভাবে এগোতে লাগলেন। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম : এ কী করছেন ?

আর কী করছেন ! এক কোমর জল ছাড়িয়েও এগিয়ে গিয়েছিলেন, আর একটা ঢেউ আসছিল মাথার উপর দিয়ে। নুনিয়া লাফিয়ে গিয়ে হাত ধরে বলল : ডুব দিন তাড়াতাড়ি।

রামানন্দবাবু ডুব না দিয়ে লাফালেন আমাদের মতো। তার ফলে হাবুডুবু খেয়ে বিপর্যস্ত হলেন। নুনিয়া শক্ত হাতে ধরে ছিল বলে কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। তাঁর নাকে মুখে খানিকটা নোনা জল ঢুকেছিল। হাঁচতে হাঁচতে আমার কাছে ফিরে এলেন।

ঋতা তখনও তার বৌদির হাত ধরে টানছে আর চেঁচাচ্ছে : কী মজা, কী মজা !

রামানন্দবাবু এক বার পিছন ফিরে দেখলেন, তার পর করুণ ভাবে বললেন : আমাকে বলছে না তো !

আমি হ্যাঁ বললে তিনি খুবই আঘাত পাবেন, কী জানি বললেও মর্মাহত হবেন। তাই বললুম : যাকে ইচ্ছে বলুক, আমাদের কী !

যা বলেছেন !

কিন্তু রামানন্দবাবু বিমর্ষ হয়েই রইলেন।

আমি এগিয়ে গেলুম কয়েকটা ডুব দেবার জন্য। নুনিয়া প্রশ্ন করল : আসব ?

বললুম : না।

এক দিনেই আমার খানিকটা অভ্যাস হয়েছে। আমি কতকটা স্বচ্ছন্দে ঢেউএর সঙ্গে খেলা করতে লাগলুম। দৃষ্টি সামনে রেখে

বেশ সতর্ক থাকতে হয়। আমি সতর্ক ছিলুম। পাশে হঠাৎ ঋতার গলা শুনে আশ্চর্য হলুম। ঋতা বলল: বন্ধুকে কেমন দেখলেন?

একটা বড় ঢেউ আসছিল, বললুম: আগে সামলাই নিজেকে, তার পর উত্তর দেব।

ডুব দিয়ে উঠে দেখি, পাশে ঋতা নেই। তার পা ফসকে গেছে। নুনিয়াদের মতো তার হাত ধরে আমি তাকে সোজা করে দিলুম। হেসে বললুম: পিছিয়ে আসুন।

রামানন্দবাবু হাতে তালি দিয়ে নাচতে লাগলেন: শাবাশ শাবাশ!

আমি পিছিয়ে এলুম ঋতার সঙ্গে। বললুম: কাকে বলছেন?

রামানন্দবাবুর আনন্দ যেন ধরে না, বললেন: বলছি সমুদ্রকে। শাবাশ শাবাশ!

ঋতা যে লজ্জা পেয়েছে, তা দেখতে পেলুম। তার বৌদি উঠে যাচ্ছিলেন। তাঁকে ডেকে বলল: দাঁড়াও বৌদি, আমিও যাচ্ছি।

তার দাদা বললেন: আজ এরই মধ্যে উঠবি!

তিনিও ফিরছিলেন। কাজেই ঋতার উত্তর দেবার আর দরকার হল না।

তারা চলে গেলে রামানন্দবাবু বললেন: উত্তরটা ঠিক দিয়েছি?

একেবারে ঠিক।

ভাল করে গল্প করবার জন্য রামানন্দবাবু আমাকে আরও পিছনে টেনে আনলেন। বললেন: মেয়েটা যে বেহায়া তাতে আপনার সন্দেহ আছে?

না।

না?

আপনাকে অমন করে বলা তার উচিত হয় নি।

বললেই বা, মিথ্যে কিছু তো বলে নি।

তা ঠিক।

ঠিক মানে?

ঠিক নয় বুঝি!

রামানন্দবাবু আমার মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন, বললেন: আজ আপনার মাথার ঠিক নেই নাকি?

কেন বলুন তো?

সমস্ত কথা কেমন গোলমেলে বলছেন!

ঠিকই ধরেছেন।

তবে আপনাকে ডেকে ভাল করি নি। আমি ডাকতুম না। ঐ মেয়েটাই বলছিল, আপনার বন্ধু আসবে না? ডাকুন না তাকে এবারে চলুন ফিরে, খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

ফেরবার পথে আবার বললেন: মানুষের মাথাই হল আসল জিনিস। ঐ মাথার জন্যেই নাম মানুষ। মাথার অযত্ন করতে নেই। দরকার হলে এক শিশি—

না না, তার দরকার নেই। একটু বিশ্রাম করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

হলেই ভাল।

রামানন্দবাবুকে বড় চিন্তিত দেখাল।

২৬

দুপুরের আহারের পরে রামানন্দবাবু আজ এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না। বললেন: অনেক অমূল্য সময় নষ্ট করেছি, আর নয়।

মিস্টার জেনা সহাস্যে বললেন: একটু ঘুমোবেন তো! স্বাস্থ্যোদ্ধারে এসে দিবানিদ্রাটা উপকারী।

রামামনন্দবাবু চমকে উঠলেন: বলেন কি মশাই, আপনার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল!

কেন?

এ রকম শাস্ত্র বিরুদ্ধ বাক্য বলছেন! মা দিবা—

পরের শব্দটি রামানন্দবাবু ভুলে গেছেন। আমিও মনে করিয়ে দিলুম না। কিন্তু মিস্টার জেনা বললেন: ও সব উপদেশ পুঁথির ভেতর থাক। যথাসময়ে পোকায় কাটবে। কী বলেন গোপালবাবু?

নিজের মতামত আমি প্রকাশ করলুম না। বললুম: রামানন্দবাবু একটা গুরুতর বিষয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর কাছে সময়ের মূল্য আছে।

রামানন্দবাবু প্রীত হলেন এবং একটু গর্বিত ভাবে প্রস্থান করলেন।

মিস্টার জেনা হাই তুলছিলেন। তাই দেখে আমি বললুম: আপনারও যে ঘুম পেয়েছে দেখছি।

ভদ্রলোক বললেন: আর একটু পরে উঠব।

আমার ইচ্ছা হল, এই সুযোগে আর কিছু তাঁর কাছে জেনে নিই। কিন্তু কী জানতে চাইব? দেরি করলে ভদ্রলোক হয়তো উঠেই পড়বেন। তাই তাড়াতাড়ি বলে ফেললুম: এ দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হল। কিন্তু আর কিছু জানা হল না।

কী জানতে চান বলুন!

এই ধরুন—

কী ধরব?

এই মানুষ সম্বন্ধেই ধরুন না, কিছুই তো জানা নেই!

ভদ্রলোক বললেন: এ দেশের মানুষের ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। আদিবাসী বলে একটি নতুন শব্দ সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে। তার মানে আমি ঠিক বুঝি নে।

কেন?

শব্দটার মানে কঠিন নয়। দেশের প্রথম মানুষ যারা, তারাই আদিবাসী কিন্তু ঠিক এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার হয় কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আদিবাসী বলতে আমরা দেশের অশিক্ষিত বুনো জাত বুঝি নাকি?

কঠিন প্রশ্ন। বললুম: আদিবাসীরা বুনো না হলেও গেঁয়ো বটে। কিন্তু তাদের মধ্যেও ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রচলন হচ্ছে।

সে অন্য কথা। আমার প্রশ্নটা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন।

ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাচ্ছি না। উত্তর আমার জানা নেই।

তাই বলুন।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন: তবে একটা চুরট ধরাই, কী বলেন? আপনার চলে তো?

হাত জোড় করে বললুম: আজ্ঞে না।

সে কি!

বলে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন ও একটা মোটা চুরট ধরিয়ে আবার বেরিয়ে এলেন। বুঝতে পারলুম যে তিনি এখন ঘুমোবেন না এবং শ্রোতাটি তাঁর পছন্দ হয়েছে। বেশ জাঁকিয়ে বসে বললেন: আদিবাসী শব্দটি আজকাল ইংরেজীতেও চলেছে। ব্যাক্‌ওয়ার্ড ক্লাস, ডিপ্রেসড্ ক্লাস বলা উচিত নয়। তার চেয়ে দেশী আদিবাসী শব্দটি শুনতে অনেক মধুর। সরকারী কাগজে

শেড্যুল্ড্ কাস্ট্ ও শেড্যুল্ড্ ট্রাইব বলে দুটি কথা আছে। একটির মানে হরিজন ও অন্যটি বোধ হয় আদিবাসী। তাদের জন্য সরকারী চাকরিতে সংরক্ষিত পদ। উপযুক্ত প্রার্থী না পেলে পদ খালি রাখতে হবে, যা-তা লোক দিয়ে ভরা চলবে না।

মিস্টার জেনা খানিক ক্ষণ ধূমপান করলেন, তারপর বললেন: এই সব ব্যাপার নিয়ে কিছু দিন আগে যে মামলা মোকদ্দমা হল, সে বিষয়ে শুনেছেন নিশ্চয়।

না।

শোনেন নি! খুবই কৌতুকের কথা। এক জন জুনিয়ার কর্মচারী প্রমোশন পেল শেড্যুল্ড্ কাস্ট্ বলে। তার সিনিয়ররা মামলা করে দিল। মহামান্য হাইকোর্ট সব শুনে রায় দিলেন যে চাকরিতে প্রথম ভর্তির সময় এ সব কথা চলতে পারে, কিন্তু তার পরে নয়। কাজেই হুকুম পাল্টাও। সরকার বাহাদুর বিপদ দেখে সুপ্রিম কোর্টের শরণ নিলেন। রায় পাল্টে গেল। অর্থাৎ হরিজনের জয়! মাহাত্মা গান্ধীর জয়!

আমি আশ্চর্য হবার মতো করে বললুম: বলেন কি!

এর বেশি বলা ঠিক নয়, বিপদের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যে কথায় এই কথা এল, তাই বলি। এ দেশে শতকরা ছেষট্টি জন লোক আদিবাসী। আদিবাসী বলতে এ দেশের আদিম বাসী বোঝায় কি না বলতে পারব না, যাদের বোঝায় তারা এখনও আদিম বাসীর মতো আছে। সাঁওতাল মুণ্ডা ওরাওঁ গোঁদ কাঁধ হো ভুইয়াঁ জুয়াং চিনঝল ভূমিজি সুধা সভয়া পারোজা। এদের বেশির ভাগ আছে ময়ূরভঞ্জ সুন্দরগড় ও গঞ্জাম জেলায়। অনেকে আবার বাইরেও যাচ্ছে। বাঙলা ও আসামের চা বাগানে এদের দেখেছেন তো? কাঁধ ওরাওঁ মুণ্ডাদের?

চা বাগান আমি দেখি নি।

আই সী!

বলে মিস্টার জেনা খানিক ক্ষণ চুরট টানলেন। তারপর বললেন: খনিতেও এরা কাজকর্ম শুরু করেছে। ময়ূরভঞ্জ কেওনঝড় ও সুন্দরগড়ের লোহা ম্যাঙ্গানিজ ডলমাইট ও লাইম-স্টোনের খনিতে অসংখ্য সাঁওতাল কোল ওরাওঁ ও মুণ্ডা কাজ করছে।

বললুম: এদের জীবনযাত্রার সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

মিস্টার জেনা বললেন: আমারও নেই। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। এদের এক জাতের সঙ্গে আর এক জাতের সব রকমের মিল নেই। আবার এক জাতের স্থান ভেদেও গড়মিল আছে। প্রত্যেক জাতের জীবনযাত্রায় এমন স্বাতন্ত্র্য আছে, যা তারা নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করে। এক সময় ধর্মকে মানুষ যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে আঁকড়ে থাকত, এরা তেমনি এদের সামাজিক রীতি-নীতিকেও আন্তরিক সম্মান করে।

আশ্চর্য!

সত্যিই আশ্চর্য। সভ্যতার প্রসারে আমাদের ধর্ম শিথিল হয়েছে। সেই সঙ্গে সামাজিক নীতি ও ব্যক্তিগত সততা। আমাদের সরকার এই আদিবাসীদের দুঃখ দূর করবার জন্য তাঁদের পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করবেন। এদের আর্থিক দুর্গতি হয়তো দূর হবে, সেই সঙ্গে তাদের মনুষ্যত্বও দূর হতে পারে।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন: মরুক গে, এ সব আমার চিন্তার কথা নয়।

আমারও নয়। তাই আমি বললুম: উড়িষ্যার আদিবাসীর সংখ্যা হল শতকরা ছেষট্টি জন। বাকি রইল চৌত্রিশ। তারা কে?

তারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অন্যান্য জাতি। ইতিহাসে পড়েছি যে প্রায় হাজার বছর আগে কোন রাজা কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণ

আনিয়েছিলেন। এক আধ জন নয়, দলে দলে ব্রাহ্মণ এসেছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য। এক সম্বলপুরে শুনেছি ছয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে। উৎকল শ্রেণী নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আরণ্যক শ্রেণী নিজেদের প্রাচীনতম ভাবেন। তাঁরাই নাকি বনজঙ্গল কেটে সম্বলপুরে প্রথম বসবাস শুরু করেন। রঘুনাথিয়ারা স্থানীয় অধিবাসী, রামচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে তাঁরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ভীমগিরিয়ারা এদেরই মতো। হালুয়া আর সারুয়ারা চাষী ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণদের এত শ্রেণীর নাম আমি শুনি নি। আমি জানি বৈদিক রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর নাম। এঁদের মধ্যেও অনেকে কনৌজ থেকে এসেছেন।

মিস্টার জেনা বললেন: আমি তো শুধু সম্বলপুরের ব্রাহ্মণের কথা বললাম। উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের নাম সসানি। রাজারা এঁদের জমিজমা দিয়ে সম্মান করেছেন। কনৌজ ছাড়াও ভারতের অন্য স্থান থেকে ব্রাহ্মণ এসেছেন। মধ্যদেশের কৌশাম্বি ব্রাহ্মণ ও উত্তর বঙ্গের বারেন্দ্রি ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণদের মতো অন্য অনেক জাত এসেছে বাইরে থেকে। কায়স্থ ও করণরা এসেছে রাজাদের নিমন্ত্রণে। করণ হল কেরানীর জাত। সম্বলপুরের আঘরিয়া চাষারা এবং ভুলিয়া তাঁতীরা নাকি আগ্রা ও দিল্লী থেকে এসেছে। মুসলমান আমলে অনেক মুসলমানও বিদেশ থেকে এসেছে। এ দেশ একদা শান্তির দেশ ছিল, আর রাজারা উৎসাহ দিতেন নানা শিল্পকর্মে। বিদেশীরা তাই নিমন্ত্রণ পেলেই চলে আসত।

মিস্টার জেনা বললেন: এ দেশের লোকের সম্বন্ধে দুটি কথা আপনাকে মানতে হবে। প্রথম কথা হল, জাতের বালাই এ দেশে নেই। ভারতের কোনখানে যা সম্ভব হয় নি, এখানে তা অনেক ঘটেছে। অন্যখানে মানুষের জাত গেছে, এ দেশে মানুষ জাতে

উঠেছে। রামায়ণের যুগে রামচন্দ্র কাউকে ব্রাহ্মণ করে গেছেন কিনা জানি না, কিন্তু বিদ্যার্জন করে মানুষ ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়েছে। আর শক্তিমানরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছে ক্ষত্রিয় রূপে। সমাজ তা মেনে নিয়েছে। তারপর উঁচু নীচু জাতের মধ্যে বৈষম্যের অভাব। এ বোধ হয় জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য।

আমার মনে হল, এ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রভাব। জাতির ভেদাভেদ জ্ঞান তাঁর কোন দিন ছিল না। সকল মানুষকে তিনি এক জাত ভাবতেন। সেই তাঁর ধর্ম। নিজের জীবন দিয়ে তিনি এ দেশে মানুষের ধর্মই প্রচার করে গেছেন। কিন্তু আমি কোন কথা বললুম না।

মিস্টার জেনা বললেন: দ্বিতীয় কথা হল, এ দেশের লোক বড় আইন মান্য করে। হাজারে একটা লোকও আদালতে মামলা দায়ের করে কিনা সন্দেহ। গ্রামের ঝগড়াঝাঁটি গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হরিজন ও আদিবাসীরা তো নিজেদের পঞ্চায়েতের উপরে কিছু আছে বলেই জানে না। আজকাল আদালতে যে দু একটা মামলা চলে, তা একটু উঁচু স্তরের শিক্ষিত সমাজের ব্যাপার।

ভদ্রলোক হয়তো আরও কিছু বলতে পারতেন। কিন্তু বাধা পেলেন ঋতার কথায়। ঋতা কখন এক সময় বাহিরে বেরিয়েছিল দেখতে পাই নি। কী করছিল তাও জানি নে। হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল: আপনার বন্ধু কোথায়?

আমার বন্ধু!

হ্যাঁ, আপনার।

রামানন্দবাবু! তাঁকে আবার দরকার কেন?

ঋতা খিলখিল করে হেসে উঠল। আর আমরা দু জনেই বিস্মিত হলুম।

হাসি থামিয়ে ঋতা বলল: কিছু শুনতে পাচ্ছেন?

একটু উৎকর্ণ হতেই আমি শুনতে পেলুম। এ তো সমুদ্রের ডাক নয়, এ তাঁরই নাক ডাকছে। রামানন্দবাবু ঘুমোচ্ছেন। আমি উঠে গিয়ে তাঁকে দেখে এলুম। বিছানায় শুয়ে তিনি আজ ঘুমোচ্ছেন না। ঘুমোচ্ছেন চেয়ারে বসে। সামনের টেবিলে তাঁর বই খাতা খোলা। এখানে তিনি গবেষণা করতে এসেছেন।

মিস্টার জেনা নিজেও শুনতে পেয়েছিলেন। তিনিও প্রবল উদ্যমে হেসে উঠলেন। উড়িষ্যার মানুষের গল্প আমাদের আর শোনা হল না।

২৭

ঋতা বলল : সারা দুপুর আপনারা কী গল্প করছেন ?

আমি এ কথার উত্তর দিলুম না, দিলেন মিস্টার জেনা : কাজ না থাকলে মানুষ ঘুমোয় কিংবা গল্প করে। গল্প এমন জিনিস যে তার শেষ নেই।

বেশ বলেছেন।

কিন্তু ঠিক বলি নি।

কেন ?

গল্পের শেষ নেই, কিন্তু মানুষের ক্লান্তি আছে। কখনও বক্তা ক্লান্ত হয়, কখনও শ্রোতা।

ঋতা বলল : কিন্তু আপনাদের কাউকে ক্লান্ত বলে আমার মনে হচ্ছে না।

তা ঠিক। এখনও পর্যন্ত আমি একা বক্তা, আর গোপালবাবু শুধুই শ্রোতা। আমি ক্লান্ত হলে গোপালবাবু কিছু বলার সুযোগ পাবেন। তখন আমি শুনব।

আমি শুনতে পারি ?

ঋতা প্রশ্ন করে দু জনের দিকেই তাকাল।

মিস্টার জেনা বললেন : স্বচ্ছন্দে।

আমি বললুম : কিন্তু বিষয়বস্তু খুব শ্রুতিমধুর নয়।

ঋতা একখানা চেয়ার দখল করে বলল : আপনাদের হরিজন আদিবাসীদের কথা নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে !

লজ্জিত ভাবে মিস্টার জেনা বললেন : আপনি শুনছিলেন বুঝি ?

শেষটুকুই শুধু শুনতে পেয়েছি।

তা হলে সবটুকুই শোনা হয়েছে।

কী রকম ?

এ দেশের মানুষের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। ব্রাহ্মণের কত শ্রেণী, আর আদিবাসী কত জাতের, তা না জানলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। কিন্তু যে দুটি কথা শুনতে মন্দ লাগে না, তাই বলেছি শেষের দিকে। এ দেশী চরিত্রের কথা।

ঋতা বলল: আর একবার বলবেন?

আর এক বার! এক নম্বর হল, এ দেশের জাতধর্মের বিচার কিছু কম। বাজারে মহাপ্রসাদ বিক্রি হচ্ছে দেখেন নি?

দেখেছি।

কে রাঁধছে আর কে বিক্রি করছে, লোকে তা জানতে চাইছে না। জগন্নাথদেবের প্রসাদ—চাঁড়াল আর ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে সেই প্রসাদ খাচ্ছে। অন্য কোথাও কি এমন দেখেছেন?

না।

দু নম্বর হল, মামলা মোকদ্দমার কথা। এ দেশের লোক আইন মানে, আইন ভাঙে না। বিচারের জন্য পঞ্চায়েত পর্যন্ত যায়, আদালতের ধারে কাছেও যেতে চায় না।

সরকার তবে আদালত রেখেছে কেন?

বড়লোকদের জন্যে।

তারা বুঝি খুবই মামলাবাজ?

মাঝে মাঝে তাদের জন্যেই দরকার হয়।

আমি বললুম: এবারে নতুন কিছু বলুন।

কী বলব?

ঋতা বলল: নাচগানের কথা।

সর্বনাশ!

সর্বনাশ কেন?

মিস্টার জেনা সহাস্যে বললেন: বিশুদ্ধ মার্গ সঙ্গীত আর আদিবাসীর চিৎকারে আমি কোন তফাত দেখি না। আমি বলব গানের কথা?

তবে নাচের কথাই বলুন।

নাচ দেখেছি, কিন্তু তার সম্বন্ধে বলব আবার কী?

বললুম: বলুন কত রকম নাচ, তার কী কায়দা—

তার পরে নাচতে বলবেন না তো?

ঋতা বলল: বললে নাচবেন কি?

মিস্টার জেনা হেসে বললেন: মনিব তো সারাক্ষণই নাচাচ্ছেন। আপনারা আর সে অনুরোধ করবেন না।

তাঁর কথার ধরনে ঋতাও হাসল।

আমি বললুম: বলুন এবারে।

নাচ দেখেছিলাম ময়ূরভঞ্জে। ১৯৫৪ সালে দিল্লীর ন্যাশনাল ফোক ডান্স ফেস্টিভালে নাচের দল যাবে। চারি দিকে বেশ একটু সাড়া পড়েছে। আমারও ছুটি ছিল, ময়ূরভঞ্জে বেকার বসে আছি। এই সুযোগে আমিও কিছু নাচ দেখে নিলাম।

ঋতা বলে উঠল: চমৎকার সুযোগ।

জেনা বললেন: বিপদ যে বলি নি, এ আপনার ভাগ্য। আমার এক সঙ্গী তো নাচ দেখতে রীতি মতো ভয় পান, এমন বিপদ নাকি দুনিয়ায় নেই।

কেন?

সুস্থ মাথার মেয়ে পুরুষ কী করে ধেই ধেই করে নাচে, তিনি ভাবতে পারেন না। মাথা খারাপ না হলে নাকি নাচা সম্ভব নয়।

দেবতাদের মধ্যে শিব নাচেন।

তা নাচেন। জটার ভারে আর গাঁজার গরমে পাগলা হয়ে তাণ্ডব নাচ নাচেন।

না হেসে উপায় নেই। আমরা দু জনেই হাসলুম।

ঋতা তবু বলল: উর্বশী মেনকা রম্ভা—

সে পেটের দায়ে। দেবরাজ ইন্দ্র মাইনে দিয়ে নর্তকী রেখেছেন।

নাচতেই হবে রাজসভায়। বাইজীরাও নাচছে, আমরাও নাচছি। তবে শখ করে নাচি না।

আমি বললুম : এবারে আপনার নাচের গল্প বলুন।

মিস্টার জেনা বললেন : আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল মায়া শবরী নাচ। এটা কোন্ জাতের নিজস্ব নাচ তা মনে নেই, কিন্তু গল্পটা মনে আছে। সত্য যুগে সমুদ্র মন্থনের সময় যখন অমৃত উঠল, তখন যুদ্ধ বাধল দেবাসুরে। অমৃতের অধিকারী কে হবে, তাই নিয়ে যুদ্ধ। বিষ্ণু দেখলেন বিপদ। অবিলম্বে মোহিনী মূর্তি ধারণ করে অমৃত কুম্ভ হরণ করলেন। নূতন বিপদ হল মহাদেবকে নিয়ে, মোহিনীর রূপে তিনি মুগ্ধ হলেন। বিষ্ণু যে রূপে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন, সে তাঁদের হরিহর মূর্তি। কিন্তু পার্বতী এই ঘটনাকে স্বামীর অপমান বলে মনে করলেন। এর প্রতিশোধ নেবেন বলে স্থির করলেন। আর এই প্রতিশোধ নেবার গল্পই মায়া শবরী। পুরাণে এই কাহিনী পড়ি নি। মনে হয়, নাচের জন্যই এই কাহিনী রচিত হয়েছে। দ্বাপরে পার্বতী শবরীর রূপ ধরে কৃষ্ণকে ভোলাতে এলেন। একা নয়, তাঁর সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে এলেন। কৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন, শবরীকে অনুসরণ করে এলেন কৈলাসে। কৃষ্ণের এই অবস্থা দেখে মহাদেব তো রেগে আগুন। মেরে ফেলতেই উদ্যত হলেন। তখন পার্বতী এসে কৃষ্ণকে রক্ষা করলেন। বললেন যে সত্য যুগে শিবকে অপমানের শোধ নিলেন দ্বাপরে। লজ্জায় কৃষ্ণের মাথা কাটা গেল।

আমিও এ গল্প শুনি নি। তাই তাঁর কথা মেনে নিলুম।

মিস্টার জেনা বললেন : একটা জিনিস লক্ষণীয় এই নাচ দেখবার সময় দেবতাদের মানুষ বলে ভ্রম হবে। অনেক সময় মনুষ্যত্বকে তারা দেবত্বের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে। এই ভাবটি দেখেছিলাম পাইকাদের নাচে।

পাইকা কারা?

ওড়িয়া ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা পাইকা নামে পরিচিত। ছৌ নাচ দেখেন নি?

না।

সরাইকেল্লার ছৌ নাচ, আর ময়ূরভঞ্জের ছৌ। ময়ূরভঞ্জের পাইকারা যে ছৌ নাচ নাচে তা একেবারে যুদ্ধের নাচ। এ নাচের কথা আমি বলছি না। আমি বলছি কিরাতার্জুন আর গরুড়-বাহন নাচের কথা। কিরাতার্জুনে অর্জুনের চেয়ে কিরাতেরা বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল, আর গরুড়বাহনে বিষ্ণুর চেয়ে গরুড়। গরুড় বলল, কিসে আমি বিষ্ণুর চেয়ে ছোট! যুদ্ধ করে প্রমাণ হোক। তারপর বিষ্ণুর দেবত্বের পরিচয় পেয়ে গরুড় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মানল। মানুষ বড় ভাবে বলেই দেবতা বড়।

আমি বললুম: চমৎকার আইডিয়া। বিশ্বাস দিয়ে দেবতা আমরাই গড়েছি। আর এই বিশ্বাসের অভাবে ধর্মের ভিত আমাদের ভেঙে পড়ছে।

ঋতা বলল: দু জনেই দেখছি দার্শনিক হয়ে উঠছেন।

মিস্টার জেনা বললেন: পুরাকালে মানুষ চোখ বুজে থেকে দার্শনিক হত, এ যুগের মানুষ চোখ মেলে থেকে দার্শনিক হচ্ছে।

কী রকম?

ঋষিরা চোখ বুঁজে তপস্যা করতেন বছরের পর বছর। তাতেই তাঁদের সত্যদর্শন হত, দার্শনিক হতেন। এ যুগে চোখ বুঁজে থাকলে সবই অন্ধকার। চোখ খুলে দর্শন করতে হয়, নিজের হাতে নোংরামি ঘেঁটে দর্শন। আমরা কলিযুগের দার্শনিক।

এই মন্তব্যে ঋতা প্রচুর কৌতুক পেল, বলল: বেশ বলেছেন।

আমি আবার তাঁকে মনে করিয়ে দিলুম: আপনি নাচের গল্প বলছিলেন।

মিস্টার জেনা বললেন: ফাঁকি দিতে দেবেন না দেখছি। ময়ূরভঞ্জেই আরও কয়েক রকম নাচের কথা শুনেছিলাম। ভূমিয়ারা নানা রকম নাচ জানে।

ভূমিয়া কারা?

এক জাতের আদিবাসী। এদের করম মুণ্ডারি ও যাত্বর নাচ বিশেষ প্রচলিত। ভাদ্র মাসের একাদশীতে তারা করম নাচ নাচে। করম মানে ভাগ্য। এই নাচ তাদের ভাগ্য প্রার্থনা। শিবের তুষ্টির জন্য তারা সারা রাত জেগে নাচে। বন থেকে একটি গাছ এনে গ্রামে তা রোপণ করা হয়, তার নিচে হয় ঘট স্থাপনা। ঘটে কিছু মাটি দিয়ে ধানের বীজ বপন করা হয়। দিনের বেলা উপবাস করে রাত্রিতে নাচ। সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাদের গোলাভরা ধান দেবেন, আর জীবন করবেন পরম সুখের।

মুণ্ডারি নাচও কতকটা এই রকম, কিন্তু যাত্বর অন্য ধরনের নাচ। ভূমিয়ারা তাদের নিজেদের দেবতা বুরু বোঙ্গার নামে এই নাচ নাচে। নিজেদের গ্রামে নয়, গ্রাম থেকে দল বেঁধে তারা নিকটের কোন পাহাড়ে গিয়ে উঠবে। ভাত থেকে তৈরি মদ আকণ্ঠ পান করবে, আর মাটিতে ঢালবে দেবতার নামে। পাহাড়ের যে দিকে সেই মদ গড়াবে, সেই ধারেই নাকি ভাল শস্য হবে সেই বছর।

ঋতা জিজ্ঞাসা করল: নাচটা কী রকম?

পুরুষ আর মেয়েরা দাঁড়াবে দু ধারে দু দল হয়ে। মাঝখানে তিন জন পুরুষ, মাদল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের বাদক। এগিয়ে ও পিছিয়ে নাচ। আপনাকে বোঝাতে হবে জানলে তার আর্ট শিখে নেবার চেষ্টা করতাম।

তারপর?

মিস্টার জেনা ভাবছিলেন। বললেন: আরও বলতে হবে?

বলবার কথা থাকলে বলবেন বৈকি।

সমস্ত আদিবাসীরাই নাচে। তাদের সকলের নাচ আমার জানা নেই।

সহসা বলে উঠলেন: হ্যাঁ, আর একটা নাচের কথা মনে পড়েছে। মুরিয়াদের বিয়ের নাচ। নাচের নাম মনে নেই। তারা বাইসনের শিঙ নিয়ে নাচে শুনেছি। নিজে দেখি নি। ভাল কি মন্দ তাও জানি নে। তবে এ দেশের একটা বিশিষ্ট লোকনৃত্য বলে খ্যাতি আছে।

আমি আবার বললুম: তারপর?

মিস্টার জেনা হাত জোড় করে বললেন: তারপর ক্ষমা করুন। সাধ্যের অতীত আমি বলেছি।

হাসতে হাসতেই ঋতা উঠে পড়ল।

ঘরের ভিতর রামানন্দবাবুর নাক তখনও সমান ভাবে ডাকছে।

সমুদ্রও ডাকছে।

বিকালে চা পানের পর ঋতা আবার ফিরে এল। বলল আজ কোন্ দিকে বেড়াতে যাবেন ?

বললুম : জানি নে।

ভারি চমৎকার উত্তর !

কেন ?

ভাববার পরিশ্রমটুকুও বাঁচালেন।

আমি এখানে বেড়াতে আসি নি, এসেছি বিশ্রাম করতে। বেড়াবার কথা তাই ভাবি নে।

কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো সমানে বেড়াচ্ছেন !

সে সঙ্গদোষে, কিংবা অভ্যাসের দোষে বলুন।

যে দোষেই হোক, আজও একটু পরিশ্রম করুন।

কোথায় যেতে হবে বলুন।

ঋতা আরও কাছে সরে এসে নিচু গলায় বলল : ভদ্রলোক কোথায় ?

কোন্ ভদ্রলোক ?

আপনার নতুন বন্ধু।

রামানন্দবাবু আজ ঘরে চা খেয়েছেন।

আঃ ! আমি সেই নতুন ভদ্রলোকের কথা বলছি, সারা দুপুর যাঁর কাছে নাচ শিখলেন।

মিস্টার জেনা ?

ওঁর নাম বুঝি মিস্টার জেনা ! কোথায় তিনি ?

তিনি বেরিয়ে গেছেন।

যাক, বাঁচা গেছে।

বলে স্বাভাবিক গলায় ঋতা বলল : ভদ্রলোক কে ?

অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজে তিনি এখানে এসেছেন, অত্যন্ত গোপনীয় কাজও বটে।

বাকি সংবাদটুকুও শোনবার জন্য ঋতা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি হেসে বললুম: সেই গোপনীয় কাজ কী, তা জানবার ইচ্ছা থাকলে রামানন্দবাবুকে জিজ্ঞেস করবেন। মিস্টার জেনার সামনে তিনি তা আমাকে বলতে পারেন নি, আড়ালে বলবেন বলেছেন।

সশব্দে ঋতা হেসে উঠল। তার পরে বলল: চলুন আজ মন্দিরে যাই।

মন্দিরে!

কিন্তু আমার বিস্ময়ের উত্তর ঋতা দিল না, বলল: আপনি তৈরি হয়ে নিন। আমি আসছি।

বলে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আমি অসম্মতি জানাতে পারলুম না, আমার সম্মতির অপেক্ষাই সে করে নি। তবে মন্দিরে যাবার প্রস্তাব কেন করেছে তা বুঝতে পারি। কাল আমাকে সে গম্ভীরায় আবিষ্কার করেছে। আর এক দিন দেখেছে মন্দিরের ভিতর। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দিরেও সে আমাকে লক্ষ্য করেছে। তার বুঝতে কষ্ট হয় নি যে মন্দিরে যাবার ডাকে আমি অসম্মত হতে পারব না। তার এই প্রস্তাব সহসা আমার ভাল লাগল। খদ্দরের পাঞ্জাবির উপর আমি একখানা গরম চাদর জড়িয়ে নিলুম।

ঋতা বেরিয়ে এল একখানা সুতোর শাড়ির উপর গরম শাল জড়িয়ে। নক্সা করা ছোট কালো শাল। অন্য দিনের সঙ্গে যেন অনেকটা প্রভেদ দেখলুম। এমন সাদাসিধে সাজ তার কোন দিন দেখি নি। সে নানা রঙের সিল্কের শাড়ি পরে, গায়ে দেয় কেপ কিংবা ক্লোক। কার্ডিগানও পরে। তার চঞ্চলতার সঙ্গে সে পোশাক বেশ মানায়। কিন্তু এখন মনে হল যে এই সাজ তাকে আরও বেশি মানিয়েছে।

পথে নেমে ঋতা বলল : কী দেখছেন বলুন তো ?

আপনাকেই দেখছি।

ছি ছি, আমি আবার দেখবার জিনিস নাকি !

অন্য দিন দেখি না, আজ দেখছি। আজ বেশ বন্ধুর মতো দেখাচ্ছে।

ঋতা হাসল।

আমি বললুম : আজ দাদা বৌদি বেরোলেন না ?

না। বৌদির শরীর ভাল না।

শরীরের কথা আমি কিছু জিজ্ঞাসা করলুম না। সে বোধ হয় সৌজন্য বিরুদ্ধ কাজ হত। ঋতা বলল : গম্ভীরায় কাল আপনাকে দেখে আমরা খুবই আশ্চর্য হয়েছি।

আপনারা ?

হ্যাঁ, আমরা সবাই ছিলাম। আপনি চুপ করে বসে ছিলেন, আর আপনার দু গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

আমি চমকে উঠে বললুম : না না, এ বাজে কথা। আমি অত—

বাধা দিয়ে ঋতা বলল : নিজের চোখকে আমরা অবিশ্বাস করতে পারি নে। আপনি সত্য অস্বীকার করবেন না।

কাজেই আমাকে নীরব হতে হল।

ঋতা বলল : দাদা বৌদি ফিরে গেলেন, আমি আপনার অপেক্ষা করে রইলাম।

আমার বিস্ময়ের যেন সীমা নেই।

ঋতা বলল : আজ যখন আপনার সঙ্গে বেরোবার অনুমতি চাইলাম, কারও আপত্তি হল না।

এ কথারও আমি উত্তর দিলুম না। স্বাতির কথা আমার মনে পড়েছিল। এমনি করে সেও আমার সঙ্গে একা বেরিয়ে এসেছে। প্রথমে লুকিয়ে এসেছে, তার পরে আর লুকোত না। ম্যাড্রাসে এক প্রত্যুষে সে আমাকে অনুসরণ করেছিল। মামা মামী তখন

অকাতরে ঘুমোচ্ছিলেন। তার পর কন্যাকুমারীতে। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে সমুদ্রের ধারে এসে সে আমার পাশে বসেছিল। সেদিনও সে কারও অনুমতি নিয়ে আসে নি। ধীরে ধীরে তার সাহস বাড়ল। এবারে বম্বেতে সে বারে বারে তার সাহসের পরিচয় দিয়েছে। কাউকে ভয় পায় নি, জোর গলায় জানিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে একা।

সহসা মনে হল এই স্বাতি আর কোন দিন আমার সঙ্গে একা বেরোবে না, বেরোবে জো রায়ের সঙ্গে। এখন তারা কলকাতায় আছে। পাকা দেখা হয়তো হয়ে গেছে, স্থির হয়েছে বিবাহের দিন। পৌষ পেরোলেই তাদের বিবাহ হবে। কিন্তু—

না না, এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই। মামীর অসীম আগ্রহ। ব্যবস্থা পাকা না করে তিনি আর ছাড়াবেন না।

কিন্তু স্বাতি কেমন করে রাজী হল! যাকে সে দেখতে পারত না, যাকে এড়িয়ে চলেছে প্রতি পদে, তাকে সে এমন সহজ ভাবে গ্রহণ করছে কেমন করে! হঠাৎ তার এই মনের পরিবর্তন কী করে সম্ভব হল!

সরে আসুন!

বলে ঋতা আমার হাত ধরে কাছে টেনে নিল। বলল: রিক্সা চাপা পড়বেন যে!

লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল।

খানিকটা পথ এগোবার পর ঋতা প্রশ্ন করল: কী ভাবছিলেন বলুন তো!

হঠাৎ আমার মুখে মিথ্যা কথা এসে গেল, বলে ফেললুম: নবকলেবরের কথা।

সে আবার কী?

জগন্নাথ দেবের নবকলেবর। বিশ বছর পর পর শুনেছি দারুব্রহ্মের কলেবর পরিবর্তন হয়।

আপনি খুব শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করছেন!

বলে হাসল।

আমি বললুম: অন্য ভাষা নেই বলে। এ দেশের লোক নিমগাছকে দারু বলে। নিমের কাঠে তৈরি বলে জগন্নাথের নাম দারু ব্রহ্ম। কাঠের মূর্তি পরিবর্তনের প্রয়োজন। তাই নবকলেবর যাত্রা।

ঋতা বলল: এ সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ হচ্ছে বটে, কিন্তু আপনি এ কথা ভাবছিলেন না!

এবারে আমি আর মিথ্যা কথা বলতে পারলুম না। নীরবে পথ চলতে লাগলুম।

ঋতা বলল: নিজের কথা আপনি সব সময় এড়িয়ে চলেন। কিন্তু কেন চলেন তা বুঝতে পারি নে।

সেই তো সৌজন্য।

কখনও তা অসৌজন্যও বটে।

দিল্লীতে এক বার আমি নিজের পরিচয় দিয়েছিলুম। সে বড় উপহাসের ব্যাপার হয়েছিল। আমাকে তার জন্য তিরস্কার শুনতে হয়েছে।

এখানে কেউ আপনাকে তিরস্কার করবে না।

তা জানি।

আমাকে থামতে দেখেই ঋতা বলল: তা হলে ভয় পাচ্ছেন কেন?

ভয় পাচ্ছি নে, ভাবছি তার প্রয়োজন আছে কি না।

ঋতা এবারে সরাসরি অনুরোধ করল: দিল্লীতে যে পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই কথাই আপনি বলুন।

কী বলেছি ঠিক মনে নেই। তবে মানেটা এই রকম। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, আপনার বলতে দুনিয়ায় কোথাও কেউ নেই। উত্তরপাড়ায় একখানা ভাড়াটে ঘর আছে, আছে নটা কুড়ির লোকাল ট্রেন, আর ডালহৌসি স্কোয়ারে আছে সারি সারি টেবলের

মাঝে একখানা কাঠের চেয়ার। আমার কথা শুনে কেউ হেসেছিল, কেউ দুঃখ পেয়েছিল। কেউ আমার স্পষ্টবাদিতার জন্ম প্রশংসা করেছিল, কেউ তিরস্কার করেছিল মূর্খতার জন্যে।

ঋতা হাসল না, কথাও কইল না অনেক ক্ষণ পর্যন্ত।

আমি বললুম: চুপ করে রইলেন যে?

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

আরও খানিকটা পথ চলে ঋতা বলল: ছেলেবেলায় ছুটোছুটি করবার সময় আমার এক বার পা কেটে গিয়েছিল। ভয়ে বাড়িতে কাউকে বলি নি। লুকিয়ে রেখেছিলাম। কয়েক দিন পরেই তা পেকে উঠল, আর তার সঙ্গে প্রবল জ্বর। দু বেলা ইঞ্জেক্সন দিয়ে সেই জ্বর ছাড়ে। ডাক্তার বলেছিলেন, আমি মরেও যেতে পারতাম।

কিন্তু আপনি তো দিব্যি বেঁচে আছেন, সুস্থও আছেন। সেই ক্ষতের কথাও আপনার সব সময় মনে পড়ে না।

যদি আমি প্রথম দিনেই সেই ক্ষতের কথা বাড়িতে বলতাম?

বললুম: তা হলে হয়তো কষ্ট কম পেতেন।

কিন্তু নিজের কথা আমি ঋতাকে জানালুম না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঋতা বলল: বেদনার কথা বলে ফেললে মনটা হাল্কা হয়।

এ কথাও আমি নিঃশব্দে স্বীকার করে নিলুম।

তখন আমরা মন্দিরের সিংহ দ্বারে পৌঁছে গেছি। পাণ্ডার একটি ছেলে বলল: আসুন বাবু।

সেই ছেলেটিকে পেয়ে আমি যেন বেঁচে গেলুম। বললুম: আজ নবকলেবর যাত্রার গল্প বল।

ছেলেটি বলল: এই তো পঞ্চাশ সালে নবকলেবর যাত্রা হল। জানেন, এবারেও ভিতরছা মহাপাত্র মারা গেলেন।

কেন ?

প্রতিবারেই তো মারা যান। তিনিই সব ব্যবস্থা করেন, আর তাঁকে মরতেই হবে।

ঋতা তার পুরনো কথা ভুলে গেল। বলল : কী বলছে এ সব ?

বললুম : এদের বিশ্বাসের কথা। একে কুসংস্কারই বলুন আর যাই বলুন, ঘটনাটা যখন সত্য হয়ে দাঁড়ায় তখন বিশ্বাস না করে আর উপায় থাকে না।

মৃত্যু তো একটা প্রাকৃতিক ঘটনা, তাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করলেই হয়।

নবকলেবর যাত্রার আগে কিংবা দীর্ঘ দিন পরে ঘটলে, তাতে কোন বাধা ছিল না। এই মৃত্যু যে অব্যবহিত পরেই ঘটছে, লোকে যখন সাগ্রহে অপেক্ষা করছে পরিণতি দেখবার জন্যে।

আমার মনে হয়, ভয় থেকে এই মৃত্যু হচ্ছে। এই ধরনের গল্প আপনি শোনেন নি ?

শুনেছি। আর এ কথাও অল্প অল্প মনে পড়ছে যে দেশের অনেক লোক সে বারে এই ঘটনাকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছে। খবরের কাগজেও সব বেরিয়েছিল। এখন সব কথা মনে পড়ছে না। ১৯৭০ সালের তো আর বেশি দেরি নেই, একটু খেয়াল রাখলেই সব জানতে পারবেন।

ঋতা বালকের দিকে ফিরে বলল : তার পর ?

বালক এত ক্ষণ চুপ করে ছিল। এইবারে সবিস্তারে নবকলেবর যাত্রার গল্প শুরু করল।

নবকলেবর যাত্রা জগন্নাথ দেবের সব চেয়ে পুরনো উৎসব। রথযাত্রার চেয়েও পুরনো। জগন্নাথ দেব শবরজাতির দেবতা ছিলেন। হাজার বছর আগে শবররাই তাঁর পূজা করত। তারা ছিল তান্ত্রিক। জৈনরা কোন সময় জগন্নাথ দেবকে নিয়ে গিয়ে প্রাচী নদীর তীরে পূজা করতে শুরু করে। শবররা এই মূর্তি

উদ্ধার করে ভাবল, কিছু একটা করা দরকার। অনেক ভেবে-চিন্তে তারা দেবতার মূর্তি বদল করে নাম রাখল নীলমাধব। পাঁজি পুঁথি মিলিয়ে দেখা গেল যে তখন আষাঢ় মাস। আর শুধু আষাঢ় মাস নয়, সে বছর দুটো আষাঢ় মাস। কুড়ি বছর পর পর নাকি দুটো আষাঢ় মাস আসে, আর এই রকম আষাঢ় মাসে হয় নবকলেবর যাত্রা।

আমি বললুম: শাবাশ!

বালক বেশ গর্বিত বোধ করল।

বললুম: উৎসবটা কী রকম হয় বল তো?

বালক বলল: রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথ দেবের মূর্তি পেয়েছিলেন শবরদের রাজা বিশ্বাবসুর কাছে। তাঁর মেয়ের বংশ দৈত নামে পরিচিত। তাদেরই ওপর এই মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার। তারাই নবকলেবরের ব্যবস্থা করে। আবার পুরনো মূর্তি যখন কৈবল্য বৈকুণ্ঠে সমাধিস্থ করা হয়, তখন তারাই অশৌচ পালন করে।

যে বছর নবকলেবর হবে সেই বছর চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বাসেলি দেবীর কাছে জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রার নবকলেবর করবার অনুমতি নেওয়া হয়। দেবীর মালা এই অনুমতির নিদর্শন। ভিতরছা মহাপাত্র নামে মন্দিরের এক পদাধিকারী এই মালা গ্রহণ করেন। নবকলেবরের ব্যবস্থা করার পরে এই মহাপাত্রের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

নবকলেবর তৈরির জন্য নিম গাছ অন্বেষণ একটা কঠিন ব্যাপার। যে কোন নিম গাছ থেকে মূর্তি তৈরি হয় না। তার অনেক রকম চিহ্ন আছে। যে নিম গাছে জগন্নাথের মূর্তি হবে তার গায়ে চক্রের চিহ্ন থাকা চাই। তাতে সুগন্ধ থাকবে ও ডাল হবে সাতটি। বলভদ্রের মূর্তি হবে যে গাছে, তার রঙ সাদা হবে, আর শঙ্খের চিহ্ন থাকবে গায়ে। সেই গাছে পাখির বাসা থাকবে না,

কিন্তু গোড়ায় থাকবে গোখরো সাপের বাসা। লাল রঙের গাছে সুভদ্রার মূর্তি হবে। সেই গাছ জঙ্গলে জন্মালে চলবে না, কোন পবিত্র স্থানে হতে হবে। আর তার ডাল হবে মাত্র পাঁচটি।

প্রাচী নদীর তীরে ককটপুর, সেখানে আছেন দেবী মঙ্গলা। কাঠের জন্য লোকেরা এসে এই দেবীর মন্দিরে ধরনা দেবে। দেবী স্বপ্ন দেবেন রাতে—সমস্ত লক্ষণযুক্ত গাছ কোথায় আছে। স্বপ্ন পাবার পর তিন দলে ভাগ হয়ে তারা গাছ খুঁজতে বেরোবে।

গল্পটি ভাল লাগছিল। বললুম: তার পর?

আমার প্রশ্ন শুনেই বালক উৎসাহিত হল। বলল: সবই জগন্নাথ দেবের কৃপা। তা না হলে কি নিম গাছের এত রঙ হয়, না এত চিহ্ন থাকে গাছে! স্বপ্নাদেশ না হলে সারা জীবন গাছ খুঁজেই মানুষ মরে যেত, নবকলেবর হত না।

ঋতা আমার দিকে তাকাল।

বললুম: বিশ্বাসের কথা। বিশ্বাসেই দেবতা মেলে, তর্কে বহু দূর।

আপনিও বিশ্বাস করেন?

অবিশ্বাসে অশান্তি বাড়ে, তাই বিশ্বাস করি। শান্তি পাই।

ঋতা এ কথার উত্তর দিল না। কিন্তু বালক তার গল্প শুরু করল। বলল: নিম গাছ খুঁজে পেলেই তা কাটা হবে না। গাছের নিচে পূজা করা হবে। তার পর সোনার ও রূপোর কুড়ুলে আঘাত করবার পর গাছ কাটা হবে। সেই গাছ মহাসমারোহে আসবে মন্দিরের ভিতরে। মূর্তি তৈরি হবে। তারপর ব্রহ্মা স্থাপন।

সে আবার কী?

পুরনো মূর্তির মধ্যে ব্রহ্মা থাকেন। ব্রহ্মা কেউ চোখে দেখে নি। পতি মহাপাত্রের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। হাতও কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। তিনি পুরনো মূর্তির ভিতর থেকে ব্রহ্মা

বার করবেন। শুনেছি চন্দন ও তুলসী পাতার মধ্যে ব্রহ্মা থাকেন। সেই চন্দন কোন দিন শুকোয় না, তুলসী পাতাও সতেজ থাকে।

ঋতা বলল : তা কখনও থাকতে পারে ?

হেসে বললুম : তর্ক করলে দেবতারই অস্তিত্ব থাকে না, চন্দন আর তুলসী পাতা কোন্ ছার।

বালক বলল : আষাঢ় মাসের অমাবস্যার দিন এই উৎসব হয়। তার পর সাধারণ যাত্রীদের দর্শন। এই প্রথম দর্শনে অশেষ পুণ্য, তার জন্য লে কে লোকারণ্য হয়ে যায়। পুরীর রাস্তায় তখন আর হাঁটার উপায় থাকে না।

তুমি দেখেছ ?

আমি খুব ছোট ছিলাম।

রথযাত্রার চেয়েও বেশি লোক ?

অনেক বেশি। রথযাত্রা তো প্রতি বছর হয় !

কী হয় বল তো !

ঋতা বলল : আপনিও দেখছি রামানন্দবাবুর মতো প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন।

আমি গবেষণা করছি না, সময় কাটাবার চেষ্টা করছি।

সময় তো সমুদ্রের ধারে বসেও কাটে।

আমি বললুম না যে সকালে সেখানেও আমার বিপদ ঘটেছিল। তার বদলে বালকের দিকে তাকিয়ে তাকে গল্প বলার সুযোগ দিলুম।

বালক বলল : রথযাত্রায় তিনখানা রথ বেরোয়। নন্দীঘোষ তালধ্বজ ও দর্পদলন। নন্দীঘোষ জগন্নাথ দেবের রথ, তার রঙ লাল ও হলদে। বলভদ্রের রথ তালধ্বজ, রঙ লাল আর নীল। সুভদ্রা ওঠেন দর্পদলনে, তার রঙ লাল ও কালো। এই রথগুলো যে কত বড়, তা না দেখলে ধারণা হবে না। এপাশে ওপাশে

পঁয়ত্রিশ আর উঁচুতে পঁয়তাল্লিশ ফুট। লক্ষ লক্ষ লোক দড়ি টানে, রথ তবু নড়ে না।

বল কি !

প্রতি বছর আমরা তাই দেখি।

আর কী দেখ ?

স্নান পূর্ণিমায় জগন্নাথ বলভদ্র ও সুভদ্রা তিন জনেই সর্বাঙ্গ স্নান করেন। তাঁদের গায়ের রঙ সব ধুয়ে মুছে যায়। নতুন করে রঙ করতে ঠিক বারো দিন সময় লাগে। এই সময়কে বলে অনাবাসর। দৈতপতি সেবায়েতরা তখন খুব ব্যস্ত থাকেন।

শ্রীগুণ্ডিচা দিবসে দেবতারা রথে চড়েন। তার আগে একটা অনুষ্ঠান আছে। পুরীর রাজা এসে রথের সামনের রাস্তা সোনার ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে যান।

ঋতা বলল ঃ এ আবার কী অনুষ্ঠান ?

বললুম ঃ দেবতার কাছে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই—রাজায় আর ঝাড়ুদারে।

বালক বলল ঃ ঠিক বলেছেন। আমরাও এই কথা বলি।

তার পর ?

তার পর উল্টারথ। আট দিন পর দেবতারা মন্দিরে ফিরে আসেন। সেই একই রকম ধুমধাম। মাসের একাদশ দিনে তাঁরা রাজবেশে দর্শন দেন।

বললুম ঃ এই রথযাত্রা কে চালু করেছিলেন জান ?

জানি বৈকি। ব্রহ্মা নিজে রথযাত্রা পৃথিবীতে চালু করেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলমাধবের দর্শন চেয়ে পেলেন না। এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পেলেন দারুব্রহ্ম। সমুদ্রের জলে ভেসে ভেসে নিমের কাঠ এসেছিল। রাজা বললেন, এই দিয়েই মূর্তি গড়ব। ঠাকুর এলেন কারিগরের ছদ্মবেশে। বললেন, বন্ধ ঘরে মূর্তি গড়া হবে, একুশ দিন যেন কেউ না দেখে। রাজা বললেন,

তথাস্তু। দিন যায়, মূর্তি গড়া আর শেষ হয় না। ব্যস্ত হয়ে রাজা ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন তিনটি অসমাপ্ত মূর্তি, আর কারিগর নেই। রাজা নিজের দোষ বুঝতে পেরে আবার প্রার্থনা করলেন। তখন ব্রহ্মা এলেন। আর সেই তিনটি অসমাপ্ত মূর্তিকে রথে চড়িয়ে মন্দিরে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই থেকেই রথযাত্রা হয় বছরে বছরে।

শাবাশ!

বলে আমি কয়েক আনা পয়সা তার হাতে গুঁজে দিলুম। নমস্কার করে ছেলেটি বলল: আর কিছু শুনবেন না? আর কোন যাত্রার কথা?—চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা?

হেসে বললুম: না।

বালক বিদায় নিল।

ঋতা বলল: এইবারে?

কোথাও বসবেন কি?

মন্দ কি!

আমরা একটা নির্জন জায়গা খুঁজে বার করলুম। লোকের আনাগোনা সেখানে কম, আলোও কম। তারপর অনেক কথা হল, অনেক অনাবশ্যক কথা। অন্ধকারে মন যে অসংযত হয়, সে কথা আমার মনে ছিল। ঋতারও ছিল। তাই আমরা কাছে বসেও দূরে রয়ে গেলুম। আমি যে দূরে থাকতেই চাই।

২৯

আজ সকালে আমরা কোনার্ক যাব। ইংরেজীর অনুকরণে কোনার্ককে সবাই কোনারক বলে। সাতটায় বাস আসবে বলে আমরা স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিচ্ছি। চা খেয়ে যাব। দুপুরের খাবার খাব কোনারকে। হোটেল থেকেই আমাদের খাবার বেঁধে দেবে। ঋতারাও যাবে, তারাও সঙ্গে খাবার নিচ্ছে।

রামানন্দবাবু যাবেন না বলে ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের জন্যেই যাচ্ছেন না। তাঁর রাগ হয়েছে। আমার উপর হলে আমি তাঁকে রাজী করিয়ে নিতুম।

এই কদিন আমার জীবনটা যেন আটকে ছিল। একেবারে গতিহীন স্থাণুর মতো। এখন আবার একটু একটু করে চলছে। জীবনটাই বুঝি এই রকম। বড় একটা ধাক্কা পেলেই থেমে যায়, যত দিন তার যন্ত্রণা গভীর তত দিন থেমে থাকে। তার পর ক্ষত সেরে যায়, জীবনও চলতে শুরু করে। আমার জীবনেও গতি ফিরে আসছে।

ঋতা এক বার জিজ্ঞাসা করে গেল: তৈরি হয়েছেন তো?

তখন আমি চা নিয়ে বসেছি। হেসে বললুম: প্রায়।

আপনার বন্ধু?

তিনি তো যাবেন না বলেছেন।

সত্যি নাকি!

আপনি শোনেন নি?

শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করি নি।

চুপিচুপি বললুম: রাগ করে যাচ্ছেন না।

রাগ করে চাও খাবেন না বুঝি?

গবেষণা করছেন।

দেখে আসব?

বলে ঋতা সরে গেল।

খানিক ক্ষণ পরেই শুনলুম, বাহিরে সোরগোল হচ্ছে। বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলুম : ব্যাপার কী বল তো?

দেখে এসে সে বলল : বাস এসেছে।

বাস! সাতটা তো বাজে নি এখনও!

বলে আমি প্লেটে চা ঢাললুম।

সেদিনের সেই বাসওয়ালা এসে উপস্থিত হল। সে আমাদের নাম লিখে নিয়েছিল, ভাড়ার পয়সা নেয় নি এখনও। আমি ব্যস্ত হয়েছি দেখে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল : সময় আছে, আস্তে আস্তে খান।

বলে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে হাঁক দিল : কি ঠাকুর, খাবার হয়েছে তো?

খুন্তি চালাবার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলুম। ঠাকুরের উত্তরটা কানে এল না।

বাসের লোকটি বলল : এখনও হয় নি! তিনটে হোটেল থেকে যাত্রী নিতে হবে, এত দেরি করলে কি চলে!

বলেই ফিরে এল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : পয়সা কি এখন নেবেন?

তার তাড়া নেই! এক সময় নিলেই চলবে।

আমার চা পান শেষ হয়েছিল। বাহিরে বেরিয়ে এলুম। ছোট বাসখানি সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সেই দিকে তাকিয়ে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। রামানন্দবাবু আগেভাগে এসে বাসে উঠে বসে আছেন।

আমি কী বলব, ভেবে পাচ্ছিলুম না। রামানন্দবাবুই আমাকে তাড়া দিয়ে উঠলেন : কী ভাবছেন দাঁড়িয়ে? উঠে আসুন না।

আপনি যাবেন না বলছিলেন!

হুঁ।

বলে তিনি একটা ভেংচি কাটলেন।

ঋতা বাহিরে বেরিয়েছিল। আমাদের দু জনকে কথা কইতে দেখে মুচকি হাসল। তার পরেই আবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

এবারে নিগমবাবু বেরোলেন। তাঁর পিছনে তাঁর স্ত্রীই হবেন। লম্বা ঘোমটায় সমস্ত মুখখানা ঢাকা, দেহটা ঢেকেছেন চাদরে। ঋতার মতো ছোট চাদর নয়। বড় শাল। গলা থেকে প্রায় পা পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে। নিগমবাবুর স্ত্রীকে আমি এই প্রথম দেখলুম। দেখলুম বলব না। একে দেখা বলে না। মনে হল, কাপড়ের একটা বিরাট পুঁটলি থপ থপ করে বাসে গিয়ে উঠল।

নিগমবাবু নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী নিরাপদে উপরে উঠে বসতেই আমাকে ডাকলেন: আসুন গোপালবাবু।

আমার মনে পড়ল, নিগমবাবুর মুখে যেন কোনারকের কথা শুনেছি। তাই বললুম: কোনারক তো আপনি দেখে এসেছেন!

নিগমবাবু হেসে বললেন: বসে থেকেই বা কী করব! ভাবলাম, ঘুরেই আসি।

তাঁর বাঁ কাঁধ থেকে বাইনকুলার ঝুলছে, ডান কাঁধে জলের বোতল। হাতের খাবারের পুঁটলিটা স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিয়ে নিজেও উঠলেন। আমি শুনতে পেলুম, তাঁর পকেট থেকে রেডিও বাজছে।

ঋতা এল তার দাদা বৌদির সঙ্গে। খাবার জিনিস ও জলের জায়গা একটা ঝুড়িতে নিয়েছেন।

বাসের সেই লোকটি এক বার উঁকি দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল: আপনি তো যাবেন না বলেছিলেন।

রামানন্দবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন: এখন যাব বলছি।

সে কি! আমি অন্য প্যাসেঞ্জার—

আমি কি প্যাসেঞ্জার নই?

আজ্ঞে না, তা নয়। জায়গা কোথায় হবে?

সে ভাবনাও কি আমার নাকি! এইটুকু গাড়ি এনেছ কেন! বড় গাড়ি আনতে কে বারণ করেছিল!

ঋতা হাসছিল। আমি বললুম: কোন রকমে হয়ে যাবে।

কিন্তু তার দুশ্চিন্তা গেল না। মনে হয়, ইতিমধ্যেই সে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে ফেলেছে। বিব্রত ভাবে বলল: দেখা যাক।

পিছনের দরজা বন্ধ করে হাঁক দিল: কই রে, টিফিন কেরিয়ারগুলো কই?

টিফিন কেরিয়ার একটি এল। বোধ হয় আমারই। আর সবাই নিজের খাবার নিয়েছেন। রামানন্দবাবু মুখ বাড়িয়ে বললেন: আমার কথা ম্যানেজারবাবুকে বলো।

বাস ছাড়ল। খানিকটা এগিয়ে আর একটি হোটেলের সামনে দাঁড়াল। সেখান থেকেও কয়েক জন যাত্রী উঠলেন। হাঙ্গামা বাধল তৃতীয় হোটেলের সামনে। দু জনের জায়গা কম। কোন রকমে এক জন বসলেন, আর এক জনের জায়গা নেই।

সেই লোকটি কাতর ভাবে রামানন্দবাবুর কথা শোনাল। কিন্তু রামানন্দবাবু তো এক জন, আর এক জন অপরাধী কে! এক জন যাত্রী বললেন: এ সবই ওর কারসাজি।

শেষ পর্যন্ত একটা মোড়া এনে ব্যবস্থা হল। গাড়ির ক্লিনার বসল পেট্রলের টিনের উপর।

শহর থেকে বেরিয়ে আমরা ভুবনেশ্বরের পথ ধরলুম। পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত পথ। পাশাপাশি কয়েকখানি গাড়ি এক সঙ্গে ছুটতে পারে। এই পথে আমরা কয়েক মাইল যাব, তার পর পাব কোনারকের পথ।

রামানন্দবাবু বললেন: মিস্টার জেনা সঙ্গে এলে খুব ভাল হত।

কেন?

দেখেছেন তো ভদ্রলোক কত খবর রাখেন! কোনারক পৌঁছবার আগেই সব বৃত্তান্ত জেনে নেওয়া যেত।

নিগমবাবু বললেনঃ আর একটু পরে নিজের চোখেই তো সব দেখতে পাব।

দেখব তো ভাঙা একটা মন্দির। কিন্তু কে গড়ল আর কে ভাঙল, সে তো তার গায়ে লেখা নেই!

সে তো আপনার হোটেলের বারান্দায় বসেই জানতে পারতেন!

কী করে?

আপনার সেই জেনাবাবুকে জিজ্ঞেস করে!

রামানন্দবাবু এ কথার উত্তর খুঁজে পেলেন না। তাই আমাকে বললেনঃ শুনেছেন মশাই! ব্যবসাদারের বুদ্ধি দেখুন!

নিগমবাবু রাগ করলেন না। সহাস্যে উত্তর করলেনঃ মাস্টার-বাবুকে পরামর্শ দিচ্ছি।

রামানন্দবাবু রুখে উঠলেনঃ কী বললেন?

পরম কৌতুকে ঋতা বললঃ নারদ নারদ!

তার বৌদি তাকে ধমকালেন।

আমি বললুমঃ ঐ নারদের জন্যেই আজ আমরা কোনারক যাচ্ছি।

ঋতার দাদা বললেনঃ কী রকম?

তা হলে সাম্বের গল্প বলতে হয়। সাম্বের শাপের গল্প।

বলুন না।

ঋতা বললঃ এ কি, আপনাকেও যে রোগে ধরল!

হেসে বললুমঃ এ রোগ সংক্রামক। সঙ্গদোষে, থুড়ি, সঙ্গগুণে ধরে।

ঋতা হেসে উঠল।

অন্য হোটেলের এক ভদ্রলোক বললেনঃ এক সঙ্গে আপনারা কত দিন আছেন?

মাত্র দিন কয়েক।

ভদ্রলোক কিছু আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ যে রকম আপনারা জমিয়ে নিয়েছেন, মনে হচ্ছে কয়েক মাস, কিংবা—

এক পরিবারের লোক। এই তো!

কিছুই বিচিত্র নয়।

রামানন্দবাবু আমাকে একটা ধমক দিলেন: আপনার বড় বাজে বকার দোষ মশাই। নারদের গল্পটা বলুন না।

নারদের নয় সাম্বের। কৃষ্ণের পুত্র সাম্ব। সুদর্শন যুবক। তার নামে লাগাতে এলেন নারদ। কৃষ্ণ তখন দ্বারকায় তাঁর ষোল হাজার স্ত্রীর কথা ভাবছেন।

এক জন অপরিচিত ভদ্রলোক চমকে উঠে বললেন: বলেন কি মশাই, কৃষ্ণ তাঁর সব স্ত্রীকে চিনতেন তো! নাম জানতেন সকলের!

বললুম: সাধারণ মানুষ তো নন, তাঁর ব্যাপারই আলাদা। সেই জন্যেই বোধ হয় নিজের ছেলেকে শাপ দিয়েছিলেন, কুষ্ঠ হোক।

ছি ছি, বাপ হয়ে ছেলেকে শাপ দেবেন কেন!

ঐ নারদের মন্ত্রণায়। ছেলে যে বকে গেছে সেই কথা নারদ এসে কৃষ্ণের কানে তুলেছিলেন। কৃষ্ণ বললেন, কখনও না। আমার ছেলে কখনও বকতে পারে! নারদ বললেন, আপনারই উপযুক্ত ছেলে। বৃন্দাবনে আপনি গোপীদের সঙ্গে লীলা করেছিলেন, সাম্ব এখানে আপনারই স্ত্রীদের সঙ্গে—। কৃষ্ণ রুখে উঠলেন, খবরদার দেবর্ষি। এমন করে যা-তা আপনি রটাবেন না। নারদ বললেন, প্রমাণ চাই? আলবৎ চাই। নারদ প্রমাণ দিলেন।

কী প্রমাণ?

দুই পুরাণে দু রকম প্রমাণ দেখেছি। সে গল্প এখানে বেমানান হবে।

রামানন্দবাবু বললেন: বেশ লোক মশাই, এমন ভণিতা করে আরম্ভ করে—

শেষও করব, মাঝখানে একটু বাদ দিই। এখানে মহিলারা আছেন কিনা!

রামানন্দবাবু ছাড়বার পাত্র নন। বললেন: আপনি তো তৈরি করে কিছু বলছেন না, খবরের কাগজের কথাও না। আপনি পুরাণের কথা বলবেন, পুরাণ আমাদের ধর্মগ্রন্থ।

আমি দেখলুম শোনবার আগ্রহ অনেকেরই আছে, কিন্তু রামানন্দবাবুর মতো স্পষ্ট ভাবে কেউই বলতে পারছেন না। কাজেই গল্পটা একটু সংক্ষেপে বললুম: কৃষ্ণের পত্নীরা যখন স্নান করছেন, সাম্ব গিয়েছিল উঁকি দিতে। বরাহ পুরাণ বললেন, দোষ সাম্বের নয়, দোষ রাণীদের। রাণীরা সাম্বের দিকে তাকিয়েছিলেন লোভীর দৃষ্টিতে। নারদ এই দৃশ্য কৃষ্ণকে দেখান। কৃষ্ণ ক্ষেপে গিয়ে শাপ দেন। সে যাক, পুরাণে পুরাণে এই রকম অসঙ্গতি থাকেই, তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমাদের কারবার সাম্বকে নিয়ে। কুষ্ঠ হবার পর সাম্ব উড়িষ্যায় এসেছিলেন। চন্দ্রভাগা যেখানে সমুদ্রে মিলেছে, তারই কাছে মৈত্রেয় বন। সেই বনে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সূর্যের কৃপায় তাঁর রোগমুক্তি হয়। তার পরে যখন চন্দ্রভাগায় স্নান করছেন, তখন নদীর বালির ওপর একটি সুন্দর মূর্তি দেখতে পেলেন। মূর্তিটি সূর্যের। সাম্ব ভাবলেন, একটি মন্দিরে এ মূর্তির প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। তিনি তাই করলেন। মন্দিরে সূর্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তিনি সূর্যের পূজা প্রচলন করে গেলেন। এখানে শোনা যায় যে কোনারকেই সাম্ব এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেননা এইখানেই ছিল চন্দ্রভাগা নদী ও মৈত্রেয় বন। কিন্তু পণ্ডিতরা বলেন যে চন্দ্রভাগা পাঞ্জাবের নদী, মৈত্রেয় বনও পাঞ্জাবে। সেখানেই সাম্বপুর নামে এক শহরের পত্তন হয়েছিল।

রামানন্দবাবু বললেন: গল্পটা আপনি তৈরি করে বললেন না তো?

তৈরি করে বললে আরও সরল করতে পারতুম।

তা হলে আপনার মতে এই কোনারক মন্দিরের নির্মাতা হলেন কৃষ্ণের পুত্র সাম্ব।

এই মন্দির বলবেন না, সাম্ব কোনারকের প্রথম সূর্য মন্দির নির্মাণ করেন। সূর্যের তাপে যে রোগ নিরাময় হতে পারে, দ্বাপরের মানুষ তা জানতেন। আর জানতেন বলেই দেবর্ষি নারদ সাম্বকে সূর্যের উপাসনা করতে বলেছিলেন। শাক দ্বীপ থেকে সাম্ব মগ ব্রাহ্মণদের এনেছিলেন পূজার জন্য। সূর্যের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সাম্ব একটা সত্যের প্রতিষ্ঠা করে যান।

বর্তমানের ভাঙা মন্দির তা হলে কে নির্মাণ করেন?

বললুম: কোন ইতিহাসের ছাত্রকে তা জিজ্ঞেস করুন।

এক ভদ্রলোক সসঙ্কোচে বললেন: আমি একখানা গাইড বইএ কিছু পড়েছিলাম।

রামানন্দবাবু বললেন: বলুন না, অত ভয় পাচ্ছেন কেন!

ভদ্রলোক বললেন: বইখানা ইতিহাসের নয়। প্রকাশ করেছেন উড়িষ্যার সরকার। তাইতেই একটু সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।

তা হোক।

রাজা প্রথম নরসিংহ দেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে এই মন্দির নির্মাণ করেন। গঙ্গা বংশের এই রাজার শাসন কাল ছিল গৌরবময়। সমগ্র উত্তর পশ্চিম ও বাঙলা দেশ যখন মুসলমানের শক্তির পদানত হচ্ছিল একে একে, তখন উড়িষ্যার রাজা নরসিংহ দেব তাঁর সৈন্য নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমানরা হেরে গিয়ে পালিয়ে যায়। তার ফলে আরও দু শো বছর উড়িষ্যায় হিন্দু রাজত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। লোকে বলে কোনারকের সূর্য মন্দির রাজা নরসিংহ দেবের জয়স্তম্ভ।

রামানন্দবাবু বললেন: এই কথা বলতে এত সঙ্কোচ করছিলেন কেন?

যা বলি নি সেই কথা বলতেই সঙ্কোচ।

আপনাকে নিয়ে ভারি বিপদ তো! এর মধ্যে আবার বাদ দিয়েছেন!

ভদ্রলোক বললেন : এই বইতেই আছে যে বারো শো কারিগর বারো বছর ধরে এই মন্দির নির্মাণ করেন। রাজ্যের বারো বছরের আয় এই মন্দির নির্মাণে খরচ হয়েছে।

অ্যাঁ! তাজমহলেও বোধ হয় এত টাকা খরচ হয় নি!

তবেই বুঝে দেখুন, কী কাণ্ড!

রামানন্দবাবু বললেন : আগে দেখি, তার পর বুঝে দেখব।

সবাই হাসলেন তাঁর কথা শুনে।

গল্পে গল্পে আমরা অনেকটা পথ অতিক্রম করেছিলুম। অনেক ছোট ছোট গ্রাম ও বড় বড় মাঠ পেরিয়ে একটা ছোটখাট শহরের মতো জায়গায় এসে পৌঁছলুম। এ জায়গার নাম শুনলুম পিপ্‌লি। পিপ্‌লির বাজার এটি। ডান দিকে মোড় নিয়ে বাস বাঁ দিক ঘেঁষে দাঁড়াল। ড্রাইভার ও ক্লিনার নামল। মিনিট কয়েক দাঁড়াবে। কাজেই আমরাও কয়েক জন নামলুম।

রামানন্দবাবু খবর সংগ্রহে লেগে গেলেন। এই পিপ্‌লি শহর পুরী-ভুবনেশ্বর রোডের উপর। ভুবনেশ্বর থেকে যতটা পথ, তার চেয়ে কম পুরী থেকে। এই যে আমরা ডান দিকে মোড় নিয়েছি, এই পথ সোজা কোনারক যাবে। পুরী থেকে কোনারক তিপ্পান্ন মাইল, ভুবনেশ্বর থেকে বারো মাইল কম। পিপ্‌লির পথ যখন ছিল না, তখন লোকে পুরী থেকে গরুর গাড়ি করে সমুদ্রের ধারে ধারে কোনারক যেত। তাতে পথ হত একুশ মাইল মাত্র। রাত্রে খেয়েদেয়ে লোকে গরুর গাড়িতে শুয়ে ঘুমোত, ভোরবেলায় কোনারক। সে পথ কেমন ছিল তার পরিচয় আছে পুরাকালের ভ্রমণ কাহিনীতে। ছেলেবেলায় আমরা তা পড়েছি।

চায়ের দোকানে কেউ চা খাচ্ছিলেন, কেউ কমলালেবু কিনছিলেন ফলের দোকানে। আমরা খবর সংগ্রহ করছি।

রামানন্দবাবু বললেন: পুরী থেকে পিপ্‌লির হিসেব পাচ্ছি না।

বললুম: অঙ্ক কষুন।

কী করে?

পুরী থেকে ভুবনেশ্বরের দূরত্ব আমাদের জানা আছে। পিপ্‌লি ঠিক মাঝপথে নয়, পুরীর দিকেই বারো মাইল কম। এইবারে হিসেব করুন। এক্স প্লাস বারো—

রাখুন আপনার এক্স প্লাস বারো। যদি জানেন তো বলে ফেলুন।

বললুম: হিসেব করে বলতে পারি।

কিন্তু রামানন্দবাবু হিসাব করতে রাজী নন, আমিও সময় পেলুম না। যত্রীরা সবাই উঠে পড়েছেন। গাড়ি ছাড়ছে। আমরাও উঠে পড়লুম।

ক্লিনার বলছিল: আজ আমাদের ভাগ্য ভাল।

কেন?

এ কয় দিন অনেক ক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়াতে হচ্ছিল।

তাই নাকি!

রাষ্ট্রপতি আসছেন বলে পুলিসের বড় কড়াকড়ি হয়েছে।

খানিকটা পথ এগিয়েই আমরা রাষ্ট্রপতির আগমনের উদ্যোগ দেখতে পেলুম। বড় বড় যন্ত্রের আমদানি হয়েছে। এক জন বললেন: এগুলোর নাম বুল ডোজার।

আর এক জন আর একটা অদ্ভুত নাম করলেন।

পথঘাট ঝকঝকে তকতকে করা হচ্ছে। কোনারকের পথ যে অল-ওয়েদার রোড হচ্ছে, তা কাগজে পড়েছিলুম। এখন যে খানিকটা পথ বাকি আছে, তাও শুনেছি। তবু এই তৎপরতা দেখে বিশ্বাস হল যে ভারতের রাষ্ট্রপতি সত্যিই আসছেন। আমার এক বন্ধু বলেন যে এ দেশের পথঘাট আজকাল রাজা-উজীর যাবার আগেই শুধু মেরামত হয়।

আমাদের গাড়ির ক্লিনারটি বয়সে ছেলেমানুষ। কখন এক সময় ড্রাইভারের কাছাকাছি গিয়ে বসেছিল খেয়াল করি নি। হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। গভীর মনোযোগে রাস্তার দু ধার দেখতে দেখতে বলে উঠল: গোটে লোকপাঁই এতে কাম হউছি!

নির্বিকার ভাবে ড্রাইভার বলল: লোকটা কেত্তে বড় জানিছ?

আমিও অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাদের কথোপকথন শুনে বোঝবার চেষ্টা করছিলুম। মনে হল, বুঝতে পেরেছি। ক্লিনার জিজ্ঞাসা করল, এক জন লোকের জন্য এত কাজ হচ্ছে! ড্রাইভার তার উত্তর দিল, লোকটা কত বড় জান!

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ছেলেটি বলল: এতে টঙ্কা যে খরচ হউছি, কিয়ে দব?

ড্রাইভার বলল: সরকার দব।

এ কথারও মানে আমি বুঝতে পারলুম। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করেছিল, এত টাকা যে খরচ হচ্ছে এ কে দেবে। ড্রাইভার উত্তর দিল, সরকার দেবে। কিন্তু তার পরের কথাগুলি আর বুঝতে পারলুম না।—

দব কহিবনি, দেবে কহ।

তেবে, আমে কন পাইলু?

কাঁহি আমেত কুলি খটিকিরি রোজগার করিলু।

সরকারঙ্কর এই টঙ্কাটা এই ভাবেরে ন খরচ করি অন্য আড়ে খরচ কলে আমর ভল হেই ন থান্তা কি?

আম ভিতরে ইহা ভাবি কিরি লাভ কন!

শেষের কথাগুলি আমি আবার বুঝতে পেরেছিলুম। ছেলেটি বলছিল, টাকাগুলো সরকার এই ভাবে খরচ না করে অন্য ভাবে করলে কি আমাদের ভাল হত না? তার উত্তরে ড্রাইভার বলল, আমরা এ কথা ভাবলে কী লাভ আছে!

ড্রাইভার বিচক্ষণ লোক তাতে সন্দেহ নেই। তাই এই গোলমেলে কথায় থাকতে চায় না। এ সব কথা আলোচনারও বিপদ আছে।

রামানন্দবাবু আমাকে বললেন: অমন মনোযোগ দিয়ে কী শুনছেন?

বললুম: ওড়িয়া কথা।

মানে ?

ওরা কথা বলছে, তাই শুনছি। শুনে যদি কিছু শেখা যায়, এই আশায়।

শিখলেন কিছু ?

তা কিছু শিখলুম বৈকি।

ঋতাও কৌতুক ভরে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : ক্রুষ্ণচরণ, চরণ নয়, চরণ-অ ; আর কৃষ্ণ নয়, ক্রুষ্ণ।

সে কে ?

ড্রাইভারের পাশে যে বালকটি বসেছে তার নাম।

কী করে জানলেন ?

ড্রাইভার তাকে ঐ নামে ডাকছে।

তার কী হয়েছে ?

সে বলছে, গোটে লোকপাঁই এতে কাম হউছি? একটা লোকের জন্যে এত কাজ হচ্ছে! ড্রাইভার তার উত্তর দিচ্ছে, লোকটা, লোক্টা নয়, লোক অটা কেত্তে বড় জানিছ! লোকটা কত বড় জান!

হাসিতে ঋতা উচ্ছল হয়ে উঠল। আরও অনেকে হাসলেন।

নিগমবাবু বললেন : গোপালবাবু দেখছি আজ মুডে আছেন।

হেসে বললুম : রামানন্দবাবু সঙ্গে আছেন বলে।

এক সময় আমরা গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলছিলুম। দু ধারে বাড়ি, মাঝখানের পথ সরু। বাড়িগুলি কোনটি মাটির, কোনটি বা ইট বা পাথরের। কিন্তু দেওয়াল সবই মাটি লেপা। আর একটি বিচিত্র জিনিস দেখছি। সামনের দেওয়ালে সাদা রঙের আলপনা, হয়তো চালের গুঁড়োর রঙ। পাথরের রোয়াক আছে কারও, কিন্তু চাল সবই খড়ের।

দূরে দূরে খেজুর গাছ দেখছি। আর দেখছি প্রচুর নারকেল-

গাছ। রাস্তার ধারে বট গাছের জটলাও দেখেছি। সামনের দিক থেকে গরুর গাড়ি আসছিল কয়েকটা তার ছুই উল্টানো। আমাদের দেশের মতো ছোট ছোট চাকা নয়। সে বিরাট চাকা। এই সব গাড়িতে শুনেছি মাটির মতো ভারি জিনিস বইতে সুবিধে।

আমাদের বাসের শব্দ পেয়ে একটা গরু বেঁকে বসল। কিছুতেই আর পথ ছাড়তে চায় না। নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে। গাড়োয়ান গাড়ি থেকে নেমে গরুটার সামনে দাঁড়াল। তখন আমরা এগোতে পারলুম।

এখন আর কেউ গল্প করছেন না। এখন সবাই কোনারক দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমারও মনে হচ্ছে যেন কোনারক আমরা পৌঁছে গেছি। কিন্তু সত্যিই তো কোনারক পৌঁছয় নি, কোনারক পৌঁছতে এখনও অনেক দেরি আছে।

যে ভদ্রলোক আমাদের নরসিংহ দেবের ইতিহাস শুনিয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ বললেন: কোনারকের মন্দিরের সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে।

সকলের আগে রামানন্দবাবুই কথা কইলেন, বললেন: কী রকম?

সেই ভদ্রলোক বললেন: ধর্মপদের কাহিনী। যে বারো শো শিল্পী মন্দির নির্মাণ করে, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বিষ্ণু মহারাণা। ধর্মপদের জন্মের পরেই বিষ্ণু মহারাণা তার নবজাত পুত্র ও স্ত্রীকে বাড়িতে ফেলে কোনারকের মন্দির নির্মাণে আসে। বছরের পর বছর কাটতে থাকে, কিন্তু বিষ্ণু মহারাণার বাড়ি ফেরার নাম নেই। সব কিছু ভুলে সে মন্দিরই তৈরি করছে। এ দিকে ধর্মপদ বড় হচ্ছে। তার মা তাকে স্থপতির কাজ শিখিয়েছে যত্ন করে। এক দিন ধর্মপদ তার বাপকে খুঁজতে বেরোল। খুঁজতে খুঁজতে কোনারকে এসে দেখে যে তার বাপ মাথায় হাত দিয়ে

বসেছে। হিসেবের একটা ভুলের জন্য মন্দিরের চূড়োটা কিছুতেই শেষ করতে পারছে না। তার বারো শো কারিগরই চুপচাপ বসে আছে। খবর পেয়ে রাজাও রেগেছেন। ধর্মপদ কিন্তু চিন্তিত হল না। বাপকে সে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি ভেবো না বাবা, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। বলে হিসেব ঠিক করে চূড়োটা বসিয়ে দিল। কিন্তু—

কিন্তু কী ?

ছেলে ভাবল, বাপের অসম্মান হল, অসম্মান হল তার বারো শো সঙ্গীর। রাজা কী বলবেন, লোকেই বা বলবে কী! কাজেই তার আর বেঁচে থাকা উচিত নয়।

রামানন্দবাবু প্রতিবাদ করে উঠলেন: সে কি মশাই, ছেলে মরলে বাপের সম্মান বাঁচবে কী করে!

সে কথা ধর্মপদকে জিজ্ঞেস করবেন। আমি বলতে পারব না।

রামানন্দবাবু নিজেই বললেন: ছেলেমানুষ তো, বোধ হয় ভেবেছিল যে সে মরে গেলে লোকে বোধ হয় জানতে পারবে না যে তার বাপ শেষ রক্ষা করতে পারে নি।

হতে পারে।

খুশী হয়ে রামানন্দবাবু বললেন: বলুন তার পরে।

ভদ্রলোক বললেন: ধর্মপদ গিয়ে মন্দিরের চূড়ার উপর উঠল, নিচে দিয়ে বইছে চন্দ্রভাগা।

চন্দ্রভাগা!

চন্দ্রভাগা নদী। সেকালে চন্দ্রভাগা মন্দিরের পাশ দিয়ে বইত।

আজকাল বুঝি নদী নেই ?

বোধ হয় না।

বলুন তার পরে।

ভদ্রলোক বললেন ঃ চূড়ার ওপর থেকে ধর্মপদ নদীতে ঝাঁপ দিল। তার পর আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

বলেন কি!

এই ধর্মপদকে নিয়ে ওড়িয়া সাহিত্যে নাকি অনেক কবিতা ও কাহিনী রচিত হয়েছে। ধর্মপদের কাহিনী জানে না, এমন লোক উড়িষ্যায় কম আছে।

রামানন্দবাবু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ঃ নিতান্ত ছেলেমানুষি করল। এমন করে তার আত্মহত্যা করবার কোন দরকার ছিল না।

অনেক ক্ষণ থেকে পাকা রাস্তা পরিত্যাগ করে আমরা কাঁচা রাস্তা ধরেছিলুম। এই কয়েক মাইল তৈরি হয়ে গেলেই কোনারকের রাস্তা সম্পূর্ণ হবে। পথের ধারে ধারে এবারে ঝাউ গাছ দেখছি। মনে হচ্ছে যেন আমরা সমুদ্রের দিকে চলেছি।

নিগমবাবু বললেন ঃ আর বেশি দূর নেই।

সত্যিই আর বেশি দূর ছিল না। আমাদের গাড়ি এসে আর একখানা বড় বাসের পাশে দাঁড়াল। এইখানেই আমাদের নামতে হবে।

কোনারক পৌঁছে গেছি।

৩১

বাস থেকে নেমে আমরা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলুম। রামানন্দবাবু আমাদের সঙ্গে এলেন না। রাস্তার উপরে কয়েকটি দোকান ছিল। তিনি সেইখানে কিছু অন্বেষণে গেলেন।

পথে আমরা কোন সিংহ দ্বার পেলুম না। একটা বড় গাছের ছায়ার নিচে দিয়ে মন্দিরের অঙ্গনে এসে পৌঁছলুম।

মন্দিরের দিকে তাকিয়েই মনটা চমকে ওঠে। এ কী দেখছি! এ তো কোন জীবন্ত জিনিস নয়। চোখের সামনে কি কোন জাদুঘর দেখতে পাচ্ছি!

বিদেশীরা এই মন্দিরকে বলে ব্ল্যাক প্যাগোডা। কেন এই নাম দিয়েছিল, তা যেন বুঝতে পারছি। উড়িষ্যায় যাকে দেউল বলে সেই মূল মন্দিরটি নেই। সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে পড়েছে। শুধু তার ভিতটা দেখতে পাচ্ছি, আর দেখছি জগমোহন। এ দেশে তাকে মুখশালাও বলে। বিদেশীরা একে মন্দির না বলে যদি প্যাগোডা বলে, তাতে দোষ দেওয়া চলে না। পাথরের রঙও এমন যে তাকে সাদা বলা যায় না। পুরীর মন্দিরের সঙ্গে তুলনায় তা কালোই। বিদেশের নাবিকেরা জাহাজে আসত এই দিকে। প্রথমে তারা পুরীর মন্দির দেখত। তারপর দেখত কোনারকের মন্দির। পুরীর মন্দিরকে বলত হোয়াইট প্যাগোডা। আর একে ব্ল্যাক। আজও বিদেশীরা এই মন্দিরকে ব্ল্যাক প্যাগোডা বলে।

আজ মন্দিরের ভিতর অনেক লোক দেখতে পাচ্ছি। শুধু যাত্রী নয়, অনেক সরকারী লোকও আছে। উর্দি-পরা স্বেচ্ছাসেবকও কিছু আছে বলে মনে হল। কিছু কাজ হচ্ছে। তদারকও হচ্ছে কিছু। এ বোধ হয় রাষ্ট্রপতির আগমন উপলক্ষে বিশেষ তৎপরতা।

একে একে সবাই গেলেন মন্দিরের দিকে এগিয়ে। কেউ

মন্দিরের গায়ের নকশা দেখতে লাগলেন, কেউ আবার ধাপে ধাপে উপরে উঠতে শুরু করলেন। অনেকে উপরে উঠছেন, নামছেনও অনেকে। যে দিকে দেউল ছিল, ধাপগুলো সেই দিকেই। জগমোহনের চূড়ার উপর স্বচ্ছন্দে ওঠা যায়। একেবারে চূড়ায় পৌঁছবার আগে তিন থাক বারান্দার মতো আছে। অনেকে এই বারান্দায় হেঁটে বেড়াচ্ছেন। সারি সারি পুতুল আছে বারান্দায়। মানুষ প্রমাণ তারা। অনেকে এই সবের ছবি তুলছেন। সকলের সঙ্গে আমি সে দিকে গেলুম না। আমি সোজা অপর প্রান্তে চলে গেলুম। দূর থেকে আমরা বিরাটের রূপ দেখি। কাছে যাই ভোগের বুদ্ধি নিয়ে।

একটা দ্বার দিয়ে আমি মন্দির প্রাঙ্গণের বাহিরে গেলুম। ধুলায় ও বালিতে পূর্ণ সেই দ্বার। তার পর উপরে উঠলুম। একটা গাছের নিচে থেকে সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণটি দেখতে পেলুম। এ দিক থেকে প্রথমে নাটমন্দির। অনেকে ভোগ মণ্ডপও বলেন। তার দেওয়াল আছে, ছাদ নেই। দূর থেকেও যেন তার অপরূপ কারুকার্য দেখতে পাচ্ছি।

নাটমন্দির থেকে জগমোহন বিচ্ছিন্ন। নাটমন্দির যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে খানিকটা সমতল ভূমি। তারপর ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠেছে জগমোহনে। এরই পিছনে ছিল দেউল। আজ সেটি নেই। কিন্তু তার পরিকল্পনাটি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কাউকে বলে দেবার দরকার নেই।

এটি একটি বিরাট রথের পরিকল্পনা। মন্দিরের সামনে অশ্ব, দু পাশে চক্র। সাতটি বলবান অশ্ব একটি চব্বিশ চাকার রথকে টানছে। আকাশচারী সূর্য এই সপ্তাশ্ব রথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছেন। সপ্তাহের সাত দিন যেন সাতটি ঘোড়া, বারো জোড়া চাকা, বারো মাসের চব্বিশ পক্ষ। প্রতিটি চাকায় যে আটটি করে স্পোক, তাকে দিনের অষ্ট প্রহর মনে করা যেতে পারে।

আমার পাশে এক ভদ্রলোক ছবি তুলছিলেন। আর এক জন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গিনীকে একখানি ছবি দেখিয়ে কিছু বোঝাচ্ছিলেন। একটি বইএর ছবি। আড়চোখে চেয়ে দেখলুম, সেটি এই মন্দিরেরই একটি সম্পূর্ণ ছবি। এর প্রাঙ্গণের তিন দিকে তিনটি তোরণ। আমরা যে দিকে আছি, সে দিক থেকে তোরণ পেরিয়ে নাটমন্দির। তারপর অরুণ স্তম্ভ। তার পরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে জগমোহন ও দেউল। জগমোহনের চূড়া বর্তমানের মতো ন্যাড়া নয়, তার উপর দেউলের মতো ধ্বজা আছে। বাঁ দিকে একটি অট্টালিকা, ছোট ছোট মন্দির গোটা তিন চার, সমস্ত প্রাঙ্গণটি দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, কোণায় একটি করে ঘর।

ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গিনীকে বললেন : মন্দিরের এই চিত্রটি পার্সি ব্রাউন সাহেব কল্পনা করেছিলেন।

সোমনাথ মন্দিরের কথা আমার মনে পড়ল। এ যুগের লোক সোমনাথেও ভাঙা মন্দির দেখেছিল। সম্পূর্ণ মন্দিরটি কে কল্পনা করেছেন জানি না। নূতন মন্দির নির্মিত হয়েছে পুরনো মন্দিরের মতো করে।

কোনারকে কেউ নূতন মন্দির গড়ল না। নূতন মন্দির গড়া বুঝি সম্ভব নয়। এখানে অনেক সূক্ষ্ম কাজ, অনেক সুন্দর শিল্পমণ্ডিত। মন কোন স্বপ্নময় অতীতে চলে যেতে চায়।

এই পবিত্র স্থানে যে তিন যুগে তিনটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তার পরিচয় আমরা পুরাণ ও ইতিহাসে পেয়েছি।

আকাশের সূর্যকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে প্রথম তাঁর পূজা প্রচলন করেছিলেন কৃষ্ণের পুত্র সাম্ব। সে পুরাণের যুগে। ঐতিহাসিক যুগেও এ স্থানের সমৃদ্ধির পরিচয় পাই। এ অঞ্চলের প্রাচী নদীতে তখনও সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল করতে পারত। দুই তীরে অনেক সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল, আর মন্দির ছিল

অগণিত। সেই সব পবিত্র কাহিনী প্রাচী মাহাত্ম্যে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

এই প্রাচী যেখানে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে, সেই মোহনায় একটি প্রাচীন বন্দর ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউএন চাঙ এখানে এসেছিলেন। বন্দরের নাম লিখেছেন চেলিতালো। কোনারকের আশেপাশে অনেক ভাল গ্রাম ছিল। আর ছিল ব্রাহ্মণের বাস। চন্দ্রভাগা নদীও ছিল এখনকার চেয়ে অনেক বড়।

একটি তালপাতার পুঁথিতে পাওয়া যায় যে কেশরী বংশের এক জন রাজা নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে এই অঞ্চলে একটি সূর্যের মন্দির নির্মাণ করেন। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে এই কথাই লিখেছেন। যোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি লিখেছিলেন যে কোনারকের মন্দির সাত শো তিরিশ বছরের পুরনো। এ কথা মানতে হলে কেশরী রাজার লিখিত কোনারকের দ্বিতীয় মন্দিরের কথাও মানতে হয়।

তার পর অবশ্য আবুল ফজল অন্য কথা লিখেছেন। রাজা নরসিংহ দেবের উল্লেখ আছে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলে। তাঁর বারো বছরের রাজস্ব ব্যয় করেছিলেন, সে কথারও উল্লেখ আছে। মন্দিরের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন যে এখানে আরও আটাশটি মন্দির আছে। উত্তর দ্বারের সম্মুখে ছটি এবং বাইশটি প্রাঙ্গণের বাহিরে।

এই স্থান যে মুসলমানদের কাছেও পবিত্র ছিল, সে কথাও আবুল ফজল লিখে গেছেন। অনেক মুসলমান বলেন যে এখানে কবির মাওয়েলহিদের কবর আছে। অশেষ গুণে ও পাণ্ডিত্যের জন্য ইনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রিয় ছিলেন। তিনি যখন মারা যান তখন ব্রাহ্মণরা তাঁকে পোড়াতে চায় ও মুসলমানরা চায় কবর দিতে। তা নিয়ে যুদ্ধ বাধে আর কি! শেষ পর্যন্ত ঢাকনা তুলে দেখা গেল যে খাটিয়ায় শবই নেই।

তৃতীয় ও বর্তমান মন্দির যে লাঙ্গুড়া নরসিংহ দেব নির্মাণ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন মতান্তর নেই। রাজা তাঁর মন্ত্রী শিবেই সান্তরাকে পদ্মতোলা গণ্ডে মন্দির রচনার ভার দিয়েছিলেন। এই নিয়েও একটি সুন্দর কাহিনী আছে। মন্দির রচনার জন্য শিবেই সান্তরা দিনের পর দিন পাথর ফেলতে লাগলেন। কিন্তু সেই পাথর জলের তলায় কোথায় পৌঁছল তার হদিস পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত ঘুঁটে-কুড়োনির বেশে এলেন দেবী রামচণ্ডী। নিজের কুটীরে সান্তরাকে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। সান্তরা এলে তাঁকে গরম জাউ খেতে দিলেন। সান্তরা যেই তাতে হাত দিলেন, তাঁর হাত পুড়ল। দেবী তখন তাঁকে ধৈর্য ধরতে বললেন। মন্দির নির্মাণেরও কায়দা শেখালেন তাঁকে। ফিরে এসে সান্তরা কোনারকের মন্দির নির্মাণ করলেন। রামচণ্ডীরও মন্দির হল পাশে। স্থানীয় লোক তাকে মায়া দেবীর মন্দির বলে।

এই স্থান তখন পরিত্যক্ত জনশূন্য ছিল না। যে চন্দ্রভাগা এখন মাইল ছুই দূর দিয়ে প্রবাহিত, সে নদী তখন মন্দিরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। সমুদ্রগামী জাহাজ এসে নোঙ্গর ফেলত। প্রাচ্যের সমৃদ্ধ বন্দর ছিল কোনার্ক। অর্ক মানে সূর্য। সূর্যের কোনা বা উড়িষ্যার যে কোণ সূর্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, তারই নাম কোনার্ক। তখন সূর্যের প্রথম আলো পড়ত এই মন্দিরে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে দেউলের ভিতর সূর্যের যে মূর্তি ছিল, তাঁরই মুখে প্রথম সূর্যের আলো পড়ত। শঙ্খঘণ্টার ছন্দোময় ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখর হত। কৃতার্থ হত সমবেত যাত্রীরা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সর্বজনবন্দিত প্রত্যক্ষ দেবতা ছিলেন সূর্য।

আমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখছিলুম। রামানন্দবাবুর কর্কশ কণ্ঠে সেই স্বপ্ন ভেঙে গেল।

বললেন : এখানে একা দাঁড়িয়ে কী করছেন মশাই ?

নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম : মন্দির দেখছি।

তা দূর থেকে কেন, কাছে চলুন।

প্রতিবাদ না করে আমি বললুম : চলুন।

রামানন্দবাবুকে বড় প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। বললেন : এতক্ষণ আপনাকেই খুঁজছিলুম।

আমাকে!

আপনাকে ছাড়া আর কাকে খুঁজব!

আমি কিছু বলতে পারতুম, কিন্তু বললুম না।

রামানন্দবাবু বললেন : হোটেলে খাবার ব্যবস্থা করে এলুম।

এখানে হোটেল আছে?

আছে বৈকি। যদি স্নান করতে চান, তার ব্যবস্থাও আছে। রাতে থাকতেও পারেন। ডাকবাংলোতে তো রাজকীয় ব্যবস্থা। দুটো পরিবার থাকবার ব্যবস্থা।

আপনি থাকবেন নাকি?

পাগল হয়েছেন!

বলে কোটের পকেট থেকে একখানা বই বার করলেন। ইংরেজীতে লেখা কোনারকের সচিত্র বিবরণ। বললেন : বেশ বই মশাই, সব কথা এতে আছে।

সব চেয়ে আনন্দের কথাটি সব চেয়ে শেষে বললেন খুব ধীরে ধীরে। কেউ যেন শুনে না ফেলেন এমনই ভাবে : মেয়েটাকে আমি বেহায়া বলতুম, কিন্তু তা নয়। বেশ সপ্রতিভ মেয়ে, কিন্তু মনটা খুব ভাল। আমাকে ডেকে কী বলল, জানেন?

না।

বলল : আপনার সঙ্গে তো খাবার নেই, আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন।

তাই নাকি!

আমি ইতস্তত করছি দেখে বলল, গোপালবাবুকেও ডেকে নেবেন, আমরা এক সঙ্গে খাব।

আপনি কী বললেন?

রামানন্দবাবু হেসে বললেন : আমি বললুম, ধন্যবাদ। হোটেলে আমি খাবার ব্যবস্থা করেছি।

সে কি!

খুব বিজ্ঞের মতো রামানন্দবাবু মাথা নাড়লেন, বললেন : আমি তো হ্যাংলা নই!

তা তো বটেই। কিন্তু ওদের ছেড়ে আপনি চলে এলেন কেন?

ওঁরা এখন মন্দিরের নক্‌শা দেখছেন, মেয়েদের সঙ্গে দেখতে কেমন লজ্জা হয়।

তাঁর উত্তর শুনে আমার হাসি পেল। বললুম : চলুন, তা হলে আমরা দু জনে দেখি।

উপর থেকে নেমে বালির উপর দিয়ে তোরণের তলা দিয়ে আমরা নাটমন্দিরের সামনে পৌঁছলুম। প্রথমেই চোখে পড়ল দুটি বিরাট সিংহ। থাবা দিয়ে দুটি হাতিকে বসিয়ে দিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে আছে। হাতির শুঁড়ে একটি করে মানুষ জড়ানো। দেখতে সত্যি মানুষ আর হাতির মতোই, কিন্তু সিংহের মূর্তিতে কিছু কল্পনা আছে। এক একটি বিরাট পাথর খুদে এই তিনটি করে মূর্তি তৈরি হয়েছে। আমরা এদের মাঝখান দিয়ে নাট-মন্দিরে উঠলুম।

নাটমন্দিরের ছাদ নেই। শুধু চারি দিকের দেওয়াল আছে। স্থানে স্থানে সূর্যের আলো পড়ে দেওয়ালের মূর্তিগুলি ঝকমক করছে। হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখলুম যে এক ভদ্রলোক একটা বক্স্ ক্যামেরায় তাঁর স্ত্রীর ছবি তুলছেন। বিপুল আয়তনের মহিলা। রঙিন শাড়ির উপর একটা রঙিন ওভারকোট পরেছেন। রঙ কালো, বয়স বেশি নয়। আমাদের দেখে ভদ্রলোক প্রথমটায়

লজ্জা পেয়েছিলেন। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললেন: আমাদের একটা ছবি তুলে দেবেন?

বলে ক্যামেরাটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

নিশ্চয়ই দেব।

বলে ক্যামেরাটি আমি হাতে নিলুম। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোক সাধারণ চেহারার মানুষ। একটু ছোটর দিকেই। স্ত্রীর হাতের আড়ালে ঢাকাই পড়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে এগিয়ে আসতে বললুম।

বক্স্ ক্যামেরার সুবিধা অনেক। আমার মতো আনাড়ী লোকেও অনায়াসে ছবি তুলতে পারে। ছবি তুলে দেবার পরে ভদ্রলোক আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে নেমে গেলেন।

এবারে আমরা দেওয়ালের মূর্তিগুলি দেখতে লাগলুম। একদা এই মন্দিরে যে সুন্দরীদের নৃত্য গীত হত, তার জীবন্ত চিত্র প্রাচীরে ক্ষোদিত। কত বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কত ভঙ্গিতে লীলায়িত নারী। খোল ও মৃদঙ্গের প্রচলন যে সমধিক ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আর পুরুষের বদলে সে সব বাজাত নারী। পুরুষের মতো কঠিন হাতে বাজাত না, বাজাত নৃত্যের ভঙ্গিমায়। সমস্ত দেওয়াল জুড়ে তারা যেন আজও নাচ গান করছে।

রামানন্দবাবু বললেন: কত সূক্ষ্ম কাজ, কত ধৈর্যের কাজ। এই শতাব্দীর মানুষের আজ আর এত ধৈর্য নেই।

শুধু ধৈর্য নয়, শখ বলুন। যারা এই কাজ করত, তারা পরিশ্রমের মূল্য পেত। তাই তাদের ধৈর্যের অভাব হত না। এখন এই পরিশ্রমের মূল্য কে দেবে, কার শখ আছে! কে এমন অপর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করবে মন্দির নির্মাণে!

নাটমন্দির থেকে নেমে আসতে আসতে রামানন্দবাবু বললেন: আমাদের দেশে কি বড়লোকের অভাব আছে?

নেই। সেই বড়লোকরা বড় বড় কাজ করছেন। বড় বড় কল কারখানা কলেজ হাসপাতাল, দু একটা মন্দির ধর্মশালাও। লক্ষ লক্ষ কেন, কোটি কোটি টাকাও খরচ করছেন আরও অর্থ ও যশের জন্য। শখের জন্য নয়। তাই তাঁদের সভায় নবরত্নের আদর নেই, জ্ঞানী গুণী গায়ক কবি বীর কুস্তিগীর তাঁদের কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। গুণের আদর দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে।

রামানন্দবাবু ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি বললুম: এগিয়ে চলুন।

নাটমন্দির ও জগমোহনের মাঝখানে প্রায় তিরিশ ফুটের ব্যবধান। এক ভদ্রলোক বলছিলেন: এখানে একটি অরুণ স্তম্ভ ছিল। চৌত্রিশ ফুট উঁচু ষোল কোনা স্তম্ভ। তারই মাথায় অরুণের মূর্তি।

আর এক জন বললেন: অরুণ মানে তো সূর্য!

অরুণ মানে প্রত্যূষের সূর্য। এখানে সূর্যের সারথি। গরুড়ের ভাই।

এই স্তম্ভ কোথায় গেল?

পুরীর সিংহ দ্বারের সামনে দেখেন নি! অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক জন মারাঠা সাধু এই স্তম্ভ এখান থেকে নিয়ে গিয়ে পুরীতে স্থাপন করেছেন।

রথের ঘোড়াগুলি আমরা ভাল করে দেখলুম। অত্যন্ত বলশালী জীবন্ত ঘোড়ার মতো। তাদের প্রথম তিনটির মুখ সামনের দিকে, বাকি দু জোড়ার দু দিকে মুখ—অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে। সপ্তাশ্বের ভঙ্গি দিয়ে শিল্পীরা কালের যাত্রাকে পাথরে দেখিয়েছে।

তার পর রথের চাকা। মন্দিরের গায়ে এই চক্র। অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত। এমন একটু স্থান নেই যেখানে শিল্পীদের হাত পড়ে নি। শুধু ফুল লতাপাতা নয়, এমন অনেক সংকেত আছে যা এখন দুর্বোধ্য। অনেকে জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যার সাংকেতিক চিহ্ন বলে মনে করেন। স্থানে স্থানে অলসকন্যার মূর্তি।

এত সংকীর্ণ স্থানে এমন নিখুঁত মূর্তি কী করে সম্ভব, সেই ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

বিজয়নগরেও এমনই একটি পাথরের রথ আছে শুনেছি। সেটিও অপরূপ সুন্দর। ভারতে একটা শিল্পের যুগ গেছে। তখন এই বিরাট দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শিল্পীরা সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় তার শুষ্ক বিবরণ নেই, আছে মন্দিরে মন্দিরে তার অক্ষয় স্বাক্ষর।

আমরা এবারে জগমোহন দেখলুম ঘুরে ঘুরে। মন্দিরের বাহিরের গাত্র। জীবনের কী বিচিত্র প্রকাশ। কোনখানে আঙুরের ক্ষেত থেকে থোকায় থোকায় আঙুর ঝুলছে। জিরাফ তার গলা বাড়িয়ে সেই আঙুর খাচ্ছে। কোনখানে খাটের উপর জোড়া বালিশ। তার উপরে নারী। স্বামী তার পাশে বসে গল্প করছে। অন্যত্র ঋষি বসে আছেন তপস্যায়। আবার কোথাও নাচের দল। তারা নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে। কোথাও এদের আকৃতি এত বড় যে মনে হবে যাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্যই তারা অপেক্ষা করছে। সখীরা দাঁড়িয়ে আছে স্মিত মুখে। সেই লাবণ্যময় সুন্দর সখীদের দেখে যাত্রীদের মনও যে প্রসন্ন হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কোনখানে রাজা চলেছেন পদাতিকের পুরোভাগে। হাতি আর উট। সাপও লতার মতো জড়িয়ে আছে।

অশ্লীল মূর্তিও অনেক চোখে পড়েছে। মিথুন মূর্তি। চোখ নামিয়ে নিতে হচ্ছে। পাশে কেউ না থাকলে হয়তো চেয়ে থাকা যেত। কিন্তু সর্বত্র মানুষ। সবাই না দেখার ভান করে দেখছে, আর সরে যাচ্ছে।

রামানন্দবাবু বললেন: চলুন, ওপরে যাই।

বললুম: চলুন।

উপর থেকে সবাই এখন নেমে আসছেন। আমরা উঠতে লাগলুম। প্রথমেই ভাঙা দেউলটা চোখে পড়ে। জগমোহন এক

শো তিরিশ ফুট উঁচু, কিন্তু দেউল দু শো সত্তর ফুটের কম ছিল না। দেউলের দেওয়াল আজ নেই। শুধু ভিতটা আছে। গর্ভগৃহ চতুষ্কোণ ছিল, মাঝখানে ছিল দেবতার বেদী। উপরে উঠবার সময় আমরা এই স্থানটি দেখে নিলুম।

রামানন্দবাবু আমার পিছনে উঠছিলেন। কথা বলছিলেন না একটিও। কোন দিকে চেয়েও দেখছিলেন না।

অনেকটা উঠে আমরা একটা সমতল স্থান পেলুম। এটি চারি দিক পরিক্রমার পথ। খানিকটা দূরে দূরে এক একটি অদ্ভুত সুন্দর নারী মূর্তি। নানা বইএ এই মূর্তিগুলির চিত্র দেখেছি। অলংকৃতা নারী, কিন্তু উপরের অংশ অনাবৃত। জীবন্ত ভঙ্গিতে ঢোলক বাজাচ্ছে, খোল বাজাচ্ছে, বাজাচ্ছে মন্দিরা। লম্বা বাঁশির মতো যন্ত্রও বাজাচ্ছে। আমরা ঘুরে ঘুরে এই মূর্তিগুলি দেখতে লাগলুম।

আরও উপর থেকে কয়েক জন নামছিলেন। রামানন্দবাবু তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন: ওপরে কী আছে?

এক জন বললেন: এই রকম আরও মূর্তি।

আর এক জন বললেন: যান না ওপরে। আরও দুটো তলার ওপর চূড়ো পাবেন। ভাল লাগবে।

রামানন্দবাবু আমাকে বললেন: বোঝা গেছে।

আমি বললুম: উঠবেন না বুঝি?

অকারণে পরিশ্রম করে কী হবে!

আমি বুঝতে পারলুম যে ধাপ ভেঙে ভেঙে উপরে উঠতে তাঁর ভয় করছে। মুখে তিনি তা প্রকাশ করতে চাইছেন না।

এক জন জিজ্ঞাসা করলেন: সূর্যের মূর্তি দেখেছেন?

রামানন্দবাবু চমকে উঠে বললেন: না তো!

আসুন এই দিকে।

সেই ভদ্রলোককে অনুসরণ করে আমরা সূর্যের মূর্তি দেখলুম।

দেওয়ালের গায়ে অপরূপ সুন্দর মূর্তি। এমন মূর্তি আমরা আর কোথাও দেখি নি। মর্মরের নয়, কালো পাথরের নয়, এ এমন এক রকম পাথর যা ধাতু বলে ভ্রম হতে পারে। দেওয়াল সেখানে কুলুঙ্গির মতো। তার ভিতর এই মূর্তি স্থাপিত। কোমরে সামান্ত আবরণ, অলংকারের মেখলা। গলায় মালা, উপবীত। কানে ও বাহুতে অলংকার। মাথায় মুকুট। শুধু হাত দুখানি বাদে এই মূর্তির আর সব কিছু অক্ষুণ্ণ আছে। যে কুলুঙ্গির ভিতর এই সূর্যের মূর্তি, সেটিও অকৃপণ ভাবে অলংকৃত। দেবতার পায়ের কাছে অনেক সুন্দর মূর্তি, দু জনে বন্দনারত। আরও নিচে সাতটি তেজস্বী অশ্ব। কল্পনার আশ্রয় নিলে মনে হবে সপ্তাশ্ব রথের উপর সূর্য সানুচরে দাঁড়িয়ে আছেন।

যে ভদ্রলোক আমাদের দেখাতে এনেছিলেন তিনি বললেন: এই রকম মূর্তি আরও দুটি আছে। এক পূর্ব দিক ছাড়া আর তিন দিকেই তিনটি মূর্তি। কিন্তু সূর্যের আলো শুধু এরই উপর।

আমাদের দেখা শেষ হলে ভদ্রলোক বললেন: আপনাদের সঙ্গে ক্যামেরা নেই বলেই দেখে তৃপ্ত হলেন। ক্যামেরা থাকলে হতেন না।

কেন?

সূর্যের মুখের ওপর আলো নেই, আছে নিচে। এখন ছবি নাকি অত্যন্ত খারাপ হবে। ফেরার আগে আবার অনেকে ছবি নিতে উঠবেন।

রামানন্দবাবু বললেন: আমরা আর উঠব না।

আমাদের ওঠবার প্রয়োজন নেই, তবু মনে হল রামানন্দবাবু অন্য কারণে এই কথা বলছেন।

অনেকটা নেমে এসে একটা নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে রামানন্দবাবু বললেন: কাণ্ড দেখেছেন মশাই?

না।

ওই মহিলার কাণ্ড দেখুন। ঘোমটার নিচে বাইনকুলার লাগিয়েছেন।

সোজাসুজি তাকিয়ে দেখলুম। প্রাঙ্গণের শেষ প্রান্তে একটা গাছের ছায়ায় নিগমবাবু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বসেছেন। কাছেই দুখানা পাতা দেখে বুঝতে পারছি যে খাওয়াদাওয়া সেরে তাঁরা এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। নিগমবাবু আমাদের দেখতে পেয়েই তাঁর স্ত্রীকে কিছু বললেন। মহিলা তৎক্ষণাৎ তাঁর ঘোমটা আরও খানিকটা টেনে দিয়ে বাইনকুলার লুকিয়ে ফেললেন।

তাঁর দৃষ্টি যে সুস্থ কোন বস্তুর উপর ছিল না, তাতে আমার সন্দেহ রইল না। রামানন্দবাবুও বোধ হয় এই রকম কিছু সন্দেহ করেছিলেন। বললেন: মন্দিরে এই রকম অশ্লীল মূর্তি যে কেন রাখে, তা বুঝি না।

বললুম: আপনার বইএ বোধ হয় কোন আলোচনা আছে।

আমি এই প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা পড়েছি। শুনেছিও কিছু। এক বার এক কথক ঠাকুর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, এ সব যাত্রীদের জন্য। বাসনা কামনা সব মন্দিরের বাইরে রেখে আসতে হবে, এ তারই নির্দেশ। কিন্তু এ নির্দেশ এমন বীভৎস ভাবে দেবার দরকার ছিল না।

এক জনকে বলতে শুনেছি যে এই সব অশ্লীল মূর্তি দেখে মনে একটা ঘৃণার ভাব আসে। এটিই নাকি উদ্দেশ্য। নগ্ন কামনা যে সর্বতো ভাবে বর্জনীয়, এই মূর্তিগুলি মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে তা মনে করিয়ে দেয়। এই ধাক্কাতেই মনের প্রবাহ বদলে যায়, মন অন্তর্মুখী হয়, আধ্যাত্মিকতার প্রতি ও দেবতার প্রতি হয় শ্রদ্ধাশীল।

অনেকে বলেন যে সে যুগের রুচিতে এ সব মূর্তি বর্জনীয় বলে মনে হয় নি। অন্যান্য নানা মূর্তির সঙ্গে অশ্লীল মূর্তিও অলংকার রূপে স্থান পেয়েছে।

কোন একটি বইএ পড়েছিলুম যে সংস্কৃত শাস্ত্রে কয়েকটি শ্লোক আছে এই বিষয়ে। কোন গৃহে বা মন্দিরে এই সব অশ্লীল মূর্তি থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে তা রক্ষা পায়। বজ্র বিদ্যুৎ বা ঝঞ্ঝা ঝটিকায় মন্দিরের কোন ক্ষতি হয় না। এ যুক্তিও আমার নিকট গ্রহণীয় বলে মনে হয় নি।

পণ্ডিতরা মনে করেন যে এ অঞ্চলে একটা বৌদ্ধ প্রভাব ছিল। তখন এ অঞ্চল ছিল সমৃদ্ধিশালী। তার পর হিন্দুরা এসেছে। তান্ত্রিকরা অধিকার করেছে বৌদ্ধদের স্থান। অভিজ্ঞতায় যে আত্মার মুক্তি ও তান্ত্রিক বিশ্রাম। শুধু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা নয়, জৈবিকও বটে। এই সব মিথুন মূর্তি তাই অবশ্যম্ভাবী রূপে এসে পড়েছে। শুধু কোনারকে নয়, শুধু ভুবনেশ্বরে নয়, সারা ভারতবর্ষে— খাজুরাহে মাদুরায় ও দ্বারকায়।

এ সবই মনগড়া কথা, মনগড়া যুক্তি। সত্য কথা কারও জানা নেই বলেই এই সব মনগড়া কথার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

বিদেশীরা আমাদের রুচির নিন্দা করেছেন, অসভ্য বলেছেন। কিন্তু সৌন্দর্য বোধের প্রশংসা না করে পারেন নি। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকরা সবাই এক বাক্যে সুখ্যাতি করে গেছেন। ডক্টর ব্লক বলেছেন, মনে রাখতে হবে যে পুরাকালে ভারতীয়দের অশ্লীল শব্দ ও তার সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। কালিদাস ও আরও অনেক সংস্কৃত কবির সমস্ত লেখায় এমন অনেক দৃশ্য ও বর্ণনা আছে যা মহিলা শ্রোতাদের বুঝিয়ে বলা চলে না। কিন্তু এ কথা মনে করবার কোন যুক্তি নেই যে সে যুগে কোন লোক এই সব লেখার বা ব্ল্যাক প্যাগোডার জীবন্ত মূর্তিতে আপত্তি তুলেছিল। এ যুগের ধারণায় হয়তো মূর্তিগুলি অশ্লীল মনে হবে। কিন্তু তাই বলে শিল্পীরা দোষদুষ্ট ছিলেন, এ কথা বললে অত্যন্ত অন্যায় হবে।

কেন জানি না, এই মন্তব্য আমার কাছে অসম্মানের মনে

হয়েছে। হয়তো তা নয়, তবু আমি এ যুক্তিও মানতে রাজী হই না। শিল্পীর মন তো পরাধীন নয়, তারা স্বাধীন ভাবে কোন শিল্পকর্ম করে গেছেন। তা নিয়ে আজ বিচার বিবেচনা কেন।

রবীন্দ্রনাথের কথা আমার মনে পড়ল। ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখার পর তিনি লিখেছিলেন, দেখিলাম মন্দির ভিত্তির সর্বাঙ্গে ছবি খোদা। কোথাও অবকাশ মাত্র নাই! যেখানে চোখ পড়ে এবং যেখানে চোখ পড়ে না, সর্বত্রই শিল্পীর নিরলস চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ছবিগুলি বিশেষ ভাবে পৌরাণিক ছবি নয়; দশ অবতারের লীলা বা স্বর্গলোকের দেবকাহিনীই যে দেবালয়ের গায়ে লিখিত হইয়াছে, তাও বলিতে পারি না। মানুষের ছোট-বড়ো ভালো-মন্দ প্রতিদিনের ঘটনা—তাহার খেলা ও কাজ, যুদ্ধ ও শান্তি, ঘর ও বাহির, বিচিত্র আলেখ্যের দ্বারা মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ছবিগুলির মধ্যে কোন উদ্দেশ্য দেখি না, কেবল এই সংসার যেমনভাবে চলিতেছে তাহাই আঁকিবার চেষ্টা। সুতরাং চিত্র-শ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিস চোখে পড়ে যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।

—কোনো গির্জার মধ্যে গিয়া যদি দেখিতাম, যেখানে সেখানে ইংরেজ সমাজের প্রতিদিনের ছবি ঝুলিতেছে—কেহ খানা খাইতেছে, কেহ ডগকার্ট্ হাঁকাইতেছে, কেহ হুইস্ট খেলিতেছে, কেহ পিয়ানো বাজাইতেছে, কেহ সঙ্গিনীকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া পল্‌কা নাচিতেছে, তবে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতাম। বুঝিতাম স্বপ্ন দেখিতেছি—কারণ গির্জা সংসারকে সর্বতোভাবে মুছিয়া ফেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। মানুষ সেখানে লোকালয়ের বাহিরে আসে—তাহা যেন যথাসম্ভব মর্ত সংস্পর্শবিহীন দেবলোকের আদর্শ।

তাই, ভুবনেশ্বর মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিস্ময়ের আঘাত লাগে। স্বভাবত হয়তো লাগিত না, কিন্তু আশৈশব ইংরেজি শিক্ষায় আমরা স্বর্গ-মর্তকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি। সর্বদাই সন্তর্পণে ছিলাম। পাছে দেব-আদর্শে মানবভাবের কোন আঁচ লাগে, পাছে দেবমানবের মধ্যে যে পরম পবিত্র সুদূর ব্যবধান, ক্ষুদ্র মানব তাহা লেশমাত্র লঙ্ঘন করে।

এখানে মানুষে দেবতায় একেবারে যেন গায়ের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিশীল, কর্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসকোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া প্রতিমূর্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

মন্দির থেকে নেমে এসে আমরা খেতে গেলুম। রামানন্দবাবু কোনারকের হোটেলে খাবেন। আমি খাব পুরীর হোটেলের খাবার। বললুম : আসুন, আমরা দু জনে ভাগ করে খাই।

অন্য যাঁরা এসেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই খাচ্ছেন মন্দিরের প্রাঙ্গণে গাছের ছায়ায়। মন্দিরের দিকে তাকিয়ে নিজেদের খাবার বোধ হয় আরও মধুর লাগছে। আমরা গিয়ে হোটেলে উঠলুম।

আহারের পর আমরা বাকি দর্শনীয় স্থান দেখতে বেরলুম।

প্রথমে দেখলুম জাদুঘর। তারপর গেলুম নবগ্রহের মন্দিরে। যে সব মূর্তি চারিদিকে ছড়ানো ছেটানো ছিল, সেই সমস্ত একত্র করে জাদুঘরে রাখা হয়েছে। নবগ্রহের মূর্তিও কিছু দিন আগে জাদুঘরেই ছিল। স্থানীয় লোকের অনুরোধে ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে এটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি শনিবারে এখানে পূজার জন্য শত শত লোক সমবেত হয়।

একটি বিরাট ভারী পাথরের উপর নবগ্রহের মূর্তি। বামে সূর্য, দক্ষিণে রাহু, মাঝখানে অন্যান্য গ্রহ। জানা গেল, এই মূর্তিগুলি জগমোহনের সিংহ দ্বারের উপরে ছিল। ইংরেজ সরকার এই পাথরখানি লণ্ডন মিউজিয়ামে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। বহু পরিশ্রমে নাকি এটি কয়েক গজ মাত্র সরানো গিয়েছিল। কেটে দু খণ্ড করেও সরানো সম্ভব হয় নি। তার পরে ফিরিয়ে এনে এখানকার মিউজিয়ামেই রাখা হয়েছে। স্থানীয় লোক এটি দৈব ঘটনা বলে বিশ্বাস করে।

মন্দিরের দক্ষিণ দিকে যে মঠ আছে সেটি আমরা দেখতে গেলুম না। শুনলুম, সেটি শূন্য সাধনার মঠ। যে বাবাজীরা থাকেন তাঁরা নিজেদের অবধূত বলেন। লোকে বলে যে এই

মঠে কুষ্ঠরোগ ভাল হয়। হতেও পারে। সাম্বও তো ভাল হয়েছিলেন।

ইন্স্‌পেক্সন বাংলোর পূর্ব দিকে নূতন এরোড্রোম তৈরি হয়েছে। শৌখিন লোকেরা ভুবনেশ্বর থেকে বেড়াতে আসেন উড়োজাহাজে। খাজুরাহো দেখতেও মানুষ আজকাল উড়োজাহাজে আসেন। পান্নায় নেমে তাঁদের মোটরে উঠতে হয়। এখানে সে কষ্টটুকুও স্বীকার করতে হয় না।

নবগ্রহের মন্দির থেকে বেরিয়ে কোথায় বসব ভাবছি। এমন সময় দেখা হল ঋতার সঙ্গে। বলে উঠল: আপনারা এখানে! আমরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছি।

কেন ?

কিছু খেতে পেয়েছেন কি ?

রামানন্দবাবু খুশী হয়ে বললেন: অনেক ধন্যবাদ।

তবে একটা লজেন্স খান।

বলে এক মুঠো লজেন্স এগিয়ে দিল।

রামানন্দবাবু নিতে পারলেন না। আমার দিকে হাত বাড়াতেই আমি একটি তুলে নিলুম। রামানন্দবাবু নিলেন আমার পরে। তার পরে কাগজ ছাড়িয়ে মুখে পুরেই বললেন: চমৎকার।

ঋতা বলল: তবে আর একটা নিন।

গম্ভীর ভাবে রামানন্দবাবু বললেন: নো, থ্যাঙ্ক্‌স্।

এই মুহূর্তে আমার আর একটা কথা মনে পড়ল। রামানন্দবাবু বলেছিলেন, ঋতা তাঁকে এক সঙ্গেই খাবার অনুরোধ করেছিল, কিন্তু তিনি রাজী হন নি। তিনি তো হ্যাংলা নন!

আমি বললুম: আমাকে একটা দিন।

রামানন্দবাবু বললেন: নীরদবাবুকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

ঋতা হেসে বলল: দাদা বৌদি বসে পড়েছেন।

কোথায় ?

ঐ হাতিটার পাশে।

হাতিটা আগে আমরা ভাল করে দেখি নি। বাঁ দিকের সামনের পা তার ভাঁজ করা, শুঁড়ে একটা মানুষ জড়িয়ে আছে। উচ্ছল খুশি খুশি ভাব। যেন নাচছে। এই হাতিটারই নাম নাকি ডান্‌সিং এলিফ্যাণ্ট।

রামানন্দবাবু বললেন: আসুন, আমরাও কোথাও বসি।

ঋতা বলল: সেই ভাল।

তারপর রামানন্দবাবু একটা কঠিন কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ভরা পেটে ঘুরে বেড়াতে তাঁর ভাল লাগছিল না। ছায়ায় এক খণ্ড সবুজ ঘাসের উপর বসে তাঁর তত্ত্বকথা মনে পড়ল। বললেন: এই মন্দির কেন ভেঙে পড়ল জানেন ?

ঋতা বলল: কালাপাহাড় ভেঙে দিয়ে গেছে।

রামানন্দবাবু বললেন: কিছু বিচিত্র নয়। নিজের ধর্ম যে পরিত্যাগ করতে পারে, তার পক্ষে সবই সম্ভব।

ঋতা বলল: না না, এ অনুমানের কথা নয়। উড়িষ্যার অনেক মন্দির কালাপাহাড় ধ্বংস করে।

বললুম: এ তো ইতিহাসের কথা। কিন্তু এই মন্দিরও ধ্বংস করেছিল কিনা তার প্রমাণ নেই।

রামনন্দবাবুকে বললুম: আপনার পকেটের বইখানা বার করুন না।

ঋতা আশ্চর্য হল: পকেটে আবার বই আছে নাকি!

গর্বিত ভাবে রামানন্দবাবু তাঁর বই বার করলেন। পাতা উল্টে উল্টে একটা জায়গা বারও করে ফেললেন। তার পর নিজে পড়ে নিয়ে আমাদের শোনালেন: সবই দেখছি প্রবাদ ও অনুমানের কথা। সত্য ঘটনা কেউই জানে না। সেই যে ভদ্রলোক ধর্মপদের আত্মহত্যার কাহিনী শোনালেন, এখানে অন্য কথা দেখছি।

ধর্মপদ যখন মন্দিরটা শেষ করল, তার বাবার সঙ্গীরা তাকে ওপর থেকে ফেলে দিল। এই ছেলেটা মরে গেলে তাদের অসম্মানের কথা কেউ জানবে না। মন্দিরের পাথরে আজও নাকি রক্তের দাগ লেগে আছে।

ঋতা বলে উঠল : সত্যি!

রামানন্দবাবু নিজেই বললেন : না, সত্যি নয়। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন যে এ কথা সত্য হতে পারে না। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করে যে এই পাপেই মন্দিরটা অকালে ধ্বংস হয়েছে।

আমি বললুম : আমি অন্য একটা গল্প শুনেছি। এই মন্দিরের ওপরে নাকি একটা লোড স্টোন ছিল। বাঙলায় তাকে চুম্বক লোহা বলে, না চুম্বক পাথর বলে জানি না। এই জিনিসের এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে সমুদ্রের জাহাজকে পারের কাছে টেনে আনত। নাবিকদের নাকি ভারি অসুবিধা হত। বিরক্ত হয়ে এক জাহাজের নাবিকরা এক রাতে চুপিচুপি এসে মন্দির আক্রমণ করে। ওপরটা ভেঙে সেই পাথর বার করে নিয়ে যায়। সকালবেলায় মন্দিরের পুরোহিত ভাবলেন—এ ভারি অমঙ্গল হল। মন্দিরের বিগ্রহ নিয়ে গিয়ে তিনি পুরীতে প্রতিষ্ঠা করলেন।

রামানন্দবাবু বলে উঠলেন : সত্যি নাকি ?

বললুম : জগন্নাথের মন্দিরের ভেতর কোনারকের সূর্য মূর্তি দেখেন নি ?

সূর্য মূর্তি একটা দেখেছি বটে।

ওটা কোনারকের। মন্দিরের পুরোহিত তা নিয়ে গিয়েছেন, না খুর্দার রাজা নরসিংহ দেব তা নিয়ে গিয়ে জগন্নাথের মন্দির প্রাঙ্গণে ইন্দ্রের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন, তা বলতে পারব না। তবে এই বিগ্রহ সরাবার পর মন্দিরের যত্ন আর রইল না। তার পর মন্দির ঝড়ে ভাঙল, না ভূমিকম্প বা বজ্রাঘাতে, সে খবর আর

কেউ রাখল না। সরকারী লোকেরা বলে যে স্থানীয় লোকেরাও নাকি টানাটানি করে মন্দিরের লোহা বার করে নিয়েছে। আর মারাঠা সরকার পুরীতে কোন সাধারণ মন্দির তৈরির জন্যে দেওয়ালের ইট পাথরও খুলে নিয়ে গেছে।

ঋতা বলল: পুরীতে ফিরে আমরা সূর্যের মূর্তি দেখব।

বললুম: ভুবনেশ্বরের জাত্নঘরেও দেখবেন।

কেন?

কিছু দিন আগে কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল। কটকের একটা পুকুরে সূর্যের সুন্দর মূর্তি পাওয়া গেছে। পণ্ডিতেরা বলেছেন যে সেইটিই কোনারকের মূল মূর্তি। এখন এটি ভুবনেশ্বরের জাত্নঘরে আছে।

রামানন্দবাবু তাঁর বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন: দাঁড়ান, কালাপাহাড়ের সম্বন্ধে কী লিখেছে দেখি। পেয়েছি। এ যে বোমা ফাটিয়ে দধিনৌতি ভেঙেছে দেখছি।

দধিনৌতি কী?

আর্চ স্টোন। সেটা ভেঙে পড়লে মন্দিরও যে গেল!

রামানন্দবাবু আরও কয়েক লাইন পড়ে বললেন: ঐ যে বিরাট সবুজ পাথরটা পড়ে আছে ওটি নাকি মন্দিরের ভেতরে ছিল। কী সাংঘাতিক!

পড়তে পড়তেই রামানন্দবাবু বললেন: কালাপাহাড় ভেঙে ছিল আধখানা। বাকি আধখানা ১৮৯২ সালের ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। সে সাধারণ ঝড় নয়, সাইক্লোন। সমুদ্র থেকে চন্দ্রভাগার ওপর দিয়ে ছুটে এসেছিল। এখনও দু এক জন বৃদ্ধ বেঁচে আছেন, যাঁরা এই ঝড় দেখেছিলেন। সমস্ত জগমোহনটা বালির তলায় চাপা পড়েছিল। বাঙলা সরকার লোক লাগিয়ে সেই বালি সরিয়ে ছিলেন ১৯০৪ সালে।

ঋতা জিজ্ঞাসা করল: বাঙলা সরকার কেন?

রামানন্দবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যার তখন একটা সরকার ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়। মনে নেই সেই আন্দোলনের কথা!

ঠিক ঠিক।

ঋতা বলল: আমার কী মনে হয় জানেন? আমার মনে হয় মন্দিরটা নিজেই ধসে পড়েছে। চারি দিকে যত বালি দেখছি, বোধ হয় বালির ওপরেই ভিত করেছিল।

রামানন্দবাবু বললেন: একেবারে খাঁটি কথা। এই বইএ লিখেছে। বালি জমে চন্দ্রভাগার মুখ বুজে গিয়েছিল। সে নদী এখন দূর দিয়ে বইছে। এই মন্দিরের তলাতেও বোধ হয় বালি ছিল।

আমি বললুম: আপনার গবেষণা গ্রন্থে আপনি এ সমস্ত আলোচনা করবেন।

আমাদের বোধ হয় ফেরবার সময় হয়েছিল। সবাই ফিরছিলেন। কী দেখলুম আর কী দেখলুম না, সে কথা ভাবতে ইচ্ছা হল না। যা দেখেছি, তাতেই মন ভরে গেছে।

সামনে এক জন ভদ্রলোক বলছিলেন: উড়িষ্যার ওপর অনেক ভাল ভাল বই আছে। নির্মলকুমার বসু তো কোনারকের মন্দিরের ওপরেই একখানা বই লিখে ফেলেছেন। স্থাপত্যের বই।

আর এক জন বললেন: নাম-করা পুরাতাত্ত্বিকেরাও কোনারকের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। ফার্গুসন মার্শাল ব্রাউন হ্যাভেল হাণ্টার স্টার্লিং—

অন্য এক জন জিজ্ঞাসা করলেন: কী বলেছেন?

সকলের কথা যদি জানতে চান তো সরকারী গাইড বই একখানা যোগাড় করবেন। দু এক জনের কথা আমার মনে আছে।

তাই বলুন না।

ভদ্রলোক বললেনঃ ফার্গুসন বলেছেন যে তাঁর মতে মন্দিরের বাইরের কারুকার্য ভারতবর্ষে এই শ্রেষ্ঠ। তিনি এর চেয়ে ভাল কিছু দেখেন নি?

ভেতরের কারুকার্য তা হলে ভাল আছে?

নিশ্চয়ই আছে। দিলওয়ারার মন্দিরে তো শুধু ভেতরটিই দেখবার। বাইরে কিছুই নেই।

এখানে আবার ভেতরে যাবার পথই বন্ধ। বাঙলার কোন ছোট লাট মন্দির রক্ষার জন্যে বালি দিয়ে ভেতরটা বন্ধ করে দিয়েছেন।

আমার মনে হল, ফার্গুসনের সঙ্গে আমি এক মত নই। মধ্য-ভারতের খাজুরাহে যা দেখেছি, আর দক্ষিণ ভারতের সোমনাথপুর বেলুর ও হালেবিদে, কিংবা ইলোরার কৈলাস মন্দিরে, তারও তুলনা নেই। কোন্‌টা বেশি ভাল, তা এমন অসংকোচে বলা চলে না। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলিই কি কিছু নিকৃষ্ট? তবে একটা কথা আছে। এমন সামগ্রিক কল্পনা আর কোথাও নেই। সমস্ত মন্দির যেন এক-খানি রথ, সাতটি বলবান অশ্ব তা টানছে। এমন সুন্দর নাটমন্দির, এমন বড় বড় জীবন্ত মূর্তি। এ মন্দির যখন অক্ষত ছিল, আর গম-গম করত যাত্রীর সমাগমে, তখন একে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মন্দির বলতেও দ্বিধা করতুম না। বিশপ হেবার ঠিকই বলেছেন যে ভারতীয়দের কাজ হল টাইটানদের মতো বিরাট আর জহুরীদের মতো সূক্ষ্ম।

সেই ভদ্রলোক আবার বললেনঃ জন মার্শাল বলেছেন যে মন্দিরের সবটা না দেখেই ফার্গুসন অত সুখ্যাতি করেছিলেন। মন্দিরের চাকা ও ঘোড়াগুলো তাঁর সময়ে মাটির নিচে ঢাকা ছিল। পরে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। তিনিও ফার্গুসনের সঙ্গে এক মত। হিন্দুদের এমন মন্দির আর কোথাও নেই।

আমার মনে পড়ল আর এক জনের কথা। তিনি বলেছিলেন, কোনারক এমন একটি জাতির শিল্পকর্মের নিদর্শন যারা আঁকতে জানত, ভালবাসতে জানত, পূজা করতে জানত, আর জানত এমন সুন্দর জিনিস নির্মাণ করতে।

বাসের কাছে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলুম। এবারে আমরা পুরী ফিরব।

সূর্যের তেজ এখন স্তিমিত হয়েছে।

৩৩

ফেরার পথে একটা বেদনার সুর বাসের মধ্যে গুনগুন করে উঠেছিল। এক জন বলেছিলেন : আমরা কাল ফিরে যাচ্ছি।

কালই ?

হ্যাঁ। দেখা তো সবই শেষ হল। এবারে ঘরে ফিরব।

দেখা তো আমাদেরও শেষ হয়েছে। আমরাও কি ঘরে ফিরব! ঘরে ফেরার নামে আমার বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে। আমার ঘর কোথায়! ঘরের টানই বা কী! ঘর কী আমার কোন দিন হবে!

রামানন্দবাবু নীরদবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনারা এখন থাকবেন তো কিছু দিন ?

না।

না মানে ?

আমরাও দু এক দিন পর ফিরব।

রামানন্দবাবু সোজা হয়ে বসলেন, বললেন : বলেন কী!

স্বল্পভাষী নীরদবাবু এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। আমি রামানন্দবাবুর দিকে তাকালুম। আর ঋতা তাকাল আমার দিকে।

এ নিয়ে বাসে আর কোন কথা হয় নি।

পুরীর হোটেলে চা খেয়ে আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরোলুম। রামানন্দবাবু কোটের উপর গরম চাদর জড়িয়ে বারান্দায় বসে রইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম : বেরোবেন না ?

গম্ভীর ভাবে রামানন্দবাবু বললেন : না।

আমার মনে হল, আমি তাঁর মনের কথাটি জেনে ফেলেছি। সে কথা বড় গোপন, বড় বিষণ্ণ। সে কথা কাউকে বলা যায় না। অথচ হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় সারাক্ষণ। আমি এই বেদনা বুঝি।

তাই তাঁকে টেনে আনবার চেষ্টা করলুম না। বললুম: আমি একটু ঘুরে আসি।

সমুদ্রের ধারে তখন ছায়া নেমেছে। অন্ধকার ঘনায় নি। আর কিছু পরে সমুদ্র আর আকাশ একাকার হয়ে যাবে। আকাশের তারা দেখা যাবে সমুদ্রের ঢেউএর উপর। আকাশের মতো সমুদ্রও সারা রাত জেগে থাকবে। সারা রাত ডাকবে। ঢেউএর পর ঢেউ এসে পারের উপর আছড়ে পড়বে, আর উচ্ছল জল কলকল করে কথা কইবে। মানুষের মতো পৃথিবীও ঘুমোয়, কিন্তু সমুদ্র ঘুমোয় না। মানুষ ক্লান্ত হয়, কিন্তু সমুদ্র হয় না। সমুদ্রের কোন ক্লান্তি নেই, আনন্দ নেই, বেদনা নেই। তাই সে সারাক্ষণ ডাকে এক ভাবে।

আমাকে কেউ ডাকছে?

আমি ফিরে দাঁড়ালুম। মনে হল রাস্তার উপর থেকে আমাকে কেউ ডাকছেন: ও মশাই, ও মশাই!

এ যেন হালদার মশায়ের গলা। কালীঘাটের কালীকৃষ্ণ হালদার। চিৎকার করে বলে উঠলেন: কানে কি কম শুনছেন আজকাল?

ভদ্রলোক কিছু কাছে এলে বললুম: কালা হয়ে গেছি।

কালা তো চিরকালই ছিলেন মশাই, নতুন আর কী হয়েছেন!

মানে?

ভদ্রলোক এবারে সুর করে গাইলেন: লম্পট নিঠুর কালা, দাঁড়িয়ে কেন ওখানে?

আমার আজ রাগ হল না। বললুম: আপনার গানের গলাটি তো বেশ!

গান থামিয়ে হালদার মশাই বললেন: মিথ্যে বলবেন না। বলুন, এই বুড়োর হেঁড়ে গলায় গান শুনে কৌতুক বোধ হচ্ছে।

ওই হল।

কিন্তু আপনাকে দেখে কেন গান গাইতে ইচ্ছে হল, সে কথা জিজ্ঞেস করুন।

বললুম : বলুন না।

তবে কোথাও বসুন আগে।

একটা পরিচ্ছন্ন জায়গা দেখে আমরা পাশাপাশি বসলুম।

হালদার মশাই বললেন : আগে একটা বিড়ি ধরাই।

বলে পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করলেন। কিন্তু দেশলাই নেই। বললেন : ভালমানুষদের নিয়ে আর পারি নে। বিড়ি সিগরেট তো খাবেন না! ও মশাই, ও মশাই,—আপনার দেশলাইটা এক বার দেবেন?

পিছন দিয়ে যে ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন, তাঁর দেশলাইটা চেয়ে নিয়ে তিনি তাঁর বিড়ি ধরালেন এবং বাক্সটা ফেরত দিলেন। কিন্তু একটা ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

বিড়িতে কয়েকটা টান দিয়েই আমাকে বললেন : তলায় তলায় যে এত কাণ্ড হয়েছিল তা কি আমি জানতুম!

কী কাণ্ড বলুন তো!

দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান, সব বলব বলেই তো এমন জুত করে বিড়ি ধরিয়ে বসলুম। তা আপনি এখানে কী করছেন?

তীর্থ করতে এসেছি।

হালদার মশাই একটা ভেংচি কেটে বললেন : আর ও দিকে সব ফর্সা হয়ে যাচ্ছিল! তীর্থ করবার সময়ই বটে!

ভদ্রলোককে আজ বড় রহস্যময় মনে হচ্ছে। আগেও অনেক বার তাঁকে এই রকম মনে হয়েছে। গল্প বলবার তাঁর একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে। আগের কথা পরে বলবেন, পরের কথা আগে। কৌতূহল জাগিয়ে মানুষকে পীড়া দেবেন। এখন তাঁর মন ছিল বিড়ির দিকে। নিবে গেলেই বিপদ হবে, কানে গুঁজতে হবে। তাই বিড়িটায় কয়েক টান দিয়ে শেষ টানটি দিলেন চোখ বুঁজে।

তারপর সেটা ফেলে দিয়ে বললেন: আপনার সঙ্গে আমার কত দিনের পরিচয়?

বছর দেড়েকের।

মাত্র দেড় বছর। বলেন কি! আপনার সঙ্গে তো আমার অনেক কালের পরিচয় মনে হচ্ছে। সেতুবন্ধ রামেশ্বরে দেখা হল, তারপর পুষ্করে দ্বারকায় আর প্রভাসে।

বললুম: প্রথম পরিচয় হয়েছে এবারের পুজোয় নয়, তার আগের বছর। গোদাবরী স্টেশনে আপনি আমাদের গাড়িতে চাপলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে ছিল সেই মেটেবুরুজের মৈত্তির। কিন্তু—

কিন্তু কী?

কথাটা কেমন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। দেড় বছরের পরিচিত মানুষের জন্যে কি কারও এমন টান হয়! এখানকার মাটিতে পা দিয়ে অবধি ভাবছিলুম, গোপালবাবুর সঙ্গে একবার দেখা হলে মন্দ হয় না। অঘোর গোস্বামী দুঃখ করছিলেন, কাউকে না বলে ছেলেটা কোথায় চলে গেল!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: আপনি সেখানে গিয়েছিলেন নাকি?

শুধু গিয়েছি নয়, অনেক কাজ করেছি। সব কথা শুনলে হালদারকে খুব খারাপ লোক বলে মনে হবে না।

কে বললে আপনাকে আমি খারাপ লোক ভাবি?

সবাই ভাবে, আর আপনি ভাববেন না কেন!

একটু থেমে বললেন: বুঝলেন গোপালবাবু, পরনিন্দার জন্যে পরনিন্দা করি না, করি পেটের জন্যে। আর ভয় দেখিয়েই যদি রোজগার হয় তো ও কাজই বা কেন করব! এই আপনাদের কথাই ভাবুন না। যা দেখেছি, তাই কি যথেষ্ট নয়! ইচ্ছে করলে এই

কথা ভাঙিয়েই খেতে পারতুম। কিন্তু তা করি নি। আপনারা যে নির্দোষ, সে কথা তো জানি।

রামেশ্বরের কথা আমার মনে পড়ল। রাত্রের আরতি দেখতে স্বাতিকে নিয়ে মন্দিরে গিয়েছিলুম। ক্লান্ত দেহে দু জনেই সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হালদার মশাই এ কথা জানেন। তিনি সেখানে ছিলেন। তারপর আমাদের দু জনকে এক সঙ্গে দেখেছেন পুষ্করের পথে, দ্বারকার সমুদ্রবেলায় অন্ধকারে, আর সোমনাথের মন্দিরের আড়ালে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয়। এ নিয়ে সত্যিই অনেক মুখরোচক গল্প হয়। কিন্তু হালদার মশাই সে রকম কিছু করেছেন বলে শুনি নি। বললুম: সত্যি কথা।

সত্যি কথা!

হা হা করে হালদার মশাই হেসে উঠলেন। পিছনের পথচারী চমকে উঠলেন কি না জানি না, কিন্তু সমুদ্রের গর্জন খানিকক্ষণ শুনতে পেলুম না।

হাসি ফুরোবার পর বললেন: এবারে বলেছি সব কথা। বলে বিয়েটা ভেঙে দিয়েছি।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলুম।

হালদার মশাই বললেন: হাঁ করে দেখছেন কী! এবারে এই কর্মই তো করে এলুম। যার পয়সায় এলুম, তার নাম আমি কিছুতেই বলব না।

সহসা অত্যন্ত অমায়িক হাসি হেসে বললেন: প্রতিজ্ঞা করেছি।

আমার কৌতূহলের সীমা ছিল না। বললুম: তাড়াতাড়ি সবটা খুলে বলুন।

বলব বৈকি। বলবার জন্যেই তো জুত করে বসেছি। হ্যাঁ, কী নাম যেন ঐ বাঁদরটার?

কার?

ঐ যে যার সঙ্গে প্রভাসের গাড়িতে দেখা হয়েছিল! মনে নেই?

পাঁচ শো টাকা কড়ার করে যে এক শো টাকা আগাম দিয়েছিল?

জো রায়?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ হতভাগা জনার্দন। তারই সঙ্গে আপনার স্বাতির তো বিয়ে হচ্ছিল গো। মেয়েটার উপকার করে এলুম।

অনেক চেষ্টায় সমস্ত ঘটনাটা জানতে পারলুম। বাকি চার শো টাকা জো রায় দেয় নি। হালদার মশাই তার বাপের কাছে গিয়েছিলেন ছেলের খোঁজ নিতে। দরকার হলে ঠিকানাটাও চেয়ে নেবেন। সেখানেই তার বিয়ের খবর শুনলেন। জো রায় যে পাত্র খারাপ, অঘোর গোস্বামীর কাছে সে কথা বলা চলে না। তীর্থস্থানে নাকি শপথ করেছেন। কাজেই জো রায়ের বাপের কাছে মেয়ের কথা বলতে হল। মেয়ে ভাল। কিন্তু—

হালদার মশাই এক গাল হেসে বললেন: এই কিন্তুটি আমাকে বলতে বলবেন না।

তারপর?

বললুম বুড়োকে, বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞেস করুন অঘোর গোস্বামীকে, সে মিথ্যে কথা বলবে না।

জানি না, হালদার মশাই কী বলেছেন! কিন্তু সে যে উপাদেয় কিছু নয়, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

হালদার মশাই বললেন: তুই বুড়োয় কী কথা হল জানি না, গোঁসাইজীর বাড়ি গিয়ে খবর পেলুম, বিয়ে ভেঙে গেছে।

হালদার মশাই রসিয়ে রসিয়ে হাসতে লাগলেন।

আমার বুকের ভিতরটা এত ক্ষণ দপদপ করছিল। এবারে সহসা প্রশ্ন করলুম: খাঁটি খবর?

হালদার মশাই তাঁর নোংরা দাঁত আকর্ণ বিস্তার করে বললেন: বললুম তো, কার পয়সায় এসেছি তা কিছুতেই বলব না। শপথ করেছি।

দূরে রামানন্দবাবুকে দেখলুম, ঋতার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন। অন্ধকারেও তাঁদের চিনতে পারছি।

হালদার মশাইকে আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। সমুদ্রের মতো সুন্দর। কলকল করে খানিকটা জল পায়ের কাছে উঠে এল।

উৎকল পর্ব সমাপ্ত

রম্যাণি বীক্ষ্য

মানুষের নূতন দেশ দেখার বাসনা কতকটা নেশার মতো। কেউ সে সুযোগ পান, কেউ পান না। কিন্তু শখ সবারই সমান। যাঁরা ভ্রমণ করেন তাঁদের একটা সঙ্গীর দরকার, যে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য ভ্রমণকাহিনীই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। আর যাঁরা বাড়িতে বসে ভ্রমণের আনন্দ পেতে চান, তাঁদের কাছেও ভ্রমণকাহিনী অপরিহার্য। এঁদের সবার জন্য লেখা হয়েছে রম্যাণি বীক্ষ্য। পর্বে পর্বে এই গ্রন্থ রচনা করে লেখক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী শুধু রবীন্দ্রপুরস্কারেই সম্মানিত হন নি, গত কয়েক বৎসরে বাংলার ভ্রমণ সাহিত্যকে অভাবনীয় রূপে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য নামটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের একটি শ্লোকের প্রথমাংশ। রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন 'সুন্দর নেহারি'। তার মানে, নানা রম্য স্থান প্রত্যক্ষ করে মনে যে ভাব এল, তারই অভিব্যক্তি এই রচনায়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে যা কিছু মনোরম দ্রষ্টব্য স্থান আছে, সাবলীল ভাষায় ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থকার এক ধারাবাহিক ভারত দর্শনের কাহিনী পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এই গ্রন্থে ভারতের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়ই শুধু নয়, বর্তমানের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আলোচনাও আছে। তীর্থ-মাহাত্ম্যের পৌরাণিক বিবরণ দিতে গিয়ে বিদগ্ধ গ্রন্থকার মন্দির-স্থাপত্য ও তার কিংবদন্তী জনশ্রুতিকেও আলোচনার বলয়ের মধ্যে টেনে এনেছেন। এতে নূতন ও পুরাতন কাল মিলিয়ে ভারতের একটি সামগ্রিক রূপ পাঠকের দৃষ্টির সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু মাত্র ভ্রমণ-বিবরণই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর সঙ্গে একটি জীবন-ঘনিষ্ঠ কাহিনীও বইগুলির ভিতর এক অপূর্ব স্বাদের সঞ্চার করেছে। ভ্রমণে যাঁরা উৎসাহী নন, জীবনে যাঁরা শুধু প্রাণরসেরই সন্ধানী, উপন্যাসের রসের আকর্ষণে তাঁরাও এই গ্রন্থের প্রতিটি পর্ব সাগ্রহে পাঠ করবেন। ভ্রমণ-রসরিক্ত উপন্যাস অথবা উপন্যাস-রসসিক্ত ভ্রমণ—এই দুই নামেই বইগুলিকে অভিহিত করা চলে।

ধনী মামা অঘোর গোস্বামী তাঁর স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যা স্বাতিকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের জন্য হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে এসেছেন। এই সময় প্লাটফর্মে অপ্রত্যাশিত ভাবে এক পাতানো ভাগনে গোপালের সঙ্গে দেখা। গোপাল লোকাল ট্রেনের যাত্রী, কেরানীর কাজ করে কলকাতায়। মার্জিত রুচি ও শিক্ষায় তার আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত। মামা মামী তাকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানালেন, আর স্বাতির দৃষ্টিতে গোপাল আবিষ্কার করল এক আন্তরিক আবেদন। চলতি ট্রেনে তাকে উঠে পড়তে হল।

প্রথম গ্রন্থ **অন্ধ্র পর্বে** ভ্রমণের অবকাশে স্বাতি ও গোপাল এল দুজনের

কাছাকাছি। গোপালের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও বিদ্যাবত্তায় স্বাতি প্রথম থেকেই মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সমাজ ও মনের দুরকম প্রয়োজনে স্বাতির চরিত্র হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। ওয়ালটেয়ার ও সীমাচলমে, বিজয়ওয়াড়া ও মঙ্গলগিরিতে, অমরাবতী নাগার্জুন সাগর ও তিরুপতিতে আমরা দুজনকে দেখি পাশাপাশি।

তামিল পর্বে তারা একত্র আছে—মাদ্রাজ মহাবলীপুরম ও পক্ষীতীর্থে, কাঞ্চীপুর ও তাঞ্জোরে, ত্রিনিচপল্লী ও মাদুরায়, ধনুষ্কোডি রামেশ্বর ও তিরুচেন্দুরে। তারপর কন্যাকুমারীতে এসে দেখি যে অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মোহনের মধ্যে স্বাতি ও গোপাল বিবেকানন্দ শিলাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছে নীরবে।

তারপর **কেরল পর্বে** তাদের ঘরে ফেরার পালা। কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবেন্দ্রাম, বর্কলা, পেরিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারি। যমজ শহর এর্নাকুলম, কোচিন থেকে ত্রিচুর গুরুভায়ুর। সেখান থেকে কালিকটে সমুদ্র দেখে নীলগিরী পাহাড়।

কর্ণাট পর্ব শুরু হয়েছে উটাকামণ্ডে। সেখান থেকে **কর্ণাটক** রাজ্য। হালেবিড বেলুর ও শ্রবণবেলগোলার প্রাচীন নিদর্শন দেখে তারা এল **হায়দ্রাবাদে**। ইলোরা ও অজন্তার গুহামন্দিরে এই পর্বের পরিসমাপ্তি।

তারপর গোপালকে দেখা গেল দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রায় ভ্রমণরত। এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে **কালিন্দী পর্বে**। গোপালের পৌরুষ ও নির্লোভ ব্যক্তিত্বের এক আশ্চর্য চিত্র, আর স্বাতির আপাত-পরিহাসপ্রিয়তার অন্তরালে গভীর আত্মমর্যাদাবোধের আন্তরিক পরিচয়।

দিল্লীতে রাণা ব্যানার্জীর সঙ্গে মামী মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তারই পরিণতি দেখি **রাজস্থান পর্বে**। দিল্লী থেকে জয়পুর আজমের পুষ্কর চিতোর উদয়পুর দেখে তাঁরা আবু রোডে এলেন। সেখানে রাণার বোন মিত্রা এল তার প্রেমিক চাওলার সঙ্গে, কিন্তু রাণা এল না। মামী আহত হলেন, কিন্তু দুঃখ পেলেন না মামা।

রাজস্থান থেকে সৌরাষ্ট্র। এই অঞ্চলের কথা আছে **সৌরাষ্ট্র পর্বে**। দ্বারকা থেকে বেট দ্বারকা যাবার পথে রঙ্গমঞ্চে এল জো রায়। এই বিত্তবান যুবককে দেখে মামীর অপত্য স্নেহ আবার নূতন করে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সোমনাথের পথে তিনি স্বাতিকে এরই হাতে সমর্পণ করবেন বলে কৃতসংকল্প হলেন।

জোরায়ের কাহিনী সৌরাষ্ট্র পর্বেই শেষ হয় নি। পরবর্তী গ্রন্থ **কোঙ্কণ পর্বেও** তা টানা হয়েছে। বম্বেতে জো রায় যখন স্বাতির সঙ্গলাভে সমুৎসুক, সে তখন গোপালের সঙ্গে পুনা ও গোয়া ভ্রমণে ব্যস্ত। গুজরাতের আমেদাবাদ থেকে গোয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ কোঙ্কণ উপকূলের কথা এই পর্বে বিবৃত হয়েছে।

তারপর সবাইকে পরিত্যাগ করে গোপাল একা দেশে ফিরল। পথে

দেখল মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি—ধারা মাণ্ডু ইন্দোর ও উজ্জয়নী, সাঁচী। ভোপাল বিদিশা ও খাজুরাহো। এই কাহিনী পাওয়া যাবে **অবন্তী পর্বে**।

পরবর্তী তিনটি পর্বে সাক্ষাৎভাবে মামা মামী ও স্বাতির কথা নেই। তবে স্মৃতিচারণের খিড়কি পথে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে মুহুর্মুহু। **উৎকল পর্বে** পুরীর সমুদ্রবেলায়, ভুবনেশ্বরে ও কোনারকে গোপাল ঋতার মধ্যে স্বাতিকে প্রত্যক্ষ করেছে। **মগধ পর্বে** শীলা নিয়েছে নায়িকার ভূমিকা এবং সমগ্র দক্ষিণ বিহার ভ্রমণ করেছে এক সঙ্গে। তারপর আবার মিলিত হয়েছে পাটনা ও গয়ায়। ভারতের প্রাচীনতম রাজ্য মগধের কথায় আধুনিক বিহারের কথাও এসে পড়েছে। আর **কোশল পর্বে** বর্ণিত হয়েছে কাশী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর ভারতের প্রসঙ্গ। বারাণসী ও হরিদ্বারে গোপাল সাবিত্রীকে বলেছে স্বাতির কথা। মসুরিতে চাওলা ও মিত্রার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোপালকে তারা দিয়েছে নূতন জীবনের প্রেরণা।

হিমাচল পর্বে গোপাল আবার মামা মামী ও স্বাতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সিমলায় অমৃতসরে ও কাংড়া উপত্যকায় ভ্রমণের অবকাশে আমরা দুজনের মুখেই শুনি জীবনের জয়গান। কিন্তু অপরূপ সৌন্দর্য সমৃদ্ধ হিমাচল প্রদেশে এই ভ্রমণ শেষ হয় নি। পাঠানকোট থেকে সবাই জম্মুর পথে কাশ্মীর গেছেন, যে কাশ্মীর দেখে আবুল ফজল বলেছিলেন হামেশা বাহারের দেশ, আর জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলেছিলেন ভূস্বর্গ। শ্রীনগরের পর্বত-বেষ্টিত লেক ও হাউসবোটে তার আকর্ষণ সীমাবদ্ধ নয়। ঝিলমের তীরে তীরে, গুলমার্গ ও পহলগামের পাহাড়ে, সোনমার্গের হিমবাহে, উলারে, মোগল উদ্যানগুলিতে—সর্বত্র তার সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন। একদিকে অবন্তীপুর ও মার্তণ্ড মন্দিরে কাশ্মীরের অস্পষ্ট অতীত, অন্য দিকে ক্ষীরভবানী ও অমরনাথে তীর্থযাত্রীর সমারোহ। উত্তরে বিচিত্র দেশ লাদাখ ও দক্ষিণে ডোগরা রাজ্য জম্মুকে নিয়ে আজকের কাশ্মীর সারা বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। **কাশ্মীর পর্বে** এই রাজ্যের যাবতীয় কথা বিবৃত হয়েছে।

কামরূপ পর্বে সমগ্র আসামের পরিচয় পাওয়া যাবে। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের দেশ কামরূপ কামাখ্যা নয়, শুধু শিলঙ আর চেরাপুঞ্জি পাহাড় নয়, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় কোচ ও অহোম রাজাদের সভ্যতার কথাও জানা যাবে, আর জানা যাবে অরুণাচল নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরের কথা এবং এই স্বল্পপরিচিত দেশের বিচিত্র অধিবাসীদের আশ্চর্য পরিচয়।

এর পরে **গৌড় পর্বের** যবনিকা উঠেছে নাটকীয় পরিবেশে। মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে গোপাল দার্জিলিঙের হাসপাতালে। দিল্লী থেকে স্বাতি এসেছে উড়ো জাহাজে। তারপর দুজনে দেখেছে দার্জিলিং কালিম্পঙ ও গ্যাংটক। হিমালয়ের প্রসঙ্গ অপরূপ বর্ণনায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। কথা

প্রসঙ্গে এসেছে পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরার বিবরণ। প্রাচীন ও আধুনিক গৌড়ের কথা সম্পূর্ণ হয়েছে মালদহে এসে।

ভাগীরথী পর্বে পশ্চিম বাংলার কথা। রাজধানী কলকাতা যে কত বিচিত্র নিজের চোখে দুবেলা দেখেও তা জানা যায় না। আর কলকাতাই পশ্চিম বাঙলার সব নয়। বিস্মৃত-প্রায় তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুর, রাঢ় দেশ ও শান্তিনিকেতন, দীঘা, গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবন—সব দেখা হতে না হতেই মামা মামী এলেন দিল্লী থেকে। স্বাতি ও গোপাল তখন মন্ত্রোচ্চারণ শুনছে : ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব.

এর পরে **হিমালয় পর্ব**। কাশ্মীর ও হিমাচলেই তো হিমালয়ের শেষ নয়, উত্তরাখণ্ড নেপাল সিকিম ও ভূটান ছাড়িয়ে অরুণাচলের শেষ প্রান্তে পরশুরাম কুণ্ড পর্যন্ত এই হিমালয় তার বিশাল মহিমায় সুবিস্তৃত। উত্তরাখণ্ড হল হিমালয়ের হৃৎপিণ্ড। শত সহস্র যাত্রীর প্রণামে নন্দিত কেদার-বদরীর পথে এসেছে স্বাতি ও গোপাল।

মরুভারত পর্বে ভারতবর্ষের বিখ্যাত থর মরুভূমি দেখছে স্বাতি ও গোপাল—বিকানের থেকে যোধপুর ও জয়সলমের, তারপরে আরব সাগরের তীরে মরুরাজ্য কচ্ছ। উদ্বাস্তু সিন্ধীরা সেখানে নূতন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। এই পর্বে শুধু মরুবাসী রাজস্থানীর কথা নয়, কচ্ছী ও সিন্ধীদের কথাও জানা যাবে।

ভারতের পূর্ব প্রান্তের পরিচয় পাওয়া যাবে **প্রাচী পর্বে**। এক সময়ের অনাদৃত ও স্বল্প-পরিচিত রাজ্যগুলি দেখবার জন্য স্বাতি ও গোপাল এল আসামের গৌহাটি শহরে। অরুণাচল রাজ্যের সংবাদ আহরণ করে এগিয়ে গেল নাগাল্যাণ্ডে—ডিমাপুর থেকে কোহিমায়। সেখান থেকে মণিপুর রাজ্যের ইম্ফল ও মৈরাঙে, কাছাড়ের শিলচর থেকে মিজোরাম রাজ্যের আইজলে। তারপর ত্রিপুরা রাজ্যের ধর্মনগর আগরতলা ও উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরীর দর্শন করে ঘরে ফেরা। এই সব রমণীয় রাজ্যের শুধু বর্ণনা নয়, রাজ্যবাসীদেরও শিল্প-সংস্কৃতি ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনার কথা পাওয়া যাবে এই পর্বে।

তারপর **কিষ্কিন্ধ্যা পর্বে** রামায়ণের যুগ থেকে শুরু করে বিস্মৃত হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগর ও তুঙ্গভদ্রা বাঁধের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রসঙ্গত হায়দ্রাবাদের গোলকুণ্ডা দুর্গ থেকে বিদর, বিজাপুর ও গুলবর্গার ইতিহাস, বাদামী পট্টডকল ও আইহোলের গুহামন্দিরের পরিচয় এবং প্রাচীন বিদর্ভের পৌরাণিক কথাও আলোচিত হয়েছে।

অরণ্য পর্বে সমগ্র ভারতের অরণ্য অঞ্চলের কথা আলোচিত হয়েছে দক্ষিণ ভারতের অরণ্য ভ্রমণের পথে। নীলগিরি পাহাড়ের টোডা ও কুর্গের অধিবাসী কোডাভাদের জীবন চিত্র এই পর্বের বিশেষ আকর্ষণ।

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক